দ্য অ্যাডভেঞ্চারস্ অব

রবিনহুড

রজার ল্যানসেলিন গ্রীন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

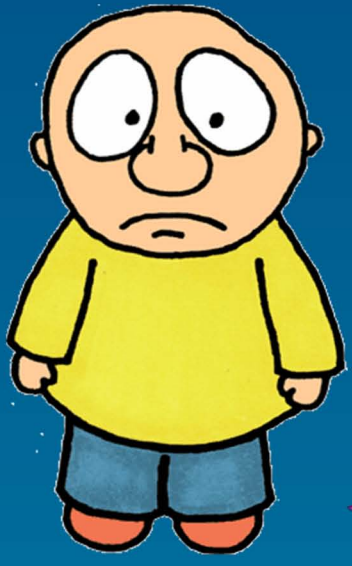

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

দ্য অ্যাডভেঞ্চারস্ অব

রবিনহুড

রজার ল্যানসেলিন গ্রীন

অনুবাদ

ইফতেখার আমিন

ঐতিহ্য

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০০৫
ফাল্গুন ১৪১১

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
বিবি. ট্রেড এন্ড কম্পিউটারস্

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য : দুইশত টাকা

THE ADVENCHER OF ROBIN HOOD collected & retold by Roger Lancylin Green translated by Iftekhar Amin. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem. Oitijjhya. Date of publication February 2005.

Website : www.oitijjhya.com

Price Taka : 200.00 US $ 10.00

ISBN 984-776-332-1

দ্য অ্যাডভেঞ্চারস্ অব রবিনহুড

ছোটবেলা থেকেই পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যানের ব্যাপারে ভীষণ কৌতূহলী ছিলেন রজার ল্যানসেলিন গ্রীন (১৯১৮-৮৭)। অ্যান্ড্রিউ ল্যাঙের রূপকথা, হেনরি রাইডার হ্যাগার্ডের অভিযানের কাহিনী, সারা বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী লোক-কাহিনী, এইসব ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়।

ওই বয়সে প্রায়ই নানান অসুখে ভুগতেন গ্রীন। তাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। চেশায়ারে নিজেদের বাড়ি পল্টন হলেই বেশিরভাগ সময় কাটাতে হত তাঁকে। সে সময় কাছের বিশাল কুইন অ্যান লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

তাঁকে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন রূপকথা এবং পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যানের ভিক্টোরিয়ান সংগ্রাহক ও উপস্থাপক অ্যান্ড্রিউ ল্যাং। অক্সফোর্ডে পড়াশুনার সময় গ্রীন তাঁর ওপরে এক বিশেষ গবেষণা করেন এবং পেশাগত জীবনে তাঁর অনুসৃত পথেই এগোতে থাকেন।

অবশ্য সেটাই তাঁর প্রথম বা একমাত্র পেশা ছিল না। তিনি মঞ্চ অভিনেতা (বিশেষ করে *পিটারপ্যান* নাটকের নৃডলার দ্য পাইরেট) এবং অক্সফোর্ডে নিজ কলেজের ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। ১৯৪৬ সালের পর থেকে গ্রীনের প্রিয় লেখকদের জীবনী, শিশুদের মূল ফিকশন এবং তাঁর নিজের পুনঃকথিত ঐতিহ্যবাহী কাহিনীসমূহের পনেরোটি ভলিউমসহ প্রচুর বই বাজারে আসে। পুনঃকথিত কাহিনীগুলোর মধ্যে দি অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিনহুডও ছিল। পরে সেটি ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে।

বিশ্বের যাবতীয় পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যান রজার ল্যানসেলিন গ্রীনকে চমৎকৃত ও অভিভূত করেছিল। তিনি নিজেও সেই ধারারই একজন ইংরেজ সংগ্রাহক-উপস্থাপক ছিলেন।

তবে এ বইয়ে তিনি শুধু উপস্থাপক হিসেবেই রবিনহুডকে হাজির করেননি, বরং তার সম্পর্কে প্রচলিত অনেক বিভ্রান্তিরও সমাপ্তি টেনেছেন, এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্যতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকারও চেষ্টা করেছেন।

অনুবাদকের কথা

রবিনহুড নামে আসলে কেউ ছিল কি ?

এ ব্যাপারে কাগজে-কলমের প্রকৃত প্রমাণ বলতে যা পাওয়া যায়, তা এসেছে মধ্যযুগের শেষদিকের *A Lytell Geste of Robyn Hode* নামের ছন্দে রচিত এক প্রণয় কাহিনী থেকে। অনেকগুলো গাঁথার সংগ্রহ ছিল সেটা, যার সিংহভাগই ছিল অনিয়মিত ছন্দের আজেবাজে কবিতা থেকে সংগৃহীত। সেগুলোর কিছু কিছু এমনকি আঠারো শতকের শেষভাগেও রচিত হয়ে থাকতে পারে।

কয়েকটি গাঁথা নিয়ে রচিত দুটি গদ্য এবং উইলয়াম শেকসপিয়ারের সমসাময়িক নাট্যকার অ্যান্থনি মানডের *The Downfall of Robert Earl of Huntingdon* এবং *The death of Robert Earl of Huntingdon* নামের দুটি পালার মধ্যেই আসল রবিনহুড লিটারেচারের সবটুকু পাওয়া যায়।

আঠারো শতকের শেষদিকে জোসেফ রিটসন এই সমস্ত গাথা, ছান্দিক প্রণয় কাহিনী এবং পালা ইত্যাদি সংগ্রহ ও পুনঃমুদ্রণ করলে সত্যিকারের লিটারেচারে রবিনহুড তার ঠাঁই খুঁজে পায়।

ইতিহাস অনুযায়ী ১১৬০ সালের শেষদিকে বা ১১৬১ সালের শুরুর দিকে স্যাক্সন মায়ের গর্ভে এবং আধা নর্ম্যান ও আধা স্যাক্সন বাবার ঔরসে রবিনহুডের জন্ম। তার জীবন যেমন ছিল বর্ণাঢ্য, তেমনি সংক্ষিপ্ত। পরবর্তী শতকের শুরুর দিকে ; চল্লিশ কি বেয়াল্লিশ বছর বয়সের সময় রাজা রিচার্ডের ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা বাতিল করে যুবরাজ জন রবিনকে বন্দি করেন।

নটিংহ্যাম দুর্গের সুউচ্চ চূড়ায় বিশেষভাবে তৈরি এক কারা প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হয়েছিল রবিনকে। সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে লিটল জনের সাহায্যে নামতে গিয়ে উঁচু থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে প্রায় পঙ্গু অবস্থায় কার্কলিজের সন্ন্যাসিনীদের এক আশ্রমে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিল রবিন হুড। কিন্তু সেখানকার মাদার প্রায়োরেসের ষড়যন্ত্রে সেখানে করুণ মৃত্যু হয় তার।

রবিনহুড এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ ও অদম্য সংগ্রামের নাম।

কিশোর বয়সে একবার মায়ের সাথে নটিংহ্যামে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বাজার ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিল সে। বাজারে তখন মেলা

চলছে। আগে কখনও মেলা দেখেনি রবিন, তাই প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে সব ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ব্যাপারটা ভাল লাগেনি নর্ম্যান শহরবাসীর।

তারা রবিনের গেঁয়ো মার্কা পোশাক-আশাক নিয়ে টিটকারি মারতে শুরু করে দেয়। ফলে ক্রমে রেগে উঠতে থাকে রবিন এবং এক সময় ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসে। এই ঘটনায় যুবরাজ জনের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর এবং সেখানকার অত্যাচারী শেরিফ রবিনের বিরুদ্ধে মানুষ হত্যার মিথ্যে অভিযোগে এনে তাকে বন্দি করলে রবিন কারাগার থেকে পালিয়ে যায়।

তারপর দীর্ঘদিন কোন খবর ছিল না রবিনের। ফলে ওর 'মানুষ খুন করার' স্মৃতি ক্রমে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। এই সময় শেরউডে 'রবিন হুড' নামে নর্ম্যানদের এক ত্রাসের উত্থান ঘটায় তার কথা মানুষ ভুলেই গিয়েছিল।

নটিংহ্যামের স্যাক্সন নাইট, স্যার গ্যামওয়েলের নাতি ও উইলিয়াম ফিযূথের ছেলে রবার্ট ফিযূথ বা হান্টিংডনের আর্ল হিসেবে বেড়ে ওঠা রবার্ট সবার চোখের সামনে দিয়েই ঘুরে বেড়াত, কিন্তু তার যে আরও একটা পরিচয় আছে; সে-ই যে রবিন হুড, বিপদে-আপদে গরিব-দুঃখী, অসহায়দের পাশে এসে দাঁড়ায়, সে খবর কেউ জানত না। জানত কেবল তার একান্ত বিশ্বস্ত দু'-চারজন।

একদিন এরকম একজনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। তারপর থেকে 'নর্ম্যান আইন !' তাকে আউটল ঘোষণা করে আমৃত্যু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। গহিন শেরউডে স্থায়ী আশ্রয় হয় রবিনহুডের। তখন থেকেই শুরু হয় 'ডাকাত রবিনহুডের' কাহিনীর।

এ এমন কাহিনী, যার কখনও মৃত্যু হবে না। রবিনহুড এমনই এক সংগ্রামী চরিত্র, যার কীর্তি নিয়ে মানুষের কল্পনার ফানুস ওড়ানোও কোনদিন শেষ হবে না।

রবিনহুডের জীবনের ইতিহাস নিয়ে আমাদের দেশে আরও অনেক বই অনুবাদ হয়েছে, অনেক সনামধন্য লেখক লিখেছেন। বলতে গেলে তার কোনটাতেই 'ইতিহাস' বলে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর কাহিনী বলতে যা পাওয়া গেছে, তার কাছে রূপকথাও হার মানে। সেসব বইয়ে এমন কিছু কিছু চরিত্রের উল্লেখ আছে, ইতিহাসে যার বা যাদের কোন অস্তিত্বই নেই।

সেসব দিক মাথায় রেখে 'অ্যাডভেঞ্চারস অব রবিনহুড' বইটিকে যথাসম্ভব ইতিহাসসম্মত ও সহজবোধ্য করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। অতএব আশা করতে দোষ নেই বইটি পাঠকের ভাল ছাড়া খারাপ লাগবে না।

ইফতেখার আমিন
২২. ০২. ২০০৫

আগের কথা

রবার্ট ফিযূথের জন্ম

১০৬৬ সালের ১৪ই অক্টোবর মাত্র একদিনের যুদ্ধে ফ্রান্সের নরম্যান্ডির এক ডিউক, উইলিয়াম, ইংল্যান্ডের হবু রাজা, তখনকার রাজা এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও শালা হ্যারল্ড গডউইনকে পরাজিত করে রাজা হয়ে বসেন। ইতিহাসে সেটা হেস্টিংসের যুদ্ধ নামে পরিচিত। তারপর এক শতাব্দীরও বেশি কাল পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে সত্যিকারের শান্তি আর ফিরে আসেনি।

উইলিয়াম দ্য কনকয়ারার ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসে পুরানো স্যাক্সন রাজার কিছু কিছু আমত্যের জমিজমা বাদে বলতে গেলে গোটা দেশটাকেই নিজের অনুসারীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়েছিলেন। নতুন এইসব নর্ম্যান আর্ল, ব্যারন ও নাইট এবং তাদের ছেলেরা, এমনকি নাতিরা পর্যন্ত স্যাক্সনদেরকে তাদের ক্রীতদাস মনে করত। স্যাক্সন কৃষকদেরকে তারা ব্যবহার করত নিজেদের জমি চাষ করতে এবং তাদের হয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে। অথচ তাদের কোন আইনগত অধিকার ছিল না, এমনকি ন্যায়বিচার চাইবার অধিকারও ছিল না।

দ্বাদশ শতাব্দীতেও ইংল্যান্ড ছিল 'দখল করা' দেশ। হেরওয়ার্ড দ্য ওয়েক মারা যাওয়ার পর নর্ম্যান রাজার বিরুদ্ধে কিছু ছোটখাটো 'প্রতিরোধ আন্দোলন' ছাড়া বড় ধরনের আর কোন ঘটনা না ঘটলেও দেশের বড় বড় প্রতিটা বনাঞ্চল ততদিনে স্যাক্সন 'আউটল আর ডাকাতদের' অভয়ারণ্যে পরিণত হয়ে পড়েছিল। এইসব বন ছিল রাজার সম্পত্তি। সেখানে কেউ হরিণ শিকার করলে তাকে নিষ্ঠুর, বর্বরোচিত উপায়ে শাস্তি দেয়া হত।

ফলে উইলিয়ামের ইংল্যান্ড বিজয়ের এক শতাব্দী পর, ১১৬০ সালেও নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে যে কোনরকম বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারেনি, তাতে যেমন অবাক হওয়ার কিছু ছিল না, তেমনি নটিংহ্যামশায়ারে বাপ-দাদার জমিদারির ধ্বংসাবশেষ আঁকড়ে পড়ে থাকা স্যাক্সন নাইট, স্যার জর্জ গ্যামওয়েল যে তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা জোয়ানার পাণিপ্রার্থী কাইম (Kyme)-এর ব্যারনপুত্র, সুদর্শন, সুপুরুষ উইলিয়াম ফিযূথকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না।

স্যার জর্জ ছিলেন ভীষণ বদরাগী মানুষ। অল্পেতেই রেগেমেগে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিতেন। আপন জাতির ওপর পরাজয়ের কলঙ্ক চাপিয়ে দেয়ার জন্য নর্ম্যানদের কখনও ক্ষমা করতে পারেননি তিনি। অন্যদিকে উইলিয়াম ফিযূথের মা ছিল স্যাক্সন, দাদিও তাই।

কাজেই বাবা নর্ম্যান হলেও রবিন নিজেকে নর্ম্যান বা স্যাক্সন, কোনটাই ভাবত না। ভাবত ইংরেজ। নিষ্ঠুরতার বদলে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে ভাবত সে। কিন্তু তার সেসব ভাবনা বা জোয়ানার হাজারো কাকুতি-মিনতি স্যার জর্জের মন গলাতে পারেনি। তাই একদিন উইলিয়ামকে গ্যামওয়েল হলে আর কখনও পা না রাখার ব্যাপারে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেন তিনি।

কিন্তু কাজ হয়নি। সেদিন রাতেই জোয়ানার সাথে দেখা করল উইলিয়াম। জোয়ানা তার দোতলার রুমের জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলল প্রেমিকের সাথে। দু'জনে প্রতিজ্ঞা করল, আমরণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা। এর ক'দিনের মধ্যে গ্যামওয়েল হলের কাছের এক চ্যাপেলে গোপনে বিয়েও করে ফেলল। স্যার জর্জ কিছুই টের পেলেন না।

এরপর থেকে নিয়মিত জোয়ানার সাথে মিলিত হতে লাগল উইলিয়াম। রাতের অন্ধকারে দেয়াল বেয়ে দোতলায় উঠে জানালা দিয়ে তার রুমে ঢুকত সে, আবার দিনের আলো ফোটার আগেই চলে যেত। বসন্ত গড়িয়ে গ্রীষ্ম এল, রাজার এক বিশেষ কাজে বাবার সাথে কয়েক মাসের জন্য লন্ডনে গিয়ে থাকতে হলো উইলিয়ামকে। তারপর আবার গ্যামওয়েলে ফিরতে এক বার্তাবাহক তাকে গোপনে জোয়ানার একটা চিঠি এনে দিল।

তাতে জোয়ানা লিখেছে : 'আমি ভীষণ বিপদে আছি। অসুস্থতার ভান করে দিনের বেশিরভাগ সময় বিছানায় পড়ে থাকি ঠিকই, তারপরও যে কোন মুহূর্তে বাবার চোখে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। সেক্ষেত্রে বাবার রাগের সীমা থাকবে না। যদি তোমাকে ধরতে পারে, ঠিক ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। আমার সাথে অথবা আমাদের বাচ্চার জন্মের পর বাবা তার সাথে কি আচরণ করবে আমি জানি না। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। আমাকে নিয়ে যাও। আমি প্রতিমুহূর্তে ভয়ে ভয়ে আছি। তোমার শক্তিশালী বাহুডোরে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত সে ভয় কাটবে না।'

চিঠি পড়া হতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত তিন অনুসারীকে খবর দিল উইলিয়াম। তাদেরকে নিয়ে দ্রুত শেরউড বনের মধ্যে গিয়ে নিজেদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করল। জায়গাটা গ্যামওয়েল হল থেকে বেশি দূরে নয়। স্যার জর্জের বাড়ির এত কাছে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করার কারণ ছিল। সে জানত, মেয়ের খোঁজ নেই দেখলে তিনি উইলিয়ামকেই সন্দেহ করবেন এবং সেই মুহূর্তে তাদের খোঁজে কাইমে গিয়ে হানা দেবেন।

সূর্য অস্ত গিয়ে আঁধার নামল শেরউডে। উইলিয়াম ও তার সঙ্গীরা নিঃশব্দে, চোরের মত গ্যামওয়েল হলের বাগানে এসে জোয়ানার কক্ষের নির্দিষ্ট জানালাটার নিচে অবস্থান নিল। জোয়ানা পালাবার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তাদের অপেক্ষায় ছিল। নিচে চারজনের টান্‌টান্ করে ধরে থাকা লাল রঙের বিশাল এক আলখাল্লার ওপর সাহসের সাথে লাফিয়ে পড়ল সে।

প্রিয়তম পত্নীকে নিয়ে চাঁদের আলোয় অনবরত ঝিলিক মারতে থাকা ঘন সবুজ শেরউডে ঢুকে পড়ল উইলিয়াম।

বিশাল শেরউড জঙ্গল নীরব-নিথর। মাঝে-মধ্যে নিঃসঙ্গ কোন পেঁচার ভীতিকর 'হু হু !', বা শেয়ালের 'হুক্কা হুয়া !', অথবা নেকড়ের উঁচু-নিচু পর্দার টানা 'উ-উ-উ !' ডাকে থেকে থেকে চমকে উঠছে।

***

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই সমস্ত কর্মচারীকে তলব করলেন স্যার জর্জ। জানতে চাইলেন, 'আমার মেয়ে কোথায় ? রোজ ভোরবেলা এই সময় ও আমার সাথে দেখা করতে আসে, আজ আসেনি কেন ? ওকে নিয়ে আজ খুব খারাপ একটা স্বপ্ন দেখেছি। মনে হয়েছে, ও সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে ! ঈশ্বর করুন তা যেন সত্যি না হয় ! আমার মেয়ের যদি কোন ক্ষতি হয়, তোমরা কেউ বাঁচবে না মনে রেখো। সব ক'টাকে আমি ফাঁসিতে লটকে ছাড়ব।'

বদরাগী নাইটের হুমকিতে কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল তারা। কেউ তরবারি কোমরে ঝোলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কেউ ধনুকে ছিলা পরিয়ে তীর বাছাই করতে। এক সময় আসল ব্যাপার জানাজানি হয়ে গেল, কাজেই স্যার জর্জও যোগ দিলেন তাদের সাথে। তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করে দেয়ার জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি ও মেয়েকে না পেলে সবাইকে ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানোর হম্বিতম্বি শুনে কাঁপুনির মাত্রা বেড়ে গেল লোকজনের।

অবশেষে একজোড়া হাউন্ড নিয়ে শেরউড বনে ঢুকল সার্চ পার্টি। উইলিয়াম ফিযূথের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে এগিয়ে চলল। এক সময় দলটা হঠাৎ করে মনিব কন্যার দেখা পেল–লতাপাতায় ছাওয়া নতুন ঘরে বসে নিজের সদ্য জন্ম নেয়া ছেলে সন্তানের পরিচর্যা করছে।

তাই দেখে লাফ মেরে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন স্যার গ্যামওয়েল, নানান ভীতিকর প্রতিজ্ঞা করতে করতে খাপ থেকে টান দিয়ে তলোয়ার বের করে ফেললেন। কিন্তু জোয়ানা যখন মৃদু হাসির সাথে বাবার কোলে তাঁর নাতিকে তুলে দিল, সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল। অস্ত্র ফেলে দিয়ে আদর করে নাতির নরম গালে চুমু দিলেন নাইট।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, 'ঈশ্বরের দোহাই, পারলে তোমার বাবাকে এখনই ফাঁসিতে ঝোলাতাম আমি। কিন্তু তোমার মা যতই দোষ করুক, এখনও সে আমার প্রিয় সন্তান। তাই ... বেশ, বেশ ! তুমি তাহলে আমার নাতি, কেমন ? এখন তো তোমার বাবাকে হত্যা করা খুব একটা ভাল দেখাবে না। জোয়ানা, সেই বদমাশটা কোথায় ?'

একটা গাছের আড়ালে ছিল উইলিয়াম ফিযূথ। সেখান থেকে বেরিয়ে এল। স্যার জর্জের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মৃদু গলায় তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগল। স্ত্রী ও সন্তানের নামে প্রতিজ্ঞা করল, তাদের জন্যে সে আজীবন স্যাক্সন জাতির বন্ধু হয়ে থাকবে।

খুশি হলেন জর্জ গ্যামওয়েল। 'আচ্ছা, আচ্ছা ! তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো। আর এই বাচ্চা–কি নাম রাখা হয়েছে বললে ? রবার্ট ? বেশ, পুচকে রবিন, ঈশ্বর করুন ইংল্যান্ডের মাটির প্রতি যেন সে আজীবন বিশ্বস্ত থাকে। যেন বিপদের সময় নিপীড়িতদেরকে সাহায্য করে !'

রবিনহুড

সারাটা সকাল বাড়ির কাছের শেরউড বনের মধ্যে খেলাধুলা করে দুপুরে বাড়ি ফিরল অল্পবয়সী একটা ছেলে। ক্লান্ত, খিদে পেয়েছে খুব।

'মা !' বাইরে থেকে ডাকল সে। 'রান্না হয়েছে ?'

'হয়েছে, রবিন !' রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল ছেলেটির মা, জোয়ানা। 'এসো।'

টেবিলে খাবার সাজাল সে। রবিন এসে খেতে বসে গেল। খাচ্ছে আর কি যেন ভাবছে। 'আচ্ছা, মা !' হঠাৎ বলে উঠল ও। 'স্যার গাই অভ কভেন্ট্রি তোমার চাচা ছিলেন ?'

'হ্যাঁ, ছিলেন।'

'তিনি নাকি একাই একটা ব্রু বোর শিকার করেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, করেছিলেন। খুব সাহসী ছিলেন আমার চাচা।'

'আমাকে তাঁর গল্প বলো, মা !'

একটা টুল নিয়ে এসে ছেলের পাশে বসল জোয়ানা। চাচা স্যার গাইয়ের দুঃসাহসিক বুনো শুয়োর শিকার করার কাহিনী বলতে শুরু করল।

'শেরউডে ভয়ঙ্কর এক বুনো শুয়োর থাকত এক সময়,' বলল জোয়ানা। 'অনেক পথচারীর মৃত্যু হয়েছিল সেটার হাতে। তাই স্যার গাই একদিন ঠিক করলেন ওটাকে হত্যা করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। ওটার জন্যে ফাঁদ পাতার সরঞ্জাম এবং একটা লম্বা ফলার ধারাল ছোরা নিয়ে শেরউডে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। তারপর খুনি শুয়োরটাকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করলেন। তারপর ওটার মাথাটা কেটে নিয়ে এলেন শিকারীর পুরস্কার হিসেবে।'

গল্পটা খুব মন দিয়ে শুনল শিশু রবিন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'মা, শেরউডে এখনও বুনো নীল শুয়োর আছে ?'

মাথা ঝাঁকাল জোয়ানা। 'হ্যাঁ। অনেক আছে।'

কিছু সময় পর আবার খেলতে বেরিয়ে গেল রবিন। ঘাসমোড়া পথ ধরে শেরউড জঙ্গলের দিকে চলল।

বিকেলের চা পানের সময় পেরিয়ে গেল, ছেলের দেখা নেই। সন্ধে নামল শেরউডে। কটেজের পুরানো তেলের বাতিগুলো একে একে জ্বেলে দিল জোয়ানা, তখনও তার ফেরার নাম নেই। বাবা উইলিয়াম ফিযূথ ক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে

লাগল। ছেলের খোঁজে বের হতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় দূর থেকে ছোট একটা কাঠামোকে আবছাভাবে কটেজের দিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। একটু পর বোঝা গেল ওটা রবিন।

'কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?' ছেলে কাছে আসতে রেগে উঠল উইলিয়াম। 'এত দেরি করলে কেন ?'

'আমি বনের ভেতরে গিয়েছিলাম, বাবা ! বুনো শুয়োর পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখতে। বড় হয়ে স্যার গাইয়ের মত আমিও ওরকম একটা শুয়োর শিকার করব কি না !'

'আজ যে তুমি ওর একটার সামনে পড়ে যাওনি, সেটা তোমার এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য,' কটেজের দিকে যেতে যেতে বলল উইলিয়াম। 'তা না হলে হয়তো আর কখনও বাড়ি ফিরতে পারতে না তুমি।'

'সে যাই হোক,' রবিন বলল, 'বাবা ! আজ বনের মধ্যে ভয়ঙ্কর একদল লোকের দেখা পেয়েছি আমি। তারা জানতে চাইছিল আমি কোথায় থাকি, বনের মধ্যে কেন ঢুকেছি। আমি কারণ বলতে ওরা হেসেই অস্থির। জানো, ওরা আমাকে খেতে দিয়েছে আর বলেছে, একদিন হয়তো আমিও বনে গিয়ে তাদের সাথে থাকব।'

'কক্ষণও না !' ছেলের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছিল জোয়ানা। কথাটা কানে যেতেই রাগে জ্বলে উঠল।

রবিন ব্যাপারটা খেয়াল না করে বলে চলল, 'ওখানে নিশ্চয়ই খুব আনন্দে থাকা যাবে। বনের মধ্যে ঘুমানো, খোলা বাতাসে সারাদিন ঘুরে বেড়ানো ! আহ্, কী মজাই না হবে তাহলে !'

জোয়ানা থামিয়ে দিলেও রবিন তার জীবনের প্রথম রোমাঞ্চপূর্ণ অভিযানের কথা কখনও ভুলতে পারেনি। সেই বয়স থেকেই অবসর সময়ে পাকা বাঁশের মজবুত লাঠি নিয়ে লড়াই শিখতে শুরু করল সে। সেই সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া আর কুস্তিও। তবে রবিনের সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল তীর ছোঁড়া।

দিনে দিনে একহারা, সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে উঠতে লাগল রবিন। দেখতে-শুনতে অত্যন্ত সুদর্শন। চৌকস। একই সঙ্গে সব ধরনের লড়াইতেও সমান পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগল সে। হাসিখুশি এবং বন্ধুদের মধ্যে জনপ্রিয় এক যুবক। তার বাবা-মা তার জন্য গর্বিত ছিল ঠিকই, কিন্তু অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিতও ছিল।

নটিংহ্যাম শহরে বাস করত জোয়ানার এক ভাই, স্কয়ার গ্যামওয়েল। সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে জায়গাটা। অনেক বছর ভাই-বোনের দেখা নেই, তাছাড়া রবিনকেও তার মামার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার, তাই নটিংহ্যাম থেকে একবার ঘুরে আসার ইচ্ছে হলো জোয়ানার। কথাটা স্বামীকে জানাতে ফাঁপরে পড়ে গেল উইলিয়াম।

'কিন্তু এখন তো ফসল তোলার সময়,' বলল সে। 'আমি যেতে পারব না। তুমি একা অতদূরে যাবে কীভাবে ? তাছাড়া রাস্তাঘাটও নিরাপদ নয়। তারওপর আছে ডাকাতের ভয়।'

'তাহলে রবিনকে নিয়ে যাই ? এখন তো ও বড় হয়েছে। আমাকে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারবে।'

স্ত্রীর চোখেমুখে প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে হেসে ফেলল উইলিয়াম। 'বুঝেছি ! মুরগি তার ছা' দেখাতে চাইছে ভাইকে ! ঠিক আছে, যাও। ছেলে বড় হচ্ছে, ভ্রমণটা তারও কাজে আসবে।'

অনুমতি পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল জোয়ানা। একদৌড়ে অন্দরমহলে গিয়ে খবরটা জানাল ছেলেকে। 'রবিন, আমরা নটিংহ্যামে যাচ্ছি ! তোমার মামার বাড়িতে !'

'নটিংহ্যামে !' অবাক হলো সে। 'সত্যি !'

'হ্যাঁ। তুমি আর আমি !'

রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠল। পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো যাত্রার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, কাজেই গাড়িতে নিজেদের এবং ঘোড়ার জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও পানি বোঝাই করা হলো। রবিনের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করা হলো। ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল পরীক্ষা করে দেখা হলো, স্যাডল তৈরি হলো যথাসম্ভব আরামদায়ক করে।

অবশেষে একদিন সকল আয়োজন শেষ হলো। গায়ে নতুন পোশাক চড়াল রবিন। উইলিয়াম ছেলের জন্য একটা নতুন তরবারি কিনে এনেছিল, সেটাকে কোমরের বেল্টে ঝুলিয়ে নিল সে। একটা ড্যাগারও ঝোলাল। তারপর স্যাডলে উঠে বসল, জোয়ানা বসল পিছনের আসনে।

বিশাল, নির্জন শেরউডের মধ্যে দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পথ ধরে নটিংহ্যাম শহরের দিকে এগিয়ে চলল মা-ছেলে। বেশ কিছু পথ পেরিয়ে আসার পর সামনে থেকে দু'জন অশ্বারোহী আসছে দেখে থেমে পড়ল রবিন। কোমর থেকে তরবারি বের করে স্যাডল থেকে নেমে দাঁড়াল। কিন্তু ও যা ভেবেছিল, তা নয়। লোকগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ হাত নেড়ে নিজেদের পথে চলে যেতে আবার যাত্রা করল রবিন।

দিনের শেষে নটিংহ্যাম পৌঁছল ওরা। সেখান থেকে মামার বাড়ি গ্যামওয়েল হল সামান্য পথ। বোন জোয়ানার ছেলেকে দেখে মামার খুশি আর ধরে না। তাদেরকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সে।

'এই তাহলে আমার ভাগ্নে ?' বোনকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করার ফাঁকে বলল স্কয়ার গ্যামওয়েল। তরুণ রবিনের চেহারা, আকার-গঠন ইত্যাদি দেখে গর্বে বুক ভরে উঠল তার। বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁক ছাড়ল, 'উইল ! বাইরে এসো। দেখে যাও, তোমার ফুপাত ভাই এসেছে।'

ডাক শুনে দরজায় এসে দাঁড়াল তাঁর ছেলে, উইল গ্যামওয়েল। প্রায় রবিনের মতই লম্বা সে, বয়সও কাছাকাছি। চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। দেখামাত্র একে অন্যের বন্ধু হয়ে গেল ওরা।

ডিনারের টেবিলে মামা ঠাট্টা করে বলল, 'ভাবছি, কাল কিছু আনন্দ-ফুর্তির আয়োজন করব। আমার ভাগ্নে কিসের তৈরি, পরখ করে দেখব।'

'কালকের জন্যে অপেক্ষা করার মত ধৈর্য নেই আমার,' নিজেদের রুমে এসে মাকে বলল রবিন। 'মনে হচ্ছে এখানে খুব উত্তেজনাপূর্ণ কিছু একটা ঘটবে।'

পরদিন নাশতার টেবিলে উইলকে দেখে হাত নাড়ল রবিন। 'গুড মর্নিং, উইল।'

'হ্যালো, রবিন !' হাসল সে। 'তোমার জন্যে একটা পানসে খবর আছে।'

'পানসে খবর ?' ভুরু কোঁচকাল ও। 'কি সেটা ?'

'আমার আরেক কাজিন আসছে এখানে সপ্তা'খানেক থাকতে !'

'সে তো বরং ভাল হলো !' রবিন বলল। 'তিনজনে মিলে মজা করা যাবে।'

মাথা নাড়ল উইল গ্যামওয়েল। 'যেতো, যদি ছেলে হতো। কিন্তু এ মেয়ে !'

'মেয়ে !' নিরাশ হলো রবিন। ছেলে হলে দল বেঁধে অনেক কিছুই করা যায়–খেলা, ঘোড়দৌড়, শিকার। কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সমস্যা। ওদের খেলা হচ্ছে যত রাজ্যের ফালতু খেলা।

কিন্তু মেইড মেরিয়ানকে দেখামাত্র সে ভুল ভেঙে গেল ওর। একে মেয়েটি খুবই সুন্দরী, তারওপর ডানপিটে ধরনের। ছেলেদের সব ধরনের খেলায় যোগ দিতে এক পায়ে খাড়া। কোনকিছু থেকে পিছিয়ে আসতে জানে না। হরিণের মত দ্রুত দৌড়াতে পারে মেরিয়ান। তীর-ধনুকেও দারুণ হাত–অব্যর্থ লক্ষ্য।

বোন আর বোনের ছেলের সম্মানে গ্যামওয়েল হলে বিরাট ভোজসভার আয়োজন করলেন গৃহস্বামী। সমস্ত বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করলেন। লম্বা লম্বা টেবিল বসিয়ে খেতে দেয়া হলো তাদেরকে। ভুরিভোজের পর হলের চৌহদ্দির ভেতরের বিশাল আঙিনায় কিছু খেলাধুলার আয়োজন করা হলো।

খেলা শুরু করার আগে একজন পরিচালিকা নির্বাচন করা হলো। রীতি অনুযায়ী তাকে কুইন অভ সেরিমনিস বলা হয়। উপস্থিতদের মধ্যে মেরিয়ান সবচেয়ে সুন্দরী বলে তাকেই কুইন অভ সেরিমনিস করা হলো। মাথায় মুকুট পরিয়ে পরিচালিকার আসনে বসানো হলো। তারপর শুরু হলো খেলা। যুবকরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠল।

রবিন বেশ উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। শিশুকাল থেকে লাঠিখেলা, তীর ছোড়া, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে আসছে। কাজেই সমবেত দর্শকদের সামনে, বিশেষ করে সুন্দরী মেরিয়ানের সামনে নিজের বিদ্যা জাহির করতে উদগ্রীব ছিল সে। অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরাও সবাই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল, কিন্তু

রবিনের সামনে কেউই বেশিক্ষণ টিঁকতে পারল না। তরবারি ও লাঠিখেলায় অল্প সময়ে তাদেরকে হারিয়ে দিল সে। দর্শকদের সঙ্গে মেরিয়ানও চেঁচিয়ে রবিনকে উৎসাহ দিতে লাগল। তার আশা ছিল তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতায়ও রবিন জয়ী হবে।

অবশ্য স্কয়ার গ্যামওয়েল মেরিয়ানের মত আশাবাদী ছিল না। কারণ তিনি জানতেন বাকি সব প্রতিযোগীরা অনেক অভিজ্ঞ। তাই পাশে বসা বোনকে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার ছেলে শক্তিশালী, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খেলায় শুধু শক্তি দিয়ে কাজ হয় না। এ জন্যে চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আর নিষ্কম্প হাত।'

একটু পর প্রতিযোগিতা শুরু হলো। রবিনের পালা এল সবার শেষে। আগের প্রতিযোগীদের মধ্যে দু'জনের তীর বিঁধেছে টার্গেটের মাঝখানের বুলস আই-এর একেবারে কেন্দ্রে। রবিনেরটাও ঠিক সেখানেই বিঁধল। কাজেই তাদের মধ্যে কাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে, তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। ভেবেচিন্তে রবিনই একটা উপায় বের করল। কুইন অভ সেরিমনিস-এর কানে কানে জানাল কিভাবে সমস্যার সামাধান করা সম্ভব।

ওর প্রস্তাবটা শুনে মাথা ঝাঁকাল মেরিয়ান। পছন্দ হয়েছে। 'আমি এ সমস্যার সমাধান দিচ্ছি,' সবার উদ্দেশে বলল ও। 'একটা উইলোর ডাল কেটে এনে মাটিতে পুঁতে রাখা হোক। যে চল্লিশ কদম দূর থেকে ডালটায় তীর লাগাতে পারবে, তাকেই যোগ্য হিসেবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।'

এই ঘোষণায় আর সব প্রতিযোগী অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কেউ কেউ হাসল। রবিনের কোনদিকে খেয়াল নেই। তর্জনী সমান মোটা একটা উইলোর ডাল কেটে এনে মাটিতে পুঁতল ও। প্রতিযোগীদের একজন চেঁচিয়ে উঠল তাই দেখে।

'দূর, দূর ! ওই ডালে লাগানো কোনদিনও সম্ভব না। কেউ পারবে না।' অন্যরাও মাথা দুলিয়ে সায় জানাল।

'দেখতে থাকো তাহলে।' কথাটা বলে প্রস্তুত হলো রবিন। সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুড়ল, পরমুহূর্তে প্রাঙ্গণ ভর্তি মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের চোখের সামনে উইলোর ডালটা চড়াৎ করে দু'ভাগ হয়ে গেল। চারদিকে হই-হই পড়ে গেল। সবাই চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানাতে লাগল রবিনকে। সন্তানের কৃতিত্বের গর্বে জোয়ানার বুক ভরে উঠল, কিন্তু মেইড তরুণী মেরিয়ান তার চেয়েও বেশি শিহরিত হলো।

গ্যামওয়েল হলের আশপাশে যত ছেলে আছে, রাতারাতি তাদের নেতা বনে গেল রবিন। সারাদিন দল বেঁধে খেলা আর দুষ্টুমি। মেরিয়ানও তাদের দলে ভিড়ে গেল। মেয়ে বলে দূরে সরে থাকল না।

একদিন জানা গেল নটিংহ্যামে মেলা বসতে যাচ্ছে। রবিন ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠল। ও কখনও মেলা দেখেনি, কাজেই ঠিক করল নির্দিষ্ট দিন দল বেঁধে শহরে যাবে ওরা। কিন্তু উইল গ্যামওয়েল আপত্তি জানাল।

'শহরের মানুষ ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখবে না,' বলল সে। 'নটিংহ্যামের আহাম্মক লোকজন গ্রাম থেকে কেউ এলে তার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন সে তাদের জন্যে সমস্যা নিয়ে এসেছে।'

'তাহলে আমরাও ওদেরকে সমস্যাই দেব,' জবাব দিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রবিন।

মেলার দিন রবিন ও মেরিয়ানের নেতৃত্বে একদল ছেলে শহরে এল। তখন প্রায় দুপুর। প্রচুর মানুষের সমাগমে মেলা পুরোপুরি জমে উঠেছে। পথের পাশে সুন্দর সুন্দর মনোহরী দ্রব্য সাজিয়ে নিয়ে বসেছে অনেকগুলো স্টল। ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখছে ওরা, এমন সময় শহরের একদল দুষ্টু ছেলে পিছু নিল। আপত্তিকর নানান মন্তব্য করতে লাগল রবিন ও তার বন্ধুদের লক্ষ্য করে। রবিন প্রথমে ব্যাপারটাকে আমলে আনতে চাইল না। জীবনে এই প্রথম মেলায় আসা, ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শহুরে ছেলেগুলোর জন্য হলো না।

তাদের ক্রমাগত খোঁচাখুঁচিতে এক সময় অতিষ্ঠ হয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'বন্ধুরা !' চেঁচিয়ে ডাকল সঙ্গীদেরকে। 'এসো, এক হাত দেখিয়ে দিই এদেরকে।'

বলতে যা দেরি, শুরু হতে এক মুহূর্তও লাগল না। চোখের পলকে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল। তিনটা স্টল উল্টে দিল ওরা। ভয়ে শহরবাসী আর দোকানিরা সাহায্যের আশায় চিৎকার করতে লাগল। লাঠি নিয়ে তেড়ে এলে ওদেরকে শায়েস্তা করতে। রবিন ও তার বন্ধুরা রুখে দাঁড়াল। মারের বদলে মার দিতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না মারপিট। লোকজন আচমকা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিল। শেরিফ এসে পড়েছে। তার সঙ্গে রক্ষীদের বড়সড় এক বাহিনী।

'রবিন ! রবিন !' বন্ধুরা ডাকতে লাগল। 'চলে এসো !'

কিন্তু শুনতে পেল না ও। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে, তাকেই লাঠিপেটা করতে ব্যস্ত। তাই দেখে গর্জন করে উঠল শেরিফ, 'ধরে আনো ওকে !'

রক্ষীরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল তাকে। ছাড়া পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করল রবিন, কিন্তু ওরা সংখ্যায় অনেক বলে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলো হার স্বীকার করে নিতে। টেনে-হিঁচড়ে শেরিফের সামনে নিয়ে আসা হলো ওকে।

'তুমি জানো, একজনকে হত্যা করেছ তুমি ?' রাগে চিৎকার করে উঠল শেরিফ। 'এর শাস্তি তোমাকে ভোগ করতেই হবে !' নিজের লোকদের দিকে ফিরল সে। 'নিয়ে যাও একে ! জেলে ভরে দাও !'

রবিনকে জেলে ভরে দেয়া হলো। রক্ষীরা সেলের দরজায় তালা মেরে চলে যেতে প্রথমেই মেরিয়ানের কথা মনে পড়ল। মেরিয়ান কি পালাতে পেরেছে ?

ভাবল ও। একটু পর নিজের চারদিকে তাকাল। সেলটা আট ফুট বাই আট ফুট। সে সময়কার আর সব সাধারণ সেলের মত কাঠের তৈরি সেল। আলো আসার জন্য ছাদে ফাঁকামত ছোট একটা জায়গা আছে।

ওপরে তাকাতে সিলিঙে বড় বড় গর্ত দেখতে পেল রবিন। সেগুলো দিয়ে জেলখানার খড়ের চাল দেখা যাচ্ছে। মনে মনে করণীয় ঠিক করে সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকল ও। সন্ধে ঘনিয়ে আসতে অন্ধকারের মধ্যে সিলিঙে উঠে পড়ল, তারপর চাল ফুটো করে পালাল।

শেরিফের কানে এ খবর পৌঁছতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল তার। রাগে চিৎকার করে উঠল সে, 'যেখান থেকে পারো জ্যান্ত অথবা মৃত ধরে আনো ওকে।'

ওদিকে গ্যামওয়েল হলে পৌঁছেই মাকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল রবিন। অবশ্য তার আগে মেরিয়ানকে বিদায় জানাতে ভুলল না। অবিবেচক শেরিফের কথা ভেবে সারাটা পথ রাগে ফুঁসল। কেমন মানুষ সে ? যে অপরাধ রবিন করেনি, সেই অপরাধে ওকে ধরে নিয়ে জেলে ভরে দিল ? শহরের ছেলেরা যে ওদের সাথে অন্যায় আচরণ করেছে, তার তো কোন প্রতিকার করল না লোকটা !

মূলত এরপর থেকেই রবিনহুডের জীবনের চিরসবুজ উপাখ্যানের শুরু। শেরিফের লোকেরা গ্যামওয়েল হলে এসে হাজির হলো। গৃহস্বামীকে নির্দেশ দিল রাজার নামে রবিনকে তাদের হাতে তুলে দিতে।

'কিন্তু রবিনহুড তো চলে গেছে,' তাদেরকে জানালেন স্কয়ার গ্যামওয়েল। 'এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ওদের বাড়ি।'

রবিনদের বাড়ির দিকে চলল তারা। সেখানে উইলিয়াম ফিযূথের দেখা পেয়ে তাকে শেরিফের হুকুমের কথা জানাল।

'রবিন এখানে নেই,' জবাবে বলল সে। 'জঙ্গলে চলে গেছে। ইচ্ছে হলে তোমরা তাকে সেখান থেকে ধরে আনতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে সাবধান, ওর মধ্যে ঢুকলে তোমাদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হতে পারে। কারণ শত শত আউটল থাকে শেরউডে। শেরিফের লোকদের খুন করতে পারলে ওরা সবচে' বেশি খুশি হবে।'

আউটল রবিনের খোঁজে তাদের কটেজ ও তার আশপাশের ঝোপ-ঝাড় চষে ফেলল লোকগুলো। তারপর সেখান থেকে শেরউডের কিনারা পর্যন্ত গিয়ে থামল দলনেতা। আর এগোতে সাহস হলো না। বনের মধ্যে ঢুকলে কি পরিণতি হবে, তা উইলিয়ামের চেয়ে কম জানে না সে।

কাজেই নটিংহ্যামে ফিরে যাওয়াই ভাল মনে হলো। তাতে আর যা-ই হোক, প্রাণটা অন্তত বেঘোরে হারাতে হবে না।

অন্যদিকে বনের মধ্যে সারাদিন একা একা ঘুরে বেড়াল রবিনহুড। সন্ধে হয়ে আসতে শুকনো ডালপালার স্তূপ তৈরি করে তাতে আগুন ধরাল। চুপ করে বসে থাকল তার পাশে। খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে ওর কেউ নেই। একদম একা হয়ে গেছে ও।

তবে সে একাকীত্ব বেশিক্ষণ থাকল না। আগুনের আভা দেখতে পেয়ে বনে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আউটলরা একজন দু'জন করে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। নটিংহ্যামের শেরিফের ভয়ে দীর্ঘদিন থেকে বনে বাস করছে তারা। শুয়ে পড়ার আয়োজন করছিল, এমন সময় চারদিক থেকে ঘিরে ধরল তারা।

'কে তুমি ?'

'এখানে কি করছ ?'

উঠে বসল রবিন। 'যে দোষ আমি করিনি, সেই দোষে শেরিফ আমার নাগাল পেতে চায়। লোকজনকে বলে দিয়েছে, আমাকে জ্যান্ত বা মৃত তার সামনে হাজির করতে। আমি জানি তার মুঠোয় একবার পড়লে আর বাঁচব না, তাই ঠিকানা বদল করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ আমি মরতে চাই না।'

ওর রসিকতায় হেসে উঠল আউটলর দল। বয়স্ক একজন বলল, 'ঠিক আছে। তুমি থাকো আমাদের সাথে।'

থেকে গেল রবিন।

শেরউডের উপাখ্যান

শেরউড। পাহাড় সমান উঁচু, মোটা মোটা প্রাচীন গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া একটা আঁকাবাঁকা, সরু পথ দিয়ে দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছে রবিন। কাঁধে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক ধনুক।

পিঠের তূণে রয়েছে বিশ-পঁচিশটা তীর, ওর হাঁটার ছন্দে পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে ধাতব আওয়াজ তুলছে। কোমরের চামড়ার খাপে একটা তরবারি ও ছোট ড্যাগার আছে, সেগুলোও তালে তালে দুলছে। ঘন ওক গাছের ফাঁক দিয়ে সামনের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছে রবিন।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একদল তেল চকচকে, নধর হরিণ ছুটে যাচ্ছে দেখে থেমে পড়ল। চট্ করে ধনুকে হাত চলে গেল ওর, অন্য হাতে তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। উঁহু ! শেরউড রাজার সংরক্ষিত বন, আর হরিণগুলোর মালিক রাজা স্বয়ং।

বনে রাজার নিয়োজিত বনরক্ষীরা পাহারা দেয়। যদি তাদের কেউ হরিণ শিকার করতে দেখে ফেলে, আর শিকারী যদি হয় স্যাক্সন, তাহলে সর্বনাশ ! শাস্তি হিসেবে ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা কেটে দেয়া হবে, যাতে আর কখনও সে তীর ছুড়তে না পারে। আগুনে পোড়ানো লোহার শিক দিয়ে চোখ গেলে দেয়া হবে। এতকিছু হজম করার চেয়ে মরে যাওয়াও অনেক ভাল।

কাজেই নিজেকে সামলে নিল ও। বেআইনি কিছু করে বসা ঠিক হবে না। আবার হাঁটতে লাগল। খানিকদূর গিয়ে রাস্তা ছেড়ে বনে ঢুকে হলি আর হেজেলউডের ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। বনের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি গেলে অনেক সময় বাঁচবে। তাছাড়া বন-জঙ্গল রবিনের ভাল লাগে। বনের পাখির গান ভাল লাগে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না ও, তার আগেই খুব কাছ থেকে একটা বাজখাঁই গলা শোনা গেল।

'থামো ! কে তুমি ? কোথায় যাচ্ছ !'

দাঁড়িয়ে পড়ল রবিন। দেখল একটা বিশাল ওক গাছের নিচে পাঁচ-ছয়জন লোক বসে আছে, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত। সবার পায়ে কেনডাল গ্রিন কোট—রাজার ফরেস্ট রেঞ্জার। তাদের একজনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে তাকে অভিবাদন করল

রবিন। বলল, 'আমাকে সবাই লকসলির রবার্ট বলে ডাকে। নটিংহ্যাম যাচ্ছি আমি।'

'কেন ? কি কাজ তোমার সেখানে ?'

'নটিংহ্যামের শেরিফ এক শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। আমি তাতে অংশ নিতে যাচ্ছি।'

বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রক্ষী। 'ব্যাটা বলে কি ! বড়দের একটা ধনুক কাঁধে ঝোলালেই তীরন্দাজ হওয়া যায় ?' আবার একচোট হেসে নিল। ইঙ্গিতে ধনুকটা দেখিয়ে বলল, 'ওটায় ছিলা পরানোর ক্ষমতা আছে তোমার ? লক্ষ্যভেদের কথা না হয় বাদই দিলাম।'

'হ্যাঁ, ও পরাবে ছিলা !' আরেক রক্ষী বলে উঠল। 'তোমার যেমন কথা ! ও মানুষটাই তো এক আঙুল ... অতোবড় ধনুকটা বাঁকা করতে পারবে কি না, তার নেই ঠিক !'

লোকগুলো তাকে নিয়ে মশকরা করছে বুঝতে পেরে রাগে লাল হয়ে উঠল রবিন। 'তাই মনে হয় তোমাদের ? বেশ। তোমাদের মধ্যে কে সেরা তীরন্দাজ ? এসো, বাজি ধরবো আমি তার সাথে। দেড়শো গজের মধ্যে যে কোন লক্ষ্য ভেদ করে দেখাবো।'

'বাজি ধরবে ?' বাঁকা হাসি হাসল দাঁড়ানো রক্ষী। তাকে রক্ষীদের নেতা মনে হলো ওর। 'কিসের বাজি ? কতো টাকা আছে তোমার কাছে ?'

'বিশ মার্ক,' বলল রবিন।

'আচ্ছা, বেশ !' ভুরু কুঁচকে উঠল লোকটার। বোঝা যাচ্ছে যুবকের মধ্যে একটা উদ্ধত ভাব আছে দেখে খেপে গেছে। আঙুল তুলে দূরের একটা ঝোপ দেখাল সে। 'ওই যে তোমার লক্ষ্য। দেখি কেমন ভেদ করতে পারো !'

সেদিকে তাকাতে একদল হরিণ দেখতে পেলো রবিন–ঝোপটার এপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে নাক তুলে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করছে। সেগুলোর মধ্যে বিশাল একটা শিংওয়ালা হরিণ আছে, অসহিষ্ণুর মতো এক পা মাটিতে ঠুকছে সেটা।

ধনুকটা কাঁধ থেকে নামাল রবিন। অবাক হয়েছে। 'ওটাকে লাগাতে বলছ ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রক্ষী। 'বলছি !'

'কিন্তু ওটা তো রাজার হরিণ ! ওটাকে মারলে যে ...'

'কিচ্ছু হবে না,' ওকে আশ্বস্ত করল লোকটা। 'আমিই তো মারতে বলছি, তাহলে আর চিন্তা কিসের ? মারো !'

দ্বিধা কেটে গেল রবিনের। ওস্তাদ তীরন্দাজের মতো অনায়াস ভঙ্গিতে ধনুকে ছিলা পরাল। কাজটা যেরকম সহজ-সাবলীল ভঙ্গিতে করল, তাতে রক্ষীরা অবাক

না হয়ে পারল না। সবাই বুঝল, বয়স অল্প হলেও প্রচণ্ড শক্তি আছে যুবকের কবজিতে। তীর-ধনুকের বেলায় অসাধারণ দক্ষ।

ধনুকটা জায়গামতো বসাল রবিন, তীর বসিয়ে ছিলা টানতে শুরু করল। টানের চোটে বাঁকা হয়ে গেল বিশাল ধনুকটা, একেবারে কানের পাশে চলে এলো ওর ডান হাত, পরক্ষণে টোয়াং ! করে ঝংকার উঠল ছিলায়। বাতাস কেটে সাঁই সাঁই করে ছুটে গেল তীর। সবার চোখের সামনে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল তীরবিদ্ধ বড় হরিণটা, পরক্ষণে ধড়াশ্ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

ওটার কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে বরিনের তীর। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল বনরক্ষীর দলটা। একটু পর সামলে নিয়ে রবিনের প্রশংসা করতে লাগল সবাই। রবিন ধনুক রেখে হাত বাড়িয়ে দিল দলনেতার দিকে।

'বাজির টাকা দিন এবার। বিশ মার্ক।'

'টাকা ? দাঁড়াও, দিচ্ছি। তোমার পাওনা পাই পাই করে মিটিয়ে দেবো আমি।' বিচ্ছিরি বাঁকা হাসি হাসল সে। 'তোমার কি পাওনা হয়েছে জানো ? রাজার আইন ভাঙার শাস্তি। রাজার হরিণ মারার শাস্তি নিশ্চই জানো, তাই না ? এখন সেটাই বুঝিয়ে দেয়া হবে তোমাকে। অ্যাই, ধরো একে !'

বোকা বনে গেল রবিন। লোকটার আশ্বাসে বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে নিজেকে কি ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়েছে, বুঝতে পেরে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। পালাবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। দু'জন রক্ষী ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর, তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো আরও দুজন। মাটিতে ফেলে ঠেসে ধরা হলো ওকে, হাত-পা কষে বেঁধে ফেলা হলো।

'যাক, এতদিনে একটা হরিণ চোরকে অন্তত ধরা গেল !' প্রথম রক্ষী বলল খুশি খুশি গলায়। 'নিত্য হরিণ চুরি হয় অথচ চোর ধরা যায় না, এই নিয়ে শেরিফ জান খারাপ করে ফেলেছে আমাদের ! আজ তাকে কিছুটা শান্ত করা যাবে।'

হাত-পা অসাড় হয়ে এলো রবিনের। বুঝতে বাকি রইল না, শেরিফের কাছে নিজেদের তৎপরতা প্রমাণ করার জন্যই ওকে এই নিষ্ঠুর ছলনার ফাঁদে ফেলেছে লোকটা। এখন নটিংহ্যামে নিয়ে শাস্তি দেয়া হবে ওকে। শেরিফ নর্ম্যান–ভীষণ বদ। তার কাছে শত কাকুতি-মিনতি করলেও লাভ হবে না। ওসব কানেই তুলবে না সে। রবিন চোর হোক আর না হোক, নিষ্ঠুর, অমানুষ শেরিফের তাতে কিছুই আসবে-যাবে না। কোন স্যাক্সন প্রজাকে শাস্তি দেয়ার মত সুবর্ণ সুযোগ পেলে যে কোন মূল্যে সেটা সে কাজে লাগিয়েই ছাড়বে।

তার কথায় হই-হই করে সায় জানাল বাকি রক্ষীরা–নেতার চাতুরী খুব পছন্দ হয়েছে। সবাই আলোচনা করে ঠিক করল, হরিণটার চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া দিয়ে রবিনকে মুড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেই কথা সেই কাজ। সদ্য মৃত প্রাণীটার উষ্ণ, রক্তে ভেজা পিচ্ছিল চামড়ার খোলের মধ্যে ভরে দিয়ে বাইরে থেকে কষে

বেঁধে ফেলা হলো রবিনকে। যেখানে হরিণের মাথাটা ছিল, সেখান দিয়ে ওর মাথাটা বেরিয়ে থাকল কেবল।

রাগে দুঃখে আর ক্ষোভে বুক জ্বলছে ওর। এমন একটা বোকামি করে বসার জন্য খুব রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। এই সমস্ত ইতরমনা বিশ্বাসঘাতকদের কাছে কি না ও প্রমাণ করতে গিয়েছিল ও তীর ছোঁড়ায় কত ওস্তাদ ? নটিংহ্যামের বাজার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিছুদিন আগে ওখানে এক হরিণ চোরের শাস্তি নিজের চোখে দেখেছে রবিন–হতভাগ্য লোকটা খিদে সহ্য করতে না পেরে একটা হরিণ মেরে খেয়েছিল। দু' আঙুল কেটে নেয়া হয়েছিল তার, চোখ গেলে দেয়া হয়েছিল।

যুবকের বেদনার্ত চেহারা, গোঙানি আর অসহায় ছটফটানির কথা স্পষ্ট মনে আছে রবিনের। সেই একই দুঃখজনক ঘটনা আজ ওর জীবনেও ঘটতে যাচ্ছে ভেবে বারবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠতে লাগল। কিন্তু বাকি জীবন ওকে অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকতে হবে, সে কথা ভাবতেই পারে না রবিন। বাঁধন ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার অনেক চেষ্টা করল ও, কোন ফল হলো না। বাঁধন ছিড়ল তো না-ই, বরং আরও মজবুত হয়ে চেপে বসল।

'বন্দিকে শহরে নিয়ে যাওয়ার উপায় কি ?' এক রক্ষী প্রশ্ন করল।

মাথা চুলকাল রক্ষীদের নেতা। বলল, 'আমরা আসার সময় না আধ মাইল দূরে তিনজন স্যাক্সন কাঠুরেকে কাঠ কাটতে দেখেছিলাম ? অ্যাই, তুমি দৌড়ে যাও দেখি ! আমার কথা বলে ডেকে নিয়ে এসো ব্যাটাদের। টানাগাড়িটাও নিয়ে আসতে বলবে।'

একছুটে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল ডিকন নামের রক্ষী। একটু পর টানাগাড়িসহ কাঠুরে লোকগুলোকে নিয়ে ফিরে এলো। রক্ষীদের নেতা রবিনকে গাড়িতে তুলতে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'শহরে নিয়ে চলো একে।'

তিন কাঠুরের মধ্যে দুজন ঝটপট্ তার নির্দেশ পালন করলেও তৃতীয়জন করল অনেকটা যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। পরনের পোশাক-আশাক দেখলেই বোঝা যায় তারা একেবারে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। দুজন বুড়ো, একজন যুবক। তিরিশের মতো বয়স শেষেরজনের, তাগড়া জোয়ান। নীরবে নির্দেশটা পালন করল তিন কাঠুরে, রবিনকে টানাগাড়িতে তুলে শহুরের দিকে এগোতে লাগল।

আধ মাইল যেতে একটা খানাখন্দে ভরা বাজে, এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পড়ল গাড়ি। জোর ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে লাগল–একবার এদিকে কাত হয়ে পড়ে তো পরেরবার ওদিকে। তার সাথে তাল মিলিয়ে হাত-পা বাঁধা রবিন গড়িয়ে গিয়ে একবার গাড়ির এপাশে ঘা খাচ্ছে, একবার ওপাশে গুঁতো খাচ্ছে। বনরক্ষীরা ওর এই অসহায় অবস্থা দেখে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল।

হঠাৎ তাদের নেতার হাসি থেমে গেল। একলাফে সামনে চলে এলো লোকটা, কাঁধ থেকে নিজের ধনুকটা নামিয়ে এনে যুবক কাঠুরের কাঁধে গায়ের জোরে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল।

'হারামজাদা !' চিৎকার করে উঠল সে। 'ঠিকমত টানছিস না কেন ?' এই বলে দমাদম আরও কয়েকটা কিল ঘুসি লাগিয়ে দিল। রাগে রক্ত চড়ে গেল যুবকের মাথায়। কোমরে গোঁজা ছুরির বাঁটের দিকে হাত চলে যাচ্ছিল, কিন্তু বুড়ো সঙ্গীদের একজন সতর্ক করতে সামলে নিল সে।

কাঁপা গলায় ডাকল বৃদ্ধ লোকটা। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো, উইল। শান্ত হও। ওদেরকে রাগানো ঠিক হবে না।'

'ঠিক বলেছে বুড়ো ভাম,' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল রক্ষিদের প্রধান। 'আমাদের রাগালে তোমাদেরই ক্ষতি, বুঝলে স্যাক্সন কুত্তার বাচ্চারা ? হ্যাঁ, ঠিক আছে। এইভাবে জানপ্রাণ দিয়ে টেনে চলো দেখি।' ফাও হিসেবে আবারও কিছু কিল ঘুসি মারল সে যুবক কাঠুরের ঘাড়ে, মাথায়।

বাধা দিল না যুবক, ঘাড় গুঁজে নীরবে হজম করে নিল। একান্ত অনুগত চাকরের মত গাড়ি টানতে শুরু করল আবার। কিন্তু রবিন দেখল রাগে ফুঁসছে সে, চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। বেশ কিছুদূর গিয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই ছোট একটা গ্রামের দেখা পাওয়া গেল। সেটার একটা বাড়ির প্রবেশপথ লাতাপাতা দিয়ে সাজানো।

'সরাইখানা !' বাড়িটার ওপর চোখ পড়তে খুশি হয়ে বলে উঠল এক রক্ষি। 'ওখান থেকে গলাটা ভিজিয়ে নিলে হত না ?'

অন্য রক্ষীরা এককথায় রাজি হয়ে গেল। বাড়িটার সামনে গাড়ি থামাতে বলে মদের অর্ডার দিল তারা। সরাইখানার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়েই গলা ভেজাতে লাগল। খানিক পর হঠাৎ তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখো, কারা যেন আসছে।'

ঘুরে তাকাল সবাই। দেখা গেল পাঁচজনের আরেক দল বনরক্ষী আরও দুই বন্দিকে নিয়ে এদিকেই আসছে। বন্দিদের হাত বাঁধা।

'বা, বা !' খুশি হয়ে উঠল প্রথম রক্ষী। 'ওরাও দু'জন ডাকাতকে ধরেছে দেখা যাচ্ছে। তিনজন হলো তাহলে। আজ নিশ্চই খুশিতে ধেই ধেই করে নাচবে শেরিফ। চলো, ওরা ব্যাটাদের ধরল কীভাবে শুনে আসি !'

দ্বিতীয় দলটির দিকে এগিয়ে গেল প্রথম দল। বাঁধন কেটে রবিনহুড যে পালাতে পারবে না, সে ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ নেই তাদের মনে। আর স্যাক্সন কাঠুরেরা যে তাদের অনুমতি ছাড়া এক পা-ও নড়তে সাহস পাবে না, সেটাও জানা কথা। কাজেই সেদিকে নজর রাখার কোন দরকার মনে করল না। কিন্তু তারা কয়েক পা যেতে না যেতেই যে বুড়ো লোকটা যুবক কাঠুরে উইলকে সতর্ক করেছিল, সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার বাবা সে।

এদিক-ওদিক এক পলক দেখে নিয়েই ভোঁ দৌড় দিল লোকটা, দুটো বাড়ির মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে হা হা করে ছুটল। দ্বিতীয় বুড়ো রক্ষীদের দিকে তাকিয়েছিল, তাদেরকে বোকার মত হাসতে দেখে নিজেও হাসছে। কিছুই টের পায়নি। ওদিকে যুবকও বাপের পিছন পিছন ছুট লাগাতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রবিনের কথা খেয়াল হতে থেমে গেল।

রক্ষীরা শুনে ফেলবে বলে ভয়ে মুখে কিছু বলতে পারল না রবিন, কিন্তু ওর চাউনিতে মিনতি ফুটল। সে মিনতির ভাষা বুঝতে পেরে টানাগাড়ির পাশে ধপ্ করে বসে পড়ল যুবক, কোমর থেকে তীক্ষ্ণধার ছোরাটা বের করে দ্রুত কয়েক পোঁচে ওর বাঁধন কেটে দিল। হরিণের খোলস থেকে নিজেকে মুক্ত করল রবিন। গাড়ি থেকে নিজের তীর-ধনুক তুলে নিল চট্ করে।

তারপর যুবকের পিছন পিছন খিঁচে দৌড় লাগাল। যুবক ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে, সরু পথটা ধরে জানপ্রাণ বাজি রেখে তীরের বেগে ছুটছে। দৌড়ের ওপর চিৎকার করে দ্বিতীয় বুড়োকে ডাকল সে। 'দৌড় দাও, ওল্ড ম্যান ! শিগগিরই পালাও এখান থেকে।'

অনেকটা যেন অনিচ্ছার সাথে ঘুরে তাকাল বুড়ো, পরক্ষণে হাঁ হয়ে গেল যুবককে তীরের বেগে ছুটে পালাতে দেখে। তারা বাবা এরমধ্যেই বিলকুল হাওয়া হয়ে গেছে। এমন সময় রক্ষীরা ফিরে তাকিয়েই হা হয়ে গেল। পরক্ষণে সামলে নিল দলনেতা, ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে উঠল।

'ধর, ধর ! পালাচ্ছে হারামির দল ! বাঁধন কেটে দেয়া হয়েছে বন্দির ! সবাই যাও, ধরে নিয়ে এসো ব্যাটাদের। জীবিত হোক, মৃত হোক, ওদেরকে আমার চাই !'

কথা বলতে বলতে ধনুকে তীর পরিয়ে ফেলল লোকটা, লক্ষ্য স্থির করে ছিলা টানতে শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় হুঁশ হলো দ্বিতীয় বৃদ্ধের, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বনের দিকে ছুট লাগাল সে।

কিন্তু পারল না। কয়েক পা যেতে না যেতেই দলনেতার ছোড়া তীর নাগাল পেয়ে গেল তার–ঘ্যাঁচ করে তার পিঠে এসে বিঁধল। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বুড়ো, স্থির হয়ে গেল। কেবল পিঠে বেঁধা তীরের গোড়ার দিকটা একটু একটু কাঁপছে। ওদিকে রবিনহুড ছোট একটা উঠানের মতো জায়গায় এসে পৌঁছল।

দেখল ওপাশের একটা কাঠের দেয়াল টপকাচ্ছে যুবক কাঠুরে। প্রথম বুড়োকে দেখা যাচ্ছে না। রবিনও দৌড়ে গিয়ে দেয়ালটা টপকাল। সামনে বেশ কিছুদূর খোলা মাঠ, তারপর আবার বন। মাঠের প্রান্তে প্রথম বুড়োকে দেখতে পেল রবিন, প্রায় পৌঁছে গেছে বনের প্রান্তে। বুড়ো মানুষ, হাঁপিয়ে গেছে। পা উঠতে চাইছে না। ঠিক তার পিছনেই রয়েছে যুবক।

রবিনও পড়িমরি ছুটল। বনের প্রান্তে পৌঁছে পিছনে কয়েকটা গলার চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল। পাঁচ ছয়জন রক্ষীর মাথা দেখতে পেল দেয়ালটার ওপাশে, হাঁচড়পাঁচড় করছে এপাশে আসার জন্য। আর কিছু দেখার জন্য অপেক্ষা করলো না ও, একছুটে বনে ঢুকে পড়ল। দেখল সামনেই ওর অপেক্ষা করছে যুবক কাঠুরে।

'এদিকে এসো !' ওকে ডাকল সে। 'এদিকে। আমার পিছন পিছন এসো !' বলে সামনে ছুটল আবার। খানিক দূর গিয়ে বৃদ্ধকে দেখতে পেলো রবিন। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আরও কিছুদূর গিয়ে প্রকাণ্ড এক ওক গাছের নিচে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল সে। 'হব কোথায় ?' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল সে।

'মারা গেছে,' যুবক জবাব দিল। 'পালাতে দেরি করে ফেলেছিল। দেখলাম একটা তীর এসে পিঠে গেঁথে গেল।'

'হ্যাঁ,' রবিন মাথা ঝাঁকাল। 'রক্ষীদের সরদারের ছোড়া তীর।'

মাথা নাড়ল বুড়ো কাঠুরে। 'নাগালে পেলে আমাদেরও একই অবস্থা করে ছাড়বে ব্যাটারা। ও যখন ছোরা বের করতে গিয়েছিল, আমি তো ধরে নিয়েছিলাম তখনই ওকে খুন করবে লোকটা। করেই বসত, যদি তখন গাড়ি টানার জন্য ওর প্রয়োজন না থাকত।'

'অনেক কষ্টে রাগ সামলেছি তখন,' বলল যুবক। 'ওরকম অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করা কঠিন।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল বুড়ো লোকটা। 'এই অবস্থায় আমাদের আর গ্রামে ফিরে যাওয়া ঠিক হবে না। বনেই লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে ওরা।' রবিনের দিকে ফিরল। 'কিন্তু তুমি ওদের হাতে ধরা পড়লে কীভাবে ? কী করেছিলে ?'

রবিন ঘটনা খুলে বলতে ভুরু কুঁচকে উঠল তাদের। যুবক বলল, 'কী নিষ্ঠুর ওরা, কী ভয়ঙ্কর !'

উঠে পড়ল বৃদ্ধ কাঠুরে। 'যাক, এখন ওদের নাগালের বাইরে রয়েছি আমরা। যতদিন সম্ভব, এভাবেই থাকার চেষ্টা করতে হবে। আমার সাথে এসো তোমরা, আরও নিরাপদ কোথাও সরে যাই।'

কিন্তু রবিন নড়ল না। বলল, 'বাকি বন্দি দুজনের কথা ভেবে খুব খারাপ লাগছে আমার। শহরে নিয়ে গিয়ে ওদের যে কি অবস্থা করবে ব্যাটারা, বোঝাই যায়।'

'পরিষ্কার,' যুবক কাঠুরে মাথা দোলাল। তার নাম উইল।

'আচ্ছা,' বলল রবিন। 'রক্ষিরা বন্দিদেরকে নিয়ে যে পথে নটিংহ্যাম যাবে, আমরা আগে গিয়ে সেই পথের কোথাও ওদের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না ?'

'তা পারি,' মাথা ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু তাতে লাভ কি ? একদল বনরক্ষীর বিরুদ্ধে তুমি একা কি করতে পারবে ?'

'তা আমি নিজেও জানি না,' রবিন বলল। 'তবে মনটা খুব ছটফট করছে ওদের জন্য কিছু একটা করতে। তীর-ধনুকে আমার হাত বেশ ভাল। আগে জায়গামত নিয়ে চলো, তারপর ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে।'

'ঠিক আছে, বন্ধু,' উইল বলল। 'চলো তাহলে, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। বাবা,' বৃদ্ধের দিকে ফিরল। 'তুমি আমাদের সেই বুড়ো ওক গাছটার নিচে চলে যাও। সেখানে দেখা হবে আবার।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে পা বাড়াল বুড়ো, কিছুক্ষণের মধ্যে হারিয়ে গেল বনের মধ্যে। এদিকে উইলের পেছন পেছন আরেকদিকে চলল রবিন। বিশ মিনিট পর অন্য এক কোনাকুনি পথ ধরে সেই ছোট গ্রামটিতে ফিরে এল দুজনে। রাস্তার পাশের এক ঘন ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে বুঝল ঠিক সময় মতই এসেছে–সেই দুই বন্দিকে নিয়ে তখনই নটিংহ্যামের পথে যাত্রা শুরু করেছে বনরক্ষীরা।

উইলদের কাঠ টানা গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ওটার সামান্য দূরে পথের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে দ্বিতীয় বৃদ্ধের লাশ। ওটার সৎকারের বিষয় নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই ব্যাটাদের, ফেলে রেখেছে শিয়াল-কুকুরের মত।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল রবিনের। চাপা কণ্ঠে বলল, 'প্রতিশোধ নিতে হবে!'

মাথা ঝাঁকাল উইল, কিন্তু ভেবে পেল না সেটা কিভাবে সম্ভব। রবিন কিছু ভাবল, তারপর গ্রামের রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'এই রাস্তাটা কোথায় কোথায় বাঁক নিয়েছে, কি ধরনের জায়গার মধ্যে দিয়ে শহরে পৌঁছেছে বলতে পারবে?'

বলা শুরু করল যুবক, কিন্তু একটু পরই তাকে থামিয়ে দিল রবিন। 'থাক, থাক। আর বলতে হবে না। আমি জায়গা পেয়ে গেছি। একটা সমতল, খোলা জায়গার কথা বললে না তুমি? সেখানে নিয়ে চলো আমাকে। মনে রেখো, রক্ষীদের আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছতে হবে।'

জোর পায়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। জায়গামত পৌঁছে দেখল, রক্ষীরাও মাত্র তখনই সেখানে এসে পৌঁছেছে। উইলকে বনের মধ্যে অপেক্ষা করতে বলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রবিন। দূর থেকে রক্ষীদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল, 'খবরদার! বন্দিদের এখুনি ছেড়ে দাও, নইলে বিপদে পড়ে যাবে!'

সাবধানবাণী শুনে ঘুরে তাকিয়েছিল রক্ষীদের প্রধান, পরক্ষণে ওকে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল তার। কত্তোবড় সাহস! ওইটুকুন পুঁচকে ছোকরা কি না তাদের এতজনকে ধমক মারছে! কিছু বলল না সে। একটাই চিন্তা ঘুরছে মাথায়, তেড়িবেড়ি দেখে বনের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার আগেই যে করে হোক ছোঁড়াকে পাকড়াও করতে হবে। ব্যস্ত হয়ে পিঠ থেকে ধনুকটা নামাল সে, ছিলায় একটা তীর পরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুড়ল রবিনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু জায়গামত পৌঁছল না সেটা, বিশ গজ আগেই মাটিতে গেঁথে গেল।

এরমধ্যে নিজের বিশাল ধনুকটা হাতে চলে এসেছে রবিনের। তূণ থেকে একটা লম্বা তীর বের করে ছিলায় পরিয়ে লোকটাকে সই করে টানল। পরমুহূর্তে টোয়াং ! শব্দের সাথে ক্ষিপ্ত বোলতার মত বোঁ-ও-ও গুঞ্জন তুলে ছুটল তীরটা। রূপালি ঝলকের মত দ্রুত উড়ে গিয়ে ঘ্যাঁচ করে ঢুকে গেল তার গলায়, তীক্ষ্ণধার মাথাটা আধ হাত বেরিয়ে গেল পিছন দিয়ে। বিকটা আর্তনাদ করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে, দু' হাতে পাগলের মত তীরটা টেনে বের করার চেষ্টা করতে লাগল।

থমকে গেল বাকি রক্ষীরা, বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দলনেতার দিকে। এমন সময় আবার রবিনের গলা শোনা গেল। 'বন্দিদের ছেড়ে দাও ! নইলে তোমাদের কেউ প্রাণে বাঁচবে না।'

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পরের তীরটা ছুড়ল রবিন। এক বন্দিকে দু' দিক থেকে ধরে রেখেছিল দুই রক্ষী, তাদের একজনের কাঁধে গিয়ে বিঁধল সেটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এলো তৃতীয় তীর–অন্য রক্ষীর কাঁধে গেঁথে গেল। দু'জনেই আহত স্থান চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে, অসহ্য ব্যথায় তারস্বরে গলা ফাড়াচ্ছে।

ততক্ষণে দুঃসাহসী যুবকের অব্যর্থ লক্ষ্য তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে বাকি রক্ষীদের মনে, সবাই বুঝে নিয়েছে বন্দিদের দ্রুত ছেড়ে না দিলে আজ কারও রক্ষা থাকবে না। কাজেই বাকি যে দু'জন রক্ষী দ্বিতীয় বন্দিকে ধরে রেখেছিল, বিপদ বুঝে তাকে ছেড়ে এক লাফে দূরে সরে গেল তারা। অন্যদের মধ্যেও খুব দ্রুত সংক্রামিত হলো আতঙ্ক–খিঁচে দৌড় লাগাল তারা।

বাকিরাও যে যেদিকে পারে তীরের বেগে ছুটতে শুরু করল। এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না তাদের। কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে নাগালের বাইরে দাঁড়িয়েও অনায়াসে লক্ষ্যভেদ করে যাচ্ছে অকুতোভয় যুবক, অথচ তাদের তীর জায়গামত পৌঁছতেই পারছে না।

ওদিকে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কাঠুরে উইল। সামনের অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আনন্দে-উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পালাচ্ছে ব্যাটারা ! পালাচ্ছে ! পালাচ্ছে !'

কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করে বন্দিদের দিকে ছুটে গেল সে, অল্প সময় পরই আবার তাদেরকে মুক্ত করে নিয়ে এল। বেঁচে যাওয়ার আনন্দে লোক দুটো তখন আত্মহারা হয়ে গেছে, বার বার ধন্যবাদ জানাতে লাগল রবিনকে। ওর হাতে চুমু খাচ্ছে তারা, ঠিকমত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হচ্ছে না ভেবে পাগলের মত বক বক করছে।

'এবার ? এবার কী করব আমরা ?' এক সময় জানতে চাইল উইল। 'বনরক্ষীরা এবার দলে আরও ভারি হয়ে আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে। একবার ধরা পড়লে আর ... '

'তুমি ঠিকই বলেছ,' সদ্যমুক্ত দুই বন্দির একজন বলল। 'এখানে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়া উচিত।'

'কিন্তু কোথায় যাব ?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করল।

মাথা দোলাল রবিন। বলল, 'আমার সাথে এসো তোমরা। আমি তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করব।'

'কোথায় ?' উইল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মৃদু হাসল ও। ধনুকটা পাশে রেখে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। 'এমন এক জায়গায়, যেখানে নর্ম্যান আইন তোমাদের নাগাল পাবে না,' গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল।

স্যাক্সনরা বিচার পেত না। বরং বিচারের নামে তাদের সঙ্গে যা হত, তা ছিল অবিচার। তাদের ওপর প্রায়ই শেরিফের অবিচারের খাঁড়া নেমে আসত।

তাই বলতে গেলে রোজই এ ধরনের নিরুপায়দের একজন-দু'জনের আসা চলতেই থাকল। প্রথমে শেরিফের ভয়ে শেরউডে এসে গা ঢাকা দেয় তারা, তারপর রবিনের দলে আশ্রয় নেয়। এভাবে খুব দ্রুত বেড়ে চলল দলের সদস্য সংখ্যা।

একদিন রবিনের মাথায় একটা দল গঠনের চিন্তা ঢুকল। দলের জন্য কিছু কিছু নীতি-নির্দেশনাও ঠিক করল ও। সবাই বিনা প্রশ্নে ওকেই তাদের নেতা মেনে নিল। কারণ একে রবিনহুড একজন জন্ম নেতা, নেতৃত্ব দিতেই ওর জন্ম হয়েছে। তার ওপর শুধু ভাল আর অভিজাত পরিবারেই জন্ম হয়নি, বরং ওরকম একটা দল পরিচালনা করার মত ষোল আনা যোগ্যতাও আছে।

লাঠিখেলা, তরবারি চালনা এবং তীর ছোড়া, সবটাতেই অবিশ্বাস্যরকম পারদর্শী রবিন, কাজেই কিছুদিনের মধ্যে অনুচরদেরকে অস্ত্র চালনা শেখাতে শুরু করল ও। ভাল অস্ত্র নির্মাণের ওপরেও জোর দিল। তারপর নজর দিল পরিধেয়র দিকে। ঠিক হলো সবুজ রঙের ইউনিফর্ম পরবে দলের সবাই। বনের ঘাস, গাছের পাতা সবুজ। তার মধ্যে সবুজ পোশাক পরে থাকলে অনুসন্ধানী চোখ এড়িয়ে চলা যাবে। কেউ সহজে দেখতে পাবে না।

রাজার বনরক্ষীরা কেনডাল গ্রিন কাপড়ের ইউনিফর্ম পরে। রবিন ঠিক করল তার দল পরবে লিঙ্কন গ্রিন কাপড়ের ইউনিফর্ম।

কোন কারণে বনের বাইরে যেতে হলে তার ওপর সাধারণ পোশাক পরে নেয়ার নিয়মও করা হলো।

এরপর শেরউডের ঠিক মাঝখানে নিজেদের জন্য একটা স্থায়ী ঘাঁটি বানাল ও। অনুসারীদেরকে শিঙার সাহায্যে সঙ্কেত আদান-প্রদান করার নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি শেখাল। বনের জীবন আর বাইরের খোলামেলা জীবন, একসঙ্গে দুটোই চালিয়ে যেতে লাগল রবিন, যতদিন না ...

হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট

ইংল্যান্ডের সিংহ-হৃদয় রাজা রিচার্ড ক্ষমতায় বসেন ১১৮৯ সালে। কিন্তু বেশিদিন দেশ শাসন করা হয়ে ওঠেনি, কারণ ক্রুসেডে অংশ নিতে অল্পদিনের মধ্যেই জেরুজালেমে চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে। এর কিছুদিন পর দেশের নানান সমস্যা ও বিদ্রোহের কথা বলে রিচার্ডকে ফিরে আসতে বলা হয়। আসার পথে বন্দি করা হয় তাঁকে, অজ্ঞাত কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রিচার্ড কখনও প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন, খুব কম লোকেই তা বিশ্বাস করত।

দেশ ছাড়ার সময় এলির (Ely) বিশপের ওপর রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন রিচার্ড। কিন্তু তাঁর নীতিহীন ভাই, যুবরাজ জন বিশপের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেন যে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই সুযোগে জন রাজা হয়ে বসেন।

জন ছিলেন যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি নির্দয় মানুষ। তাঁর অনুসারীরাও কম-বেশি তাঁরই মত বদ ছিল। জনের টাকার লোভ ছিল সীমাহীন, তাঁর সঙ্গীদেরও তাই। তাদের টাকা রোজগারের সবচেয়ে সোজা পথ ছিল কোন ধনী লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অথবা আইন ভাঙার অভিযোগ এনে তাকে আউটল ঘোষণার ব্যবস্থা করা। আইন অনুযায়ী আউটল কোনকিছুর মালিক হতে পারে না, অতএব কাজটা করলেই তার যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি খুব সহজেই গ্রাস করা যায়। তার ওপর তাকে হত্যা করতে পারলে ফাও হিসেবে কিছু পুরস্কারও পাওয়া যায়।

যুবরাজ জন কারও সম্পত্তি গ্রাস করলে মোটা টাকার বিনিময়ে তা নিজের অনুসারীদের কাউকে দিয়ে দিতেন। সে টাকা কিভাবে এসেছে, তা নিয়ে যুবরাজ বা তাঁর অনুসারীদের কেউ মাথা ঘামাতো না। তাদের সীমাহীন লোভের হাত থেকে এমনকি কৃষক, মজুরেরও রেহাই ছিল না। এই শোষণকারীদের মধ্যে কেবল যুবরাজের পেয়ারের নাইট, ব্যারন বা ভূ-স্বামীরাই ছিল না। বিশপ, অ্যাবটের মত অনেক অর্থলোভী ধর্ম ব্যবসায়ীও ছিল।

তাছাড়া বিভিন্ন শহর ও কাউন্টির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বিপুল অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অনেক শেরিফ নিয়োগ করেন জন। তারাও ছিল এক-একটা ধাড়ি শয়তান। অসহায় ও দুর্বলদেরকে শোষণ করে যুবরাজকে ঘুস দেয়ার টাকা

রোজগার করত তারা। তারপর তাঁর নির্দেশ, সে যত অন্যায় আর যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন, নির্দ্বিধায় তা পালন করত।

জনের এরকম এক হুকুম বরদার ছিল নটিংহ্যাম শহরের শেরিফ। শেরউড বনের প্রান্তে ছোট এক শহর নটিংহ্যাম। যুবরাজ জন মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন। তাঁর কাছে নিজের আনুগত্য প্রমাণ করতে সব সময় মুখিয়ে থাকত লোকটা।

এরকম একবার যুবরাজ নটিংহ্যাম সফরে আসার পরের ঘটনা। নিজের কর্তব্যপরায়ণতা দেখাতে সন্ধের দিকে এক হতদরিদ্র ভূমিদাসের বাড়িতে এসে হাজির হলো শেরিফ। লোকটার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, সে নাকি রাজার হরিণ মেরে খেয়েছে। শেরিফ তার লোকদের নির্দেশ দিল, তার ঘরে টাকা-পয়সা পাওয়া যায় কি না তল্লাশি করে দেখতে।

যখন জানা গেল যে জিনিসটি খোঁজা হচ্ছে সেটি নেই, তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিল সে। ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত, বৃদ্ধ ভূমিদাসটিকে তার সামনে হাজির করা হলো।

'তুমি জঙ্গলের আইন জানো,' বিরক্ত চেহারায় বলল শেরিফ। 'তারপরও কেন তা ভেঙেছ?'

ভূমিদাস কোন জবাব দিল না। ভয়ে কাঁপছে। নিজের লোকদের দিকে ফিরল শেরিফ। হুকুম দিল, 'লোহা গরম করে ওর চোখ ফুটো করে দাও!'

'না, না!' চিৎকার করে কেঁদে উঠল লোকটা। 'ক্ষমা করে দিন, শেরিফ! ক্ষমা করে দিন! আর যা খুশি করুন, কিন্তু অন্ধ করে দেবন না! মেরে ফেলুন আমাকে। অন্ধ করে দিলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার প্রতিশোধ নেবেন।'

এই সময় যুবরাজ এসে পৌঁছলেন সেখানে। শেরিফের কর্তব্যপরায়ণতা চাক্ষুষ করতে এসেছেন তিনি।

'কি হচ্ছে এখানে?' শেরিফের জবাব শুনে মাথা ঝাঁকালেন, 'বিচারটা ঠিক হচ্ছে না, শেরিফ। প্রথমে আপনার উচিত ছিল এর জিভ কেটে নেয়া। যে হারে চেঁচাচ্ছে, তাতে যে কোন সময় রবিনহুডের ভূত এসে পড়ার আশঙ্কা আছে। প্যালেস্টাইনে রাজা রিচার্ডের ঘুমও হয়তো ভেঙে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি কাজ সারুন।'

'চুপ কর্, কুকুর!' লোকটার মুখের ওপর প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল শেরিফ। 'রয়্যাল হাইনেস যুবরাজ জনের সামনে এরকম শব্দ করবি না!'

'যুবরাজ জন! যুবরাজ জন!' ঢোঁক গিলল লোকটা। 'আমাকে রক্ষা করুন, স্যার! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে রক্ষা করুন!'

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলেন যুবরাজ। 'করেছে কী?'

'ওকে সবাই মাচ বলে ডাকে,' শেরিফ বলল। 'এক সময় মিলার ছিল লোকটা। কিন্তু রাজার হরিণ শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ায় ওর তর্জনী আর মধ্যমা কেটে ফেলা হয়। এই দেখুন, প্রথমবার বেআইনি তীর ছোড়ার চিহ্ন। আজ আবারও সেই অপরাধে ধরা হয়েছে একে। দ্বিতীয়বার এই অপরাধের জন্যে গরম রড দিয়ে চোরের চোখ গেলে দেয়ার বিধান আছে। তৃতীয়বারের শাস্তি সরাসরি ফাঁসি। তবে আমি নিশ্চিত, চোখ না থাকলে মাচের পক্ষে এই অপরাধ তৃতীয়বার করা সম্ভব হবে না। গন্ধ শুঁকে কেউ তীর ছুড়তে পারে, এমন কথা কখনও শুনিনি আমি। হা হা হা !' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগল শেরিফ। যুবরাজও তাতে তাল দিলেন।

'কি বলার আছে তোমার ?' সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা বুড়ো, হাড় জিরজিরে লোকটার আনত মুখের দিকে তাকালেন জন। থরথর করে কাঁপছে সে।

'দয়া করুন, মহানুভব !' ঢোঁক গিলল মাচ। 'রাজার হরিণের জন্যে পানির ধারা তৈরি করতে আর হরিণ শিকারের জায়গা প্রশস্ত করতে আমার মিল আগুন

দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার রুটি-রুজির পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমি শিকার না করলে খাবো কি ? আমার আঙুল নেই বলে সেটাও ঠিকমত করতে পারি না, মহানুভব। খরগোশ বা বুনো কবুতরও শিকার করতে পারি না। আমার দুই ছেলে ছিল। একটা না খেতে পেয়ে মরেছে। আরেক ছেলে; মাচ জুনিয়র খিদে সহ্য করতে না পেরে কান্নাকাটি করছে। গরুর মত ঘাস আর বুনো লতাপাতা খেয়ে আর কতদিন থাকব ! কতদিন শুয়োরের মত গাছের শিকড় তুলে খাবো !'

'তাই বুঝি ?' বললেন যুবরাজ। 'তাই দামী খাদ্যের দিকে নজর দিয়েছিলে ! রাজার হরিণের দিকে ! ...আর কোন উপায় ছিল না ? না, না, মাস্টার শেরিফ। এই বিচারটা আমাকে করতে দিন,' বলে মাচের দিকে মন দিলেন।

'এই রবিন লোকটা কে বলো দেখি ! আমি শুনেছি সে খুব ধনী লোক, তাই তো ? খুব নাম করা ইয়োম্যান, কোন এক অভিজাত স্যাক্সন পরিবারের একমাত্র আদরের সন্তান ! রাজার হরিণ মেরে খায়, পথচারীদের সম্পদ লুটপাট করে আর তোমার মত আইন ভঙ্গকারী আবর্জনাদের সাহায্য করে। এখন কোথায় সে ? তোমাকে উদ্ধার করতে আসছে না কেন ? বলো, সে কোথায় থাকে ! তাহলে তোমার চোখ দুটো ভিক্ষে দেব আমি। যাতে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে ওঠার দৃশ্যটা অন্তত দেখতে পারো। বলো, বলো !'

মাথা নাড়ল মাচ। 'আমি তার ব্যাপারে কিছু জানি না ! লোকে তাকে বলে শেরউডের রক্ষাকর্তা। সবার অলক্ষে, নিঃশব্দে চলাফেরা করে। দিনের বেলা কেউ তাকে দেখতে পায় না। সে ...'

'থাম্ ব্যাটা !' রাগে, বিরক্তিতে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন যুবরাজ। 'নিয়ে যাও একে। আমার চোখের আড়ালে নিয়ে কাজ সেরে ফেলো।'

চারজন রক্ষী এগিয়ে এল, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলল বৃদ্ধকে। পঞ্চমজন তারই বাড়ির জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে থেকে পুড়ে লাল হয়ে ওঠা একটা লোহার রড তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ এক ঝট্‌কা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মিলার মাচ, রক্ষীদের একজনের তরবারি কেড়ে নিয়েই যুবরাজের দিকে ছুটল। কিন্তু কয়েক পায়ের বেশি যেতে পারল না সে, পিছন থেকে 'বোঁ-ও !' গুঞ্জন তুলে একটা তীর ছুটে এসে একদম তার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেল। চোখের পলকে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বৃদ্ধ।

'চমৎকার !' বললেন জন। 'ভাল শট। অবশ্য একেবারে জানে না মেরে ব্যাটাকে আহত করতে পারলেই ভাল হতো। মরা মানুষ রবিনকে আকৃষ্ট করতে পারবে বলে মনে হয় না। ইয়ে ... তীরটা ছুঁড়ল কে ?'

বলতে বলতে ঘুরে তাকালেন যুবরাজ। দেখলেন বাদামি চামড়ার সুটের ওপর সবুজ গাউন পরা খাটোমত এক লোক এগিয়ে আসছে। সামনে এসে ঝুঁকে অভিবাদন করল সে।

'মাই লর্ড, আমার নাম ওরম্যান। আমি হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট ফিযূথের স্টুয়ার্ড।'

যুবরাজের মুখের প্রশ্রয়ের হাসিটা মুহূর্তে ভেঙচিতে পরিণত হলো। চাউনি রাগে জ্বলে উঠল। 'আর্ল না হাতি !' ক্রুদ্ধ গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি। 'এসব ফালতু কথা আগেও আমার কানে এসেছে ! আর যেন না আসে। হান্টিংডনের আর্লের নাম ডেভিড লর্ড ক্যারিক, মনে থাকে যেন ! নর্দাম্বারল্যান্ডের ছেলে। সে যা-ই হোক, তুমি কেন এসেছ ?'

'মাফ করবেন, মাই লর্ড,' ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল ওরম্যান। 'এদিকে সবাই ফিযূথকেই হান্টিংডনের আর্ল বলে সম্বোধন করে থাকে। তাছাড়া তিনি আমার মনিব। তাঁকে আমার অন্য কিছু সম্বোধন করা ঠিক হবে না।'

মাথা দোলালেন যুবরাজ। 'এই আর্ল সম্পর্কে আরও ভাল করে জানতে হবে তো ! সে কি অনুগত, তোমার কি মনে হয় ?'

'হ্যাঁ, তবে রাজা রিচার্ডের প্রতি,' অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল স্টুয়ার্ড।

'রিচার্ড ! রিচার্ড !' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যুবরাজ জন। 'সবখানে শুধু রিচার্ড আর রিচার্ড ! রিচার্ড মরে গেছে ! নয়তো কোন পাতাল কক্ষে পচছে দেখো গিয়ে ! খুব শিগগিরই মরবে ! পাগল চারণের বাচ্চা ব্লনডেল কখনও তার খোঁজ পাবে না। এখন আমিই ইংল্যান্ডের রাজা। এই ফিযূথ লোকটা ... টাকা-পয়সা কেমন আছে এর ? জায়গা-জমি ?'

'আগে প্রচুর জমির মালিক ছিল তাঁর পরিবার,' ওরম্যান বলল। 'কিন্তু এখন শুধু লকসলির বাড়ি আর অল্প কিছু জমি আছে। বাকি জমি বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।'

'তাই নাকি ? তাহলে নিশ্চয়ই তার সিন্দুক সোনায় ভর্তি !'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল লোকটা। 'তা বলতে পারব না, মাই লর্ড। আমি শুধু জানি কোন এক গোপন কারণে সবসময় প্রচুর টাকার প্রয়োজন লেগেই থাকে আমার মনিবের। বাড়ির অন্যরাও কিছু জানে না সে ব্যাপারে। কেবল তাঁর বন্ধু ও বডিগার্ড, উইলিয়াম স্ক্যাথলক জানে।'

'তোমার মনিবের সাথে ছদ্মবেশে দেখা করা সম্ভব, বলো দেখি ! যদি তার কথায় কোনরকম বিদ্রোহের বা বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাই, তাহলে ... ওই সিন্দুক খুলে ভেতরে চোখ বোলাতে কোন বাধা থাকবে না আমার। তখন তুমিও তোমার ন্যায্য ভাগ পাবে, বন্ধু। অবশ্য যদি নিজেকে বিশ্বস্ত এবং আমার প্রতি অনুগত প্রমাণ করতে পারো, তবেই।'

'মনিবের বিরুদ্ধাচরণ করতে বলছেন ?' বলল ওরম্যান। 'বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছেন ?' বলে কিছু সময় চিন্তা করল লোকটা। 'ঠিক আছে। শত হলেও আপনি আমার রাজা। আপনার নির্দেশ মানা আমার জন্যে বেশি জরুরি। শুনুন তাহলে, মাই লর্ড। আগামীকাল ফাউন্টেইনস অ্যাবিতে লর্ড ফিটজওয়াল্টারের মেয়ে, মেরিয়ানকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন আমার মনিব, আর্ল রবার্ট। সে জন্যে

আজ রাতে তাঁর নিজের বাড়ি লকসলি হলে বিশাল এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। তাতে যে যোগ দিতে যাবে, তাকেই স্বাগত জানানো হবে। কারও ওপর বিশেষ নজর রাখা হবে না। যদি আপনি আর শেরিফ সেখানে যান, ধরুন, পবিত্র ভূমি ফেরত তীর্থযাত্রীর বেশে, রাজা রিচার্ডের কোন বানানো গল্প নিয়ে–নিঃসন্দেহে দারুণ অভ্যর্থনা পাবেন আপনারা।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যুবরাজ জন। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই চট্ করে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, 'সাবাশ, বন্ধু ! তোমার পরিকল্পনা বেশ ভাল, আমার পছন্দ হয়েছে। এসো আমার সাথে। মাস্টার শেরিফ, আপনিও আসুন। লোকজন প্রস্তুত করে যাত্রার আয়োজন করুন। সময় বেশি নেই। লাশটা থাক পড়ে। রবিন দেখে হয়তো সতর্ক হবে।'

****

কিছুক্ষণ পর সদলবলে সন্ধের ধূসর অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন যুবরাজ। নীরবতা নেমে এল শেরউডে। তার মধ্যে এই ঝোপ, সেই বাঁকের মুখে একটা দু'টো করে মানুষের আকৃতি দেখা দিতে শুরু করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চারদিক থেকে মৃত মাচের দেহটাকে ঘিরে ধরল তারা।

'মরে গেছে,' দেহটা পরীক্ষা করে বলল তাদের একজন। 'তা-ও ভাল অন্ধ করে রেখে যায়নি। দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে আমাদের।'

'ঠিক বলেছ,' অন্য একজন বলল বিষণ্ন কণ্ঠে। 'কিন্তু রাজা ক্রুসেড থেকে ফিরলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তৃতীয়জন বলল, 'কিন্তু যদি না ফিরে আসে, তাহলে শয়তান যুবরাজ রাজা হয়ে বসবে। তখন আমাদের কি অবস্থা হবে ঈশ্বরই জানেন।'

'সে তো পরের কথা,' চতুর্থ কণ্ঠ বলে উঠল। বৃদ্ধ মাচের মৃতদেহের পাশে কাঁদতে থাকা এক কিশোরকে দেখাল লোকটা। 'এখনকার কথা ভাবো। বাপটা তো মরল, এখন ছেলে মাচের কি উপায় হবে ? এতিম ছেলেটার জন্যে কি করা যায় ? ও তো না খেয়ে মরবে।'

'রবিনহুড নিশ্চয়ই তা হতে দেবে না। ওই দেখো, তার লোক আসছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের মত অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে ঈশ্বর রবিনহুডের মঙ্গল করুন।'

এক লম্বা লোক এসে দাঁড়াল তাদের মধ্যে। তাকে স্থানীয়রা উইল স্কারলেট নামে চেনে। চল্লিশের মত বয়স লোকটার। তার নামের সাথে লালচে বাদামি ও টকটকে লাল পোশাক একদম মিলে গেছে।

'সাহস হারিয়ো না, বন্ধুরা !' কাঁধের ভারি বোঝাটা মাটিতে রেখে বলল উইল স্কারলেট। 'তোমাদের কথা ভেবে রবিনহুড এই সামান্য উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

সে জানে শেরিফ তার লোকজন নিয়ে আজ সারাদিন বনের মধ্যে কাটিয়েছে। আর তারা যেখান দিয়ে যায়, সেখানে শুধু অভাব আর দুঃখ-বেদনাই থাকে।'

'ঈশ্বর রবিনহুডকে রক্ষা করুন !' উপস্থিত সবাই একযোগে বলল। কিন্তু কিশোর মাচের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। যেমন নতমুখে বসে ছিল, তেমনি থাকল। স্কারলেট কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল।

'শান্ত হও, মাচ,' মৃদু গলায় বলল সে। 'খুব দ্রুত মৃত্যু হয়েছে তোমার বাবার। বিনা কষ্টে মরেছে সে। দেখো, তীরটা একেবারে হৃৎপিণ্ডে ... আশ্চর্য !' গলা খাদে নেমে গেল তার। 'এই তীর কোত্থেকে এল ? এটা তো নটিংহ্যাম আর্মারির তীর না ! রবিনহুডের তীরের মত !'

'উইল স্কারলেট !' কিশোর মাচ ডাকল। 'আমাকে তোমার সাথে নিয়ে চলো। আমি জানি আমার বয়স মাত্র বারো, কিন্তু তবু আমার বাবার হত্যাকারীদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাই আমি।'

'প্রতিশোধ না,' মৃদু কণ্ঠে বলল স্কারলেট। 'আমরা প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে লড়াই করি না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে লড়াই করি। আচ্ছা, চলো। আমাদের দলে তোমার মত অল্পবয়সী, কিন্তু সাহসী ছেলেদের দরকার আছে।'

'ঈশ্বর রবিনহুডকে রক্ষা করুন !' একযোগে বলে উঠল উপস্থিত সবাই। 'রাজা রিচার্ড ও রবিনহুডকে রক্ষা করুন !'

লকসলির রবার্ট যেভাবে আউটল হলো

সে রাতের লকসলি হলের সাড়ম্বর প্রাক-বিবাহ ভোজ উৎসব হাসি-আনন্দের মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল।

পরদিন উইলিয়াম ফিযূথের একমাত্র সন্তান, হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট ফিযূথের বিয়ে হবে প্রেমিকা মেরিয়ান ফিটজওয়াল্টারের সঙ্গে। সেই উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবের। আর্লের বন্ধু-বান্ধব এবং প্রজারা তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে।

আর্ল রবার্ট বিশাল ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে অতিথিদেরকে সাদর অভর্থনা জানাচ্ছে। ত্রিশের মত বয়স তার। লম্বা, একহারা মানুষ। সুঠাম দেহের অধিকারী এবং অত্যন্ত সুদর্শন। চুলের রং বাদামি। গালে খাটো চাপদাড়ি। চোখের রং উজ্জ্বল–চাউনিতে দয়া ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দুটোই আছে।

মানুষটার চলা-ফেরা আর ওঠা-বসা দ্রুত, কিন্তু তাতে ব্যস্ততা নেই। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায়, একজন জন্ম নেতা বাস করে তার মধ্যে। যে সবকিছু একদম স্পষ্ট দেখতে পায়, মুহূর্তে নির্দেশ দিতে পারে এবং ঠাণ্ডা মাথায় খুব দ্রুত, নির্ভুলভাবে তা কার্যকর করতেও পারে।

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপা লেডি মেরিয়ান। আর্লের চাইতে বছর পাঁচেকের ছোট হবে সে। দীর্ঘদেহী এবং অসম্ভব সন্দরী। রবার্টের পত্নী হওয়ার মত যোগ্য নির্ভীক ও উপযুক্ত এক নারী। তীর ছোঁড়া এবং তরবারি চালনায়ও রবার্টের চেয়ে কোন অংশে কম নয় সে।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিমন্ত্রিত অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে রবার্ট ও মেরিয়ান। তাদের অভিনন্দন গ্রহণ করছে। অতিথিরা হবু নব-দম্পতির উদ্দেশে থেকে থেকে তাদের পানপাত্র তুলে ধরছে, স্যাক্সন রীতিতে তাদের প্রেমের স্বীকৃতি স্বরূপ সমস্বরে প্রাচীন গান গাইছে।

এরমধ্যে স্টুয়ার্ড ওরম্যানের পেছন পেছন দুই তীর্থযাত্রী এসে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। গানে অংশ নিতে বা টোস্ট করতে তেমন আগ্রহী মনে হলো না তাদেরকে।

'আমি এখানে বিশ্বাসঘাতকতার গন্ধ পাচ্ছি !' একটু পর বিড়বিড় করে বললেন যুবরাজ জন।

'এটা বিশ্বাসঘাতকদের আখড়া, ইয়োর হাইনেস,' বলল তাঁর সঙ্গী শেরিফ। 'অপেক্ষা করুন, অল্প সময়ের মধ্যে হাতেনাতে তার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।'

যেন কথাটা সত্যি প্রমাণ করতেই লিঙ্কন গ্রিন পরা একদল লোক গেয়ে উঠল :

রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন,
রবিন ও রিচার্ড !
রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন,
জন নিপাত যাক !
সবাই সিংহ-হৃদয় রিচার্ডের
স্বাস্থ্য পান করো !

'জন নিপাত যাক ? বটে !' দাঁতে দাঁত চাপলেন যুবরাজ। একটু পর আবার বললেন, 'ওরম্যানের অনুগত্য নিয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। বুদ্ধি ভালই দিয়েছিল লোকটা। কে এল ?' দরজার দিকে তাকালেন তিনি।

তাঁর দেখাদেখি শেরিফও ঘুরল সেদিকে। বিড়িবিড় করে বলল, 'কে লোকটা ? চিনলাম না !

লালচে-বাদামী ও টকটকে লাল পোশাক পরা লম্বা এক লোককে ভেতরে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। এক হাতে বারো-তেরো বছরের একটা ছেলের হাত ধরে আছে সে। পয়েন্টার কুকুর শিকারের গন্ধ পেলে যেমন করে, দ্বিতীয় তীর্থযাত্রী ঠিক তেমনি শক্ত হয়ে গেল আগন্তুককে দেখে।

'মাই লর্ড,' যুবরাজের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল সে। 'ওই ছেলেটা মিলার মাচের ছেলে, যাকে দ্বিতীয়বার অবৈধ হরিণ শিকারের অভিযোগে আমরা শাস্তি দিতে যাচ্ছিলাম। কয়েক ঘণ্টা আগে বনের মধ্যে যাকে হত্যা করেছে স্টুয়ার্ড ওরম্যান।'

'তাই নাকি ! এই আর্ল ব্যাটা এইসব বিশ্বাসঘাতক আর অপরাধীদেরকে আশ্রয় দেয় নাকি ? ওই যে, ওরম্যান আসছে।'

'এবার কি, মাস্টার ওরম্যান ?' নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল শেরিফ। 'এসব কি চলছে এখানে ?'

'ও হচ্ছে আমার মনিব আর্ল রবার্টের লোক, মাস্টার শেরিফ। নাম উইলিয়াম স্ক্যাথলক। বিকেলের সেই বদমাশ হরিণ চোরের ছেলেকে নিয়ে এসেছে লোকটা। যাকে আমি হত্যা করেছি ইয়োর হাইনেসের প্রতি হুমকি মনে হওয়ায়।'

'হুঁম !'

শেরিফ বলল, 'বলে যান।'

'ইয়োর হাইনেস,' যুবরাজের দিকে ফিরল স্টুয়ার্ড, 'আমি ছেলেটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করেছি। কার কাছে তা শুনে কাজ নেই। শুনেছি, আমরা চলে আসার

পর উইল স্কারলেট নামে এক লোক গিয়ে ছেলেটাকে রবিনহুডের কাছে পৌঁছে দেয়ার কথা বলে নিয়ে এসেছে।'

'উইলিয়াম স্ক্যাথলক ! উইল স্কারলেট ! রবিনহুড !' বিড়বিড় করে বললেন যুবরাজ। 'এসব কি শুনছি আমি ? মাস্টার ওরম্যান, আর আপনি, স্যার শেরিফ ! আমাদের ভাগ্য এত ভাল হবে, কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমি।'

'মানে ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল শেরিফ।

'বুঝতে পারছেন না ? মাস্টার ওরম্যানের তথ্য অনুযায়ী উইল স্কারলেট মাচের ছেলেকে রবিনহুডের কাছে পৌঁছে দেবে বলে নিয়ে এসেছে। অথচ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, সেই একই ছেলে উইলিয়াম স্ক্যাথলকের সাথে রবার্ট ফিযূথের কাছে এসেছে। আবার এদিকে শুনি, রবার্ট ফিযূথ নাকি তার সমস্ত জমি-জমা বিক্রি করে দিয়েছে। কোন রহস্যজনক কারণে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয় তার। এটাই তো বিশ্বাসঘাতকতার সবচেয়ে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ওই যে সবাই গাইছে, 'রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন, রবিন আর রিচার্ড !', এসবের চেয়ে আরও বড় কোন প্রমাণের দরকার আছে কি ?'

বাঁ হাতের তালুতে আস্তে করে ঘুসি মারলেন যুবরাজ। 'তার মানে তথাকথিত আর্ল রবার্টই রবিনহুড ! ঠিক আছে। রিচার্ড বা রবিন যে-ই হোক না কেন; আগামীকাল ওকে আউটল ঘোষণা করা হবে। মাস্টার শেরিফ, সাথে সাথে লোকটাকে ফাঁসিতে ঝোলাবেন আপনি। তারপর আমি তার যাবতীয় সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করব। আর ওই সুন্দরী মেয়েটি, লেডি মেরিয়ান, ওর একজন স্বামী চাই। আমার প্রতি নিবেদিত এরকম একজন ... হ্যাঁ, পেয়েছি ! স্যার গাই অভ গিসবোর্ন ওর উপযুক্ত স্বামী হতে পারে। তার হাতেই তুলে দেয়া যায় মেরিয়ানকে। তাহলে ওর বাবা আর স্যার গাই, দু'জনের তরফ থেকেই মোটা অঙ্কের যৌতুক পাওয়া যাবে।'

***

পরদিন সকালের কথা।

ফাউন্টেইনস অ্যাবিতে রবার্ট ও মেরিয়ানের বিয়ে অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু সেখানকার বাতাসে কেমন উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছোঁয়া। লর্ড ফিটজওয়াল্টারকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, যদিও মেরিয়ান একদম স্বাভাবিক। রবার্টের অপেক্ষায় বেদির পাশে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পর নিজের তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে অ্যাবির দরজায় পৌঁছল হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট। কনে মেরিয়ানের বাবা লর্ড ফিটজওয়াল্টারের বিস্ময় আর অ্যাবটের চরম বিরক্তি উপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকে সু-সৃঙ্খল আর্মির কায়দায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল তার বাহিনী, তীর-ধনুক হাতে। যে কোন ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এরপর সুদর্শন আর্ল রবার্ট সন্তুষ্ট মনে মেরিয়ানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বিরস মুখে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে লাগল বেঁটে, মোটা অ্যাবট। কিন্তু পাত্র-পাত্রীকে বিয়ের বাঁধনে বেঁধে দেয়ার কাজ শেষ হওয়ার আগেই বাইরে অনেকগুলো ঘোড়ার দ্রুতবেগে ছুটে আসার শব্দ উঠল। একটু পর আরও একদল লোক এসে ঢুকল অ্যাবিতে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে খোলা তরবারি হাতে দীর্ঘদেহী এক নাইট। লোকগুলোকে দেখে কিছু একটা আশঙ্কা করে ভয় পেয়ে গেল অ্যাবট।

'এসবের অর্থ কি ?' গলা কেঁপে গেল তার।

'এ বিয়ে বন্ধ করা !' চড়া গলায় বলল নাইট।

'আপনি কে ?'

'আমি স্যার গাই অভ গিসবোর্ন।'

লোকটাকে ভাল করে দেখল রবিনহুড। শকুনের মত বাঁকা, লম্বা নাকওয়ালা ভয়ঙ্কর চেহারা। গালের চামড়া কোথাও কোথাও ভাঁজ খেয়ে আছে। ঠোঁট জোড়া সরু ও চাপা। চোখের দিকে তাকালে গায়ের মধ্যে শিরশির করে। লোকটা যে ভীষণ বদ, নিচ এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের, তা এক পলকেই বোঝা যায়।

লোকটা সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে ও। তবে সামনাসামনি দেখা এই প্রথম। নামে স্যার গাইকে খুব ভাল করেই চেনে ও। এর গায়ে কাঁটা দেয়া অনেক নিষ্ঠুরতার কথাও জানে। এতো নিচ, জঘন্য চরিত্রের মানুষ সারা ইংল্যান্ডে আর একজনও আছে কি না সন্দেহ।

'রাজার হুকুমে এ বিয়ে বন্ধ করতে এসেছি,' অ্যাবটের দিকে ফিরে বলল লোকটা। 'পারসিভেন্ট (পরিচারক), রাজার ম্যান্ডেট পড়ে শোনাও !'

নটিংহ্যামের শেরিফের লিভারির পোশাক পরা এক লোক এগিয়ে এল। হাতের মোড়ানো এক টুকরো পার্চমেন্ট মেলে ধরে উঁচু গলায় পড়তে শুরু করল : সমগ্র ইংল্যান্ডের শাসনভার পরিচালনায় নিয়োজিত যুবরাজ জনের নামে সবাইকে জানানো যাচ্ছে যে, লকসলির রবার্ট ফিযূথ, বা হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট আসলে আর কেউ নয়, বরং স্বয়ং রবিনহুড। রাজার আইন মানে না সে, রাজার শত্রুদের সহায়তা করে। অর্থাৎ সে বিশ্বাসঘাতক। এই সনদবলে তাকে আউটল ঘোষণা করা হচ্ছে। তার যাবতীয় জমি-জমা ও সহায়-সম্পদ রাজা রিচার্ড ও যুবরাজ জনের নামে বাজেয়াপ্ত করা হলো।'

'স্যার গাই,' লোকটার বলা শেষ হতে শান্ত কণ্ঠে বলল রবার্ট। 'বড় দুর্বল সব যুক্তি নিয়ে এসেছ। আমি তোমার এই ম্যান্ডেটের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। ওটার সাথে রাজা রিচার্ডের স্বাক্ষর সংযুক্ত করা আছে কি না দেখাতে পারবে ? আর দেশের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব যুবরাজ জনকে দেয়া হয়েছে নাকি এলির লর্ড বিশপকে, সেটাও আমি জানি। তাছাড়া যদি প্রশ্ন করি আমি কবে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, জবাব দিতে পারবে তুমি ? সবচে' বড় কথা, আমি রবার্ট

ফিযুথ, হান্টিংডনের আর্ল, লকসলির একজন সম্মানিত ব্যক্তি। কোথাকার কোন গেছোভূত রবিনহুড, গল্প-গুজবে আর অশিক্ষিত, মূর্খদের কু-সংস্কারে ছাড়া বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই, সে কবে কোথায় অবৈধ কাজ করেছে, আমি কেন তার কৈফিয়ত দিতে যাব ?'

মুখ বাঁকা করে হাসল স্যার গাই। 'হয়েছে। তুমিও এখন ওসব রূপকথা বাদ দাও। সবাই জানে তুমি চিরকাল আইন ভঙ্গ করে এসেছ। তুমি ভূমিদাসদেরকে তাদের মনিবদের বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছ। এই যে তুমি নিজেকে হান্টিংডনের আর্ল বলছ, এটা কি বিশ্বাসঘাতকতা নয় ? নর্ম্যান উইলিয়ামকে রাজা বলে স্বীকার না করার অপরাধে অনেক আগেই পুরনো স্যাক্সন আর্লদের পদবি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে আউটল ঘোষণা করা হয়েছে। তোমার জায়গায় নর্দাম্বারল্যান্ডের ছেলে ডেভিড লর্ড ক্যারিককে আর্ল করা হয়েছে, তুমি তা জেনেও স্বীকার করো না।

'আর রবিনহুডের আসল পরিচয়ের প্রশ্নে বলছি, শেরউড দিয়ে আসা-যাওয়া করে এমন কোন ভ্রমণকারী নেই যে রবিনহুডের আস্তানায় রাজার হরিণের মাংসের স্বাদ নেয়নি। তোমার দলে সমাজচ্যুত কতোজন আছে লোকে যাদেরকে রবিনহুডের অনুসারী বলে জানে ? তার সহকারী উইল স্কারলেট তোমার লকসলি হলে গিয়ে উইলিয়ম স্ক্যাথলক হয় কীভাবে ? এতসব প্রশ্নের একটারও জবাব দিতে পারবে ? আছে তোমার কাছে জবাব ?'

হেসে উঠল স্যার গাই। মাথা ঝাঁকাল। 'আমি জানি নেই। কি, ঠিক বলিনি ? আর মিলার মাচের ছেলের ব্যাপারে তোমার কি বলার আছে ? যাকে রবিনহুড দেখাশুনা করার জন্যে নিজের কাছে নিয়ে গেছে ? কাল সে তোমার লকসলি হলে কেন গিয়েছিল ?'

বেশ কিছু সময় নিরুত্তর থাকল রবার্ট। মনে হলো কিছু বলতে গিয়েও বলল না। শেষ সময়ে সামলে নিয়ে অন্য কিছু বলল সে।

'ঠিক আছে তাহলে, স্যার গাই,' শান্ত, অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে। 'আজ, এই মুহূর্ত থেকে হান্টিংডনের আর্ল রবার্ট ফিযুথের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলো। আজ থেকে সে আনুষ্ঠানিকভাবে রবিনহুড হয়ে জন্ম নিল। তুমি, তোমার শেরিফ এবং যুবরাজ জন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নামের আতঙ্ক নিয়ে বাঁচতে হবে তোমাদেরকে। শুধু তোমাদেরকেই না, তোমাদের মত আর যারা আছে, যারা গরিবের রক্ত খেয়ে গায়ে চর্বি বানিয়েছে–সেইসব বিশপ, অ্যাবট, নর্ম্যান নাইট, ব্যারন, তাদের সবার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে। যারা রাজার আইন ভাঙে, গরিব, অসহায়দের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে ঈশ্বরের আইন ভাঙে, রবিনহুড যতদিন শেরউডে রাজত্ব করবে, ততদিন তাদেরকে রবিনহুড নামের আতঙ্কের সাথে সহবাস করতে হবে। রাজা রিচার্ড যতদিন না ফিরে এসে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করছেন, ততদিন পর্যন্ত এখানে আমার আইন চলবে।'

পাশে দাঁড়ানো মেরিয়ানের দিকে ফিরল রবার্ট। মেরিয়ানও তার দিকে তাকিয়ে আছে। 'লেডি মেরিয়ান, তুমি দেখেছ আমি কিভাবে আর্ল থেকে সাধারণ এক আউটল রবিনহুড হয়ে গেছি। এই সমাজে আমার ঠাঁই নেই। তাই এখন নিজের জন্মস্থান, শেরউডে ফিরে যাচ্ছি আমি। তার আগে তোমার মনের কথাটা জানতে চাই। তুমি কি সাধারণ আমাকে ভালোবাসতে পারবে, নাকি আর্ল রবার্টকে ?'

'আমি কোন আর্ল বা আউটল বুঝি না,' মৃদু গলায় বলল সে। 'আমি যাকে ভালোবাসি, যাকে বিয়ে করব, সে একজনই। সে তুমি।'

সন্তুষ্ট হলো রবিন। 'অনুষ্ঠান যদিও পুরো শেষ হয়নি, তবুও আমি মনে করি ঈশ্বরের এবং এখানে উপস্থিত দর্শকদের চোখে আমরা দু'জন স্বামী-স্ত্রীর চেয়ে কোন অংশে কম নই।'

মেরিয়ানের বাবার দিকে ফিরল ও। 'মেরিয়ানকে আমি আপনার জিম্মায় তুলে দিয়ে যাচ্ছি, লর্ড ফিটজওয়াল্টার। ওকে আপনার আরলিংফোর্ড দুর্গে নিয়ে যান। কড়া নজরে রাখবেন। রাজা রিচার্ড ফিরলে আমি আপনার জিম্মা থেকে আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে আসব মনে রাখবেন।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, রবিন,' মেরিয়ান আশ্বস্ত করতে চাইল ওকে। 'আজ থেকে তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার প্রভু। তোমাকে যদি না পাই, তাহলে কুমারী অবস্থায় মরব, তবু আর কোন পুরুষের দিকে ফিরে তাকাব না।'

লর্ড ফিটজওয়াল্টারের দিকে ফিরল ও। 'দুর্গে ফিরে যান। তুমিও চলে যাও, মেরিয়ান। না, তুমি থাকলে আমার কোন উপকার হবে না। চলে যাও। জলদি !'

'হয়েছে !' ধমকে উঠল স্যার গাই অভ গিসবোর্ন। 'এবার এসো, আউটল রবিনহুড। তুমি উপস্থিত সবার সামনে নিজের যাবতীয় অপরাধ নিজ মুখেই স্বীকার করেছ। কাজেই এবার অস্ত্র রেখে তোমার প্রভু যুবরাজ জনের প্রতিনিধির কাছে নিজেকে সমর্পণ করো। তাহলে তিনি ক্ষমা করবেন তোমাকে।'

'ক্ষমা ?' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'যুবরাজের মনে ক্ষমা বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই ! সে শুধু জানে নিজের শয়তানি ইচ্ছা পূরণ করতে। আর তোমরা জানো তার সেবা করতে। অস্ত্র তুলে দিতে বলছ ? দিচ্ছি !'

বলেই বিদ্যুৎ গতিতে তরবারি বের করে ফেলল রবিন, পাশ থেকে স্যার গাইয়ের মাথার লোহার শিরস্ত্রাণের ওপর সজোরে আঘাত করল। বাধা দেয়া তো দূরের কথা, ভালমত ব্যাপার বুঝে ওঠার সময়টাও পেল না স্যার গাই। তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

'বাঁচাও !' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবট। 'খুন, খুন ! বাঁচাও !'

মঙ্ক আর ফ্রায়াররা ভয়ে চ্যাপেলের মধ্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। কে আগে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, সেই প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল তারা। এদিকে রবিনের বাহিনী স্যার গাইয়ের বাহিনীকে এমনভাবে কোণঠাসা করে ফেলল, যাতে তারা চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়।

একটু পর বাইরে বেশ কিছু ঘোড়ার শব্দ উঠল। মেরিয়ানের বাবার অনুসারী ওরা। লর্ড এবং তার মেয়েকে নিয়ে তুফান বেগে আরলিংফোর্ড দুর্গে ফিরে যাচ্ছে। যখন রবিনের মনে হলো ওরা নিরাপদ দূরে চলে গেছে, তখন নিজেরাও অ্যাবি থেকে বেরিয়ে এল। শেরউডের ভেতর দিয়ে লকসলি হলের দিকে চলল।

একটু পর চোখ মেলল স্যার গাই অভ গিসবোর্ন। তখনও ঠিকমত হুঁশ ফেরেনি। কোনমতে টলতে টলতে মেঝে থেকে উঠল সে। চ্যাপেলের মেঝেতে পড়ে থাকা নিজ দলের আহত লোকজনের কাতরানি কানে যেতে সব কথা মনে পড়ে গেল তার। কি ঘটে গেছে বুঝতে পেরে যখন নিজের লোকদেরকে নতুন করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করল সে। রবিনহুড তখন দলবল নিয়ে তার নাগালের অনেক বাইরে চলে গেছে।

'এখন আর ওদেরকে অনুসরণ করে কোন লাভ নেই !' হতাশ হয়ে বলল সে। 'ঈশ্বরের গজব পড়ুক রবার্ট ফিযূথের ওপর !' একটু পর আবার বলল, 'ব্যাটা যদি লকসলি হলের দিকে যায়, তাহলে শেরিফ আর মাস্টার ওরম্যানের মুখে পড়বে। তখন বুঝবে।'

নিজের লোকদের মধ্যে যারা সুস্থ, তাদেরকে আহতদের শুশ্রূষা করার নির্দেশ দিয়ে চ্যাপেল থেকে অ্যাবিতে চলে এল স্যার গাই। ভেতরে পানপাত্র ভরছে আর ঢক্‌ঢক্ করে ওয়াইন গিলছিল বেঁটে, মোটা অ্যাবট। একটু আগে কানের পাশ দিয়ে ভীতিকর আওয়াজ করে উড়ে যাওয়া তীরগুলোর কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না লোকটা। এখনও একটু একটু কাঁপছে।

স্যার গাইকে দেখে রাগে ফুঁসে উঠল সে। 'একটা অধার্মিক শয়তান লোকটা ! ওকে আউটল ঘোষণা করে ঠিকই করেছেন। ওর ধড় থেকে মাথাটা যে আলাদা করে দিতে পারবে, ঈশ্বর যেন তার সুরক্ষা করেন।'

'একটা বিপজ্জনক চরিত্র,' স্যার গাই মাথা দোলাল। ব্যথা পাওয়া জায়গায় হাত রেখে চেহারা বিকৃত করে তাকাল। 'পালিয়ে গেল বলে দুঃখ হচ্ছে। কারণ এখন সে আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।'

'হলো না !' পাশ থেকে আপত্তির সুরে বলে উঠল এক মঙ্ক। ফাউন্টেইনস অ্যাবির মঙ্কদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, সবচেয়ে মোটা সে। তার চেহারাও সবার চেয়ে বেশি লাল। 'আর্ল রবার্ট আসলে একজন গুণী মানুষ। ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ মার্কসম্যান সে। যে কোন ফরেস্টার বা তীরন্দাজকে লক্ষ্যভেদে হারিয়ে দিতে পারে।'

'ব্রাদার মাইকেল ! ব্রাদার মাইকেল !' বলল অ্যাবট। 'এসব কি কথা ? আপনার কথায় তো বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। একজন আউটল কি করে গুণী মানুষ হতে পারে ? আর তীরন্দাজ হিসেবে ...'

'যে কোন ইয়োম্যানের সাথে লং বো নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে সে,' আবার বলল লোকটা। 'দুইশো কদম দূর থেকে একটা উইলোর ডাল দু' ভাগ করেও দিতে পারে।'

'তা হয়তো পারে,' ফ্রায়ারের দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে বলল স্যার গাই। 'কিন্তু এখন সে আউটল। এখন যত তাড়াতাড়ি তার হৃৎপিণ্ডে একটা তীর ঢুকিয়ে দেয়া যায়, ততই ভাল।'

'ওরকম একজনকে আউটল ঘোষণা করা বিপজ্জনক ব্যাপার,' তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বলল লম্বা ফ্রায়ার। 'আপনি তার বাড়ি দখল করে নিয়েছেন, কোথায় থাকবে সে ? আর কোথায়, বনে !'

'কি !' বুঝতে না পেরে বলল স্যার গাই।

ফ্রায়ার পাত্তা না দিয়ে বলে চলল, 'আপনি তার গবাদি পশু, তার শুয়োরের পাল কেড়ে নিয়েছেন। তো সে খাবে কি ? কেন, রাজার হরিণ ! আপনি তার টাকা-পয়সাসহ সবকিছু কেড়ে নিয়েছেন, তাহলে সে আপনার টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র কেড়ে নেবে না কেন ? হায়, হায় ! কোন নাইট, শেরিফ, অ্যাবট বা বিশপ, কেউ তার হাত থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে না এখন !'

'এই জন্যেই তো লোকটাকে খুব দ্রুত পাকড়াও করতে চাইছি,' স্যার গাই বলল। 'কিন্তু ফাদার অ্যাবট, বলুন দেখি, লর্ড ফিটজওয়াল্টার কি করে তার ওরকম অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটিকে ফিযূথের মত একজনের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন ? যেখানে বাপ-মেয়ে দু'জনেই জানে লোকটা রবিনহুড ?'

'হ্যাঁ, মেয়েটা সত্যি ভারি সুন্দরী,' অ্যাবট কিছু বলার আগেই লম্বা ফ্রায়ার বলে উঠল। 'সুন্দরী এবং গুণী মেয়ে। আমি ওর কনফেসর। তরবারি বা লাঠিখেলায় অথবা লং বো দিয়ে তীর ছুঁড়তে একেবারে রবিনহুডের মতই পারদর্শী মেরিয়ান। একজন গুণী লোকের উপযুক্ত সঙ্গিনী বটে।'

'এই ঔদ্ধত্যের জন্যে আপনাকে শাস্তি পেতে হবে,' বলল অ্যাবট। রাগে ফেটে পড়ার দশা হয়েছে। 'ভুগতে হবে আপনাকে, মনে রাখবেন।'

'একদম না !' সমান তেজের সাথে বলল ফ্রায়ার। 'আমি সে জন্যে এখানে বসে থাকব না। আরলিংফোর্ড দুর্গে গেলে লর্ড ফিটজওয়াল্টার খুশি মনেই আমাকে স্বাগত জানাবেন। আমি সেখানে বসে ধর্ম চর্চা করব।'

'আমিও আপনার সাথে যাব তাহলে,' স্যার গাই অভ গিসবোর্ন বলল। 'লেডি মেরিয়ানকে আরেকবার দেখে নয়ন সার্থক করতে চাই। চেষ্টা করে দেখব, তাকে টোপ বানিয়ে রবিনকে ফাঁদে ফেলা যায় কি না।'

শেরউডের আউটল বাহিনী

পরদিন খুব সকালে আরলিংফোর্ড দুর্গের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল স্যার গাই। তার পথ-প্রদর্শক হিসেবে চলল ফাউন্টেইনস অ্যাবির মাইকেল নামের সেই লম্বা, মোটা ফ্রায়ার। আউটল রবিনহুডের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে অ্যাবটের কাছে যাকে বেইজ্জত হতে হয়েছে।

অবশ্য সে জন্য কোন বিকার নেই লোকটার। হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে চলেছে। অথচ আসার সময় অ্যাবট তাকে স্পষ্ট ভাষায় একরকম আশ্রয়হীন করে দিয়েছে। বলেছে, 'এক কাপড়ে দূর হয়ে যান এখান থেকে, মাইকেল টাক ! অনেক বছর আগে যেমন বেশে এসেছিলেন। আমাদের প্রচলিত মতের ব্রাদার থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন আপনি। আর যেন কখনও আমার দরজায় আপনার মুখ না দেখি ! তাহলে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে !' সমান তেজের সাথে জবাব দিয়েছে ফ্রায়ার। 'থাকল আপনার ফাউন্টেইনস অ্যাবি। আমি গ্রিনউডে চললাম সুখের খোঁজে !' তারপর থেকে সেই যে গান ধরেছে লোকটা, মুখ আর বন্ধই হচ্ছে না। দূর থেকে গন্তব্য চোখে পড়তে স্যার গাইয়ের দিকে ফিরল সে।

'আপনি আড়ালে সরে থাকুন, স্যার গাই। নইলে হেলমেটের ভাইজর নামিয়ে দিন।'

'কেন ?' উত্তেজিত হয়ে উঠল নাইট। 'লর্ড ফিটজওয়াল্টারের মেয়ে না হয় রবিনকে পছন্দ করে, কিন্তু লর্ডের নিশ্চয়ই দোস্তি নেই তার সাথে যে আমাকে দেখলেই তীর ছুড়তে থাকবে ?'

'সে হয়তো তা করবে না !' হেসে উঠল ফ্রায়ার। 'কিন্তু যদি লেডি মেরিয়ান করে বসে ? ও কিন্তু রবিনের মতই ওস্তাদ তীরন্দাজ।'

নিরাপদেই দুর্গে পৌঁছল তারা। দূর থেকে ভাল করে ভাবগম্ভীর চেহারার দুর্গটা দেখল স্যার গাই। ওটাকে ঘিরে থাকা প্রশস্ত, গভীর পরিখার পানি টলটল করছে। পানিতে কাঁপছে দুর্গের প্রতিবিম্ব। লর্ড ফিটজওয়াল্টার সাদরে অভ্যর্থনা জানাল স্যার গাইকে। যুবরাজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পেয়ে আনন্দে অধীর।

'আমার সাথে অন্যায় করেছেন ?' স্যার গাইয়ের বিনয়ে আকাশ থেকে পড়ল লর্ড। 'আপনি কি মনে করেন রবিনের মত এক আউটল, অবৈধ হরিণ শিকারীর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ভাল হতো ? যে তার জমি-জমা, টাকা-

পয়সা, সবকিছু ভূমিদাস আর ফকির-মিসকিনদের সাহায্যের জন্যে বিলিয়ে দিয়েছে ? না। আমি তা চাইনি। আপনি কাল আমার অনেক বড় উপকারই করেছেন, স্যার গাই। ফিযূথ বা রবিনহুড যে-ই হোক, তার সাথে আমার আর কোন সংশ্রব নেই। আমার মেয়েরও নেই।'

'কিন্তু গির্জার রীতি-বিধান অনুযায়ী কাল ওদের অর্ধেক বিয়ে হয়ে গেছে,' ফ্রায়ার টাক বলে উঠল। 'ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। তাছাড়া সবকিছু তো ওদের ইচ্ছে অনুযায়ীই হয়েছে।'

'পুরোপুরি তো হয়নি !' চেঁচিয়ে উঠল ফিটজওয়াল্টার। 'ব্যাপারটাকে এমনিতেও বেশি গুরুত্ব দিতে চাই না আমি। ওরা ভালবাসে কি বাসে না আমি জানি না। যদি বেসেই থাকে, তো আপনি মেরিয়ানকে বোঝান কোন বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসা পাপ। আপনি ওর কনফেসর।'

'বিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়ে থাকে,' ফ্রায়ার টাক বলল। 'আর ভালবাসার স্রষ্টাও ঈশ্বর। ওর মধ্যে আমি নাক ঢোকাতে চাই না।'

'কালকের বিয়ে অনুষ্ঠান পুরো করা সম্ভব হয়নি. তার মানে ওদের ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল না। তাছাড়া আমি আমার মেয়েকে হান্টিংডনের আর্লের সাথে বিয়ে দিতে চেয়েছি, আউটল রবিনের সাথে নয় !'

'রিচার্ড দেশে ফিরলে রবিনকে ক্ষমা করে দিতেও তো পারেন। তখন ও আর আউটল থাকবে না।'

'অসম্ভব !' খেঁকিয়ে উঠল স্যার গাই। 'তেমন কিছু ঘটার আশা নেই। রাজার আজ্ঞাবহদের হত্যা করেছে লোকটা, তাঁর নিযুক্ত শেরিফকে বেইজ্জত করেছে।'

লর্ড ফিটজওয়াল্টার ক্রমে রেগে উঠতে লাগল। মুখ লাল হয়ে উঠল তার। স্যার গাইয়ের মন্তব্যের সুতো ধরে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় হঠাৎ লেডি মেরিয়ান এসে ঢুকল রুমে। তার পরনে লিঙ্কন গ্রিনের গাউন। এক হাতে ধনুক, অন্য হাতে এক তূণ তীর।

'এসব কি ?' গর্জে উঠল লর্ড। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

'গ্রিনউডে !' মেরিয়ান শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল।

'না, তুমি যাবে না !' গমগম করে উঠল তার গলা।

'নিশ্চই যাব !'

'আমি ড্র-ব্রিজ তুলে ফেলার নির্দেশ দেব।'

'আমি সাঁতরে পরিখা পাড়ি দেব।'

'আমি গেট খুলতে নিষেধ করে দেব।'

'আমি দুর্গের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব।'

'আমি তোমাকে দুর্গের চূড়ায় আটকে রাখব, যেখানে বসে আলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না তুমি।'

'আমি যেভাবে পারি সেখান থেকেও পালিয়ে যাব। কিন্তু আমাকে যদি স্বেচ্ছায় যেতে দেয়া হয়, আমি ফিরে আসব। আর যদি আটকে রাখার চেষ্টা করা হয়, যদি আমাকে পালিয়ে যেতেই হয়, আর কখনও আসব না আমি। রবিন আমার জন্যে গ্রিনউডে অপেক্ষা করছে। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখো, যেতে না দাও, তাহলে আমাদের পরের সাক্ষাতে কাল অ্যাবিতে যে কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল, সেটা পুরো হয়ে যাবে।'

'সাবাশ মেয়ে, চমৎকার বলেছ !' চেঁচিয়ে বাহবা দিল ফ্রায়ার টাক। 'চমৎকার বলেছ !'

'তাহলে আমার কথাও শুনুন, ফ্রায়ার !' গর্জন করে উঠল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। 'এই মুহূর্তে আমার দুর্গ থেকে বেরিয়ে যান। আমি বুঝতে পারছি বিশ্বাসঘাতক রবিনহুডের সাথে আপনার সখ্যতা আছে। মঙ্ক হোন আর যা-ই হোন, আর কখনও যদি এখানে দেখেছি, চাবুক মেরে পিঠে চামড়া তুলে দেব।'

'ঠিক আছে ! আমি যাচ্ছি,' বলল ফ্রায়ার। 'আসার সময় কম্প্যানহার্স্টের তীরে একটা হারমিটেজ দেখেছিলাম। অ্যাবি আর দুর্গে আশ্রয় পাইনি তো কি হয়েছে ? ওখানে ঠিকই পাব। পথিকদের নদী পার করার কাজ করব আমি। তাতেই চলে যাবে,' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'বাচাল ফ্রায়ার কোথাকার !' তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে লর্ড বলল। 'এই জেদী মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করি বলুন তো !'

'ওর এখন একজন স্বামী দরকার,' স্যার গাই সুযোগটা কাজে লাগল। 'এটাই ওর সেরা ওষুধ।'

'ঠিক বলেছেন !' মাথা ঝাঁকাল লর্ড। 'আর কোন আর্লকে জামাই করার খায়েশ নেই আমার। তারচে' ... ইয়ে, একজন নাইট পাওয়া গেলে ভাল হয়। যার টাকা আছে, জমি-জমা আছে। আর যুবরাজ জনের সাথে ভাল সম্পর্ক আছে। এরকম এক পাত্র, আসলে ... সে যাক। কোন ব্যাপার না !' অনুমোদনের দৃষ্টিতে স্যার গাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল সে।

মেরিয়ান তা বুঝতে পেরেই বলে উঠল, 'ভুলে যাও, বাবা। একমাত্র রবিনহুড ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না তোমার মেয়ে।'

রাগে অধীর হয়ে উঠল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। 'আমি তোমাকে পাতালপুরীতে আটকে রাখব ! রুটি-পানি ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয়া হবে না।'

'আমাকে উদ্ধার করতে রবিন তোমার দুর্গ দখল করবে,' বলল মেয়েটি। পরক্ষণে চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা ! তুমি যদি আমাকে এখন গ্রিনউডে যেতে দাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি ফিরে আসব। আর যতদিন পর্যন্ত রিচার্ড ফিরে এসে নিজে আমাকে ওর হাতে তুলে না দিচ্ছেন, ততদিন রবিন এখন আমার যা আছে, যতটুকু আছে, তাই থাকবে।'

লর্ডকে নিরুত্তর দেখে মেরিয়ান বুঝল তার আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। খুশি মনে কাছে এসে তার গালে একটা চুমু দিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল সে, কয়েক মিনিটের মধ্যে শেরউডের মধ্যে হারিয়ে গেল।

'এবার আপনার পালা,' ঝট্ করে স্যার গাইয়ের দিকে ফিরল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। 'যান, মেরিয়ানের পেছন পেছন গিয়ে ধরুন রবিনহুডকে। নটিংহ্যামশায়ারে নিয়ে সবচে' উচু ফাঁসিকাঠ বানিয়ে তাতে ঝুলিয়ে দিন গিয়ে। যতদিন তেমনটা না হচ্ছে, ততদিন আমার মেয়েকে নিয়ে কোন কিছু আশা না করাই ভাল।'

উঠে নড করল নাইট। 'মাই লর্ড, আমি এখন লকসলি হলের পথে রয়েছি। গতরাত শেরিফের লোকেরা ওটাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। ও বাড়িতে যে-ই ঢুকতে বা বেরোতে যাবে, তাকেই গ্রেফতার করতে বলা আছে তাদেরকে। আর আমার লোকেরা অ্যাবিতে আছে। কে জানে, ফিরে গিয়ে হয়তো দেখব রবিন এরমধ্যেই ধরা পড়ে গেছে।'

কিন্তু কোনটাই হলো না শেষ পর্যন্ত। রবিনকে ভালমত চিনে উঠতে তখনও বাকি ছিল স্যার গাইয়ের। একসঙ্গে দুই পরিচয়ে পরিচিত রবিনহুড যে অ্যাবির ঘটনার পরও লকসলি হলে ফিরে যাওয়ার মত কাঁচা হতে পারে না ; যুবরাজ জন বা শেরিফ, কেউ ভাবেনি।

অ্যাবি থেকে বেরিয়ে জনাবিশেক অনুসারী নিয়ে লকসলির দিকেই গিয়েছিল সে, কিন্তু সরাসরি লকসলি হলে গিয়ে ঢোকার মত বোকামি করেনি। হলের মাইলখানেক দূরে থাকতে ঘোড়া থামিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বেশ লম্বা-চওড়া এক ভাষণ দিল ও।

'বন্ধুগণ ! আজ তোমাদের নিজের নিজের পথ স্বাধীনভাবে বেছে নেয়ার সময় এসেছে। একটু আগে তোমরা নিজ কানে আমাকে আউটল ঘোষণা করার ম্যান্ডেট পড়তে শুনেছ। রাজার ম্যান্ডেট না হলেও ওতে আমার বিপক্ষে যা যা বলা হয়েছে, তা মিথ্যে নয়। তোমরা যারা আমার দ্বিতীয় পরিচয় জানতে না, তাদেরকে বলছি, ওই ম্যান্ডেটে মিথ্যে কিছু ছিল না। আমি সত্যিই রবিনহুড। তোমাদের তা জানার উপায় ছিল না, কারণ তোমরা আমার লকসলি এস্টেটের কর্মচারী। আমি গত কয়েক বছর থেকেই অর্থপিশাচ, গরিবে রক্ত শোষণকারী নর্ম্যান লর্ড, ব্যারন, বিশপ, অ্যাবট আর শেরিফদের রাতে ঘুম হারাম করার কাজ করে আসছি। গ্রিনউডে আমার একদল সহকারী আছে, যারা আমাকে সে কাজে সহযোগিতা করে।

'তারা আমাকে তাদের রাজা মেনে নিয়েছে। এর কারণ এই নয় যে আমি একজন আর্ল, বা আমার একজোড়া নিষ্কম্প হাত আছে, দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ, আমি তীর ছোড়ায় অনেকের চেয়ে নির্ভুল। না, তা নয়। মেনে নিয়েছে কারণ একজনকে দলের নেতা হতে হবে, তাই, এবং আমি এসেছি শাসক শ্রেণী থেকে। যদিও এখন আমরাও আর সবার মত নর্ম্যানদের প্রজা। আমি আর হান্টিংডনের আর্ল

নই। এখন থেকে শুধুই লকসলির সাধারণ এক ইয়োম্যান, রবিনহুড। আমার এবং আমার অনুসারীদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাজা রিচার্ড দেশে না ফেরা পর্যন্ত আমার এই সংগ্রাম চলবে। তারপর রাজার ওপর রাজত্বের ভার তুলে দিয়ে আমরা যার যার কাজে ফিরে যাবো।

'বন্ধুরা, তোমরা এখনই নিজের নিজের পথ বেছে নাও। হয় আমার সাথে এসো, নয়তো লকসলি ফিরে যাও। ওখানকার নতুন মনিব যে হবে, তার সেবা করো গিয়ে। তা নিয়ে আমি কোন আপত্তি তুলব না। তোমাদের মধ্যে যাদের বউ-বাচ্চা আছে, আমার মতে তাদের জন্যে পুরনো চাকরিতে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। শুধু কাছে আমার একটা আবেদন, দয়া করে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না কখনও। তোমাদের সঙ্গীদের মধ্যে যারা আমার সাথে থেকে যাবে, তাদের নাম-পারিচয় ফাঁস করে দিয়ো না।'

কিছু সময় অনড় বসে থাকল লোকগুলো। তারপর মাথার ওপর হাত তুলে প্রতিজ্ঞা করল, তারা আমৃত্যু রবিনহুডের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রয়োজনে প্রাণ দেবে, তবু তার সাথে কখনও বিশ্বসঘাতকতা করবে না। তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়ে গেল রবিনের দলে, কিছু বউ-বাচ্চার টানে মাথা নিচু করে পুরনো কর্মক্ষেত্রে চলে গেল।

যারা থেকে গেল, তাদের উদ্দেশে রবিন বলল, 'এবার চলো আমাদের নতুন বাড়িতে যাওয়া যাক।'

সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তে শেরউডের ঠিক মাঝখানের খোলামেলা একটা গ্লেডে (খোলামেলা জায়গা) পৌঁছল দলটা। জঙ্গলের সবচেয়ে বয়স্ক, সবচেয়ে মোটা ও সবচেয়ে উঁচু ওক গাছটা দাঁড়িয়ে আছে তার মাঝে–সেটার দু'দিকে কয়েকটা বড় বড়, গভীর গুহা এবং অগভীর উপত্যকা আছে। চারদিক থেকে বুনো ঝোপ-ঝাড়সহ নানান জাতের অসংখ্য বড় বড় গাছ ও দুর্ভেদ্য কাঁটা ঝোপ ঘিরে রেখেছে গ্লেডটাকে। আর আছে অগভীর জলাভূমি–অসাবধানে যেখানে একটা পা ফেললেই মানুষ বা ঘোড়া, মুহূর্তে গভীরে তলিয়ে যাবে।

শেষ এক মাইল পথ অত্যন্ত সরু, আঁকাবাঁকা। লুকানো কিছু চিহ্ন অনুসরণ করে গ্লেডে পৌঁছতে হয়। আসার পথে লোকগুলোকে সেসব চিনিয়ে দিল রবিন। গ্লেডে পৌঁছে কোমরের বেল্ট থেকে শিঙা বের করে ফুঁ দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলোড়িত হয়ে উঠল সবুজ বন। লালচে বাদামি অথবা সবুজ কাপড়ের হুড, লিঙ্কন গ্রিনের হাতাওয়ালা আঁটসাঁট ডাবলেট ও ইজের এবং নরম বাদামি চামড়ার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট পরা একদল লোক গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। নবাগতদের স্বাগত জানাল তারা।

ওদিকে স্যার গাই মেরিয়ানকে অনুসরণ করার বদলে রবিনহুড ধরা পড়েছে কি না, সেই খবর জানতে ফাউন্টেইনস অ্যাবি এবং লকসলি হলে গিয়েছিল। কিন্তু আশা পূরণ হয়নি দেখে ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধল সে।

লিটল জন

রবিনকে বাগে আনতে না পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে শেরিফ। যুবরাজের কাছে মুখ থাকছে না। তাই রক্ষীদের বড়সড় একটা দলকে শেরউডে পাঠিয়ে দিল সে তাকে দমন করতে। খবরটা জানতে পেরে সতর্ক হয়ে গেল রবিনহুড। শুধু শুধু রক্তক্ষয় এড়াতে সঙ্গীদের নিয়ে ইয়র্কশায়ারের বনে চলে গেল। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর যখন খবর পেল শেরিফের বাহিনী হতাশ হয়ে ফিরে গেছে, তখন আবার শেরউডে ফিরে এল।

দু' সপ্তাহ ধরে দলের মধ্যেকার আগের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ করল। শেরউডের ভেতরের সবচেয়ে পোপন অথচ খোলামেলা জায়গায় কিছু ঘর তৈরি করল যাতে অনুসারীরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। সে সময় গ্রেট নর্থ রোড ছিল শেরউডের মধ্যেই।

তারও সপ্তাহ দুয়েক পর, এক সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝরনায় মুখ ধুতে এলো রবিন। গাছে গাছে পাখিরা মিষ্টি-মধুর গান শোনাচ্ছে, চারিদিকে নতুন ভোরের তরতাজা একটা ভাব। মনটা খুশিই থাকার কথা, কিন্তু ওর বেলায় ঘটল উল্টো। মনটা বিগড়ে গেল।

আস্তানায় ফিরে ঘোষণা করল, 'আমি যাচ্ছি। কোন ঘটনা ছাড়াই দুটো সপ্তাহ কেটে গেল। শিকার নেই, রোমাঞ্চ নেই, কিচ্ছু নেই। এরকম নীরস জীবন আর ভালো লাগছে না। তাই বেরোচ্ছি আমি। আজ যদি কোন অ্যাবট অথবা নাইট বা ব্যারনের কোমরের থলি হালকা না করতে পারি, তো আমার নামই রবিন নয়।'

ওর উদ্দেশ্য জানতে পেরে আরও কয়েকজন সাথে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু রবিন বাধা দিল তাদের।

আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন। হাঁটতে হাঁটতে বিশাল শেরউড জঙ্গলের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির হলো। তবু নতুন কিছু ঘটল না। এদিক-ওদিক, এ-গলি সে-গলি ধরে হাঁটছে ও, মানুষজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে। কিন্তু তাদের সবাই গোবেচারা ধরনের, শান্তিপ্রিয়। তাদের মধ্যে মোটা এক ধর্মযাজকও ছিল। ঘোড়ায় চেপে এক মহিলাকে যেতে দেখে নড করল ও।

এক গাঁয়ের মেয়ের সাথে দেখা হলো বনের পথে–সম্ভাষণ বিনিময়ের পর যে যার পথে পা বাড়াল ওরা। বর্শা আর ঢাল হাতে এক বর্ম পরা নাইটের দেখা পাওয়া গেল, লাল উর্দি পরা এক ভৃত্যেরও দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু যে জন্য

আসা, সেই রোমাঞ্চের খোঁজ পেলো না রবিন। আজকের দিনটাও বুঝি মাটি হলো, ভাবতে ভাবতে অন্য রাস্তা ধরল।

খানিক পর প্রশস্ত এক ঝরনার ধারে এসে পৌঁছল। পারাপারের সাঁকো হিসেবে একটা গাছ ফেলা আছে সেটার ওপর। সাঁকোয় উঠতে যাবে ও, এমন সময় চোখে পড়ল ঝরনার ওপারে দানবাকৃতির আরেক লোকও সেই মুহূর্তে উঠতে যাচ্ছে সাঁকোয়।

'দাঁড়াও !' বলে উঠল রবিন। 'পথ ছাড়ো। আমি আগে পার হবো।'

'কেন ?' নীরিহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল লোকটা।

'কেন আবার ?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'দেখতে পাচ্ছো না এই সরু সাঁকো দিয়ে একসাথে দু'জনের পার হওয়ার উপায় নেই ? সরে দাঁড়াও। আগে আমাকে পার হতে দাও।'

'কেন, আমি আগে পার হলে ক্ষতি কি ? তুমিই একটু সরে দাঁড়াও না কেন ?'

রেগে উঠল রবিন। 'বেশি কথা বলবে না ! হয় রাস্তা ছাড়ো, নয়তো বুকে একটা তীর গেঁথে দিলাম,' বলেই কাঁধ থেকে ধনুক নামাল রবিনহুড। তূণের দিকে হাত বাড়াল।

আগন্তুকও খেপে উঠলো এবার। 'খবরদার ! ছিলা ছুঁয়েছো কি এই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে চেহারা পাল্টে দেবো তোমার।' হাতের সাত ফুট লম্বা লাঠিটা ঝাঁকাল সে। 'দেখেছ ?'

এক পলক ওটা দেখল রবিনহুড, তারপর হেসে বলল, 'আহাম্মকের মত কথা বলছো তুমি, উজবুক। ওটা নিয়ে তিন পা এগোবার আগেই তোমার কলজে ফুটো করে দেবো আমি।'

'আর তুমি কথা বলছো কাপুরুষের মত,' ঘৃণার সাথে জবাব দিল লোকটা। 'হাতে তীর-ধনুক থাকলে ওরকম বড়াই যে কোন ভীতুও করতে পারে। একটা লাঠির বিরুদ্ধে ওই জিনিসের হুমকি দিতে তোমার লজ্জা করলো না, কাপুরুষ কোথাকার !'

'তবে রে !' তীর-ধনুক মাটিতে রেখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল রবিনহুড। 'আমি কাপুরুষ ? ঠিক আছে, সাহস থাকলে অপেক্ষা করো। এখনই একটা লাঠি কেটে নিয়ে আসছি আমি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' বিরাট লাঠিটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল দৈত্যাকার লোকটা। 'যাও, নিয়ে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।'

দ্রুত পায়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল রবিন। খুঁজেপেতে গ্রাউন্ড ওক গাছের সোজা দেখে একটা ছয় ফুট লম্বা ডাল কাটল, তারপর ছোরা দিয়ে সেটার বাড়তি ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে ফিরে এলো। দেখল, লোকটা আগের মতো লাঠিতে ভর দিয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে ওর অপেক্ষা করছে–শিস বাজাচ্ছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কাজের ফাঁকে আড়চোখে লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল রবিন। মনটা দমে গেছে। ভাবছে, এরকম দৈত্যাকার এক জোয়ানের সাথে লড়তে যাওয়া কি ঠিক হবে ? ও নিজে কম লম্বা নয়, কিন্তু এ লোক ওর চেয়ে কমপক্ষে একহাত বেশি লম্বা। সাত ফুটের কম হবে না কিছুতেই। নিজের কাঁধ প্রশস্ত বলে খুব গর্ব ছিলো রবিনের, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এই অজ্ঞাত লোকটার কাঁধ তার চেয়ে আধ হাত বেশি প্রশস্ত।

আর কোমরের বেড় ? কম করেও পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি তো হবেই। মনে মনে বলল ও, যতবড় ওস্তাদই হও না কেন, বাপু। আজ তোমাকে ধোলাই দিয়ে হাতের সুখ মেটাব।

মুখে বলল, 'এই যে, বীরপুরুষ। আমার হাতের লাঠিটা দেখতে পাচ্ছো ? সাহস থাকলে এবার এসো সামনে। এই সাঁকোর ওপরেই লড়াই হোক। একজন অন্যজনকে মেরে পানিতে ফেলে না দেয়া পর্যন্ত লড়াই চলবে। যে জিতবে, সে আগে সাঁকো পার হবে, ঠিক আছে ?'

'ঠিক আছে,' বলল লোকটা। 'এসো তাহলে। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

লাঠিটা শূন্যে এক চক্কর ঘুরিয়ে সামনে এগিয়ে এল সে। রবিনও সাঁকোয় উঠে কয়েক পা এগোল। শুরু হয়ে গেল লড়াই। কিছুক্ষণ মহড়া চলল–দুজনেই মাথার ওপরে বন্ বন্ করে লাঠি ঘোরাচ্ছে, একদিকে মারার ভয় দেখিয়ে চট্ করে আরেকদিক দিয়ে মারার চেষ্টা করছে। প্রতিপক্ষ তা ঠেকিয়ে দিলে নতুন পন্থা এবং পরস্পরের দুর্বলতা আবিষ্কার করার চেষ্টায় লেগে রয়েছে।

এভাবে একনাগাড়ে কয়েক মিনিট চেষ্টার পর দুজনেই বুঝে ফেলল তারা কেউ কারও চেয়ে কম নয়–ওস্তাদ লাঠিয়াল। প্রতিক্ষকে হারানো সহজ হবে না। তারপরও রবিনহুডই প্রথম আঘাত হানার সুযোগ করে নিল। দৈত্যের মাথায় মারার ভান করল সে, লোকটা মার ঠেকাতে লাঠি উঁচু করতেই বিদ্যুৎ গতিতে আরেকদিক দিয়ে তার পাঁজরে মেরে বসল।

ব্যথা পেয়ে খেপে গেল বিশালদেহী, এক পা এগিয়ে গায়ের জোরে লাঠি চালাল। মারটা কোনমতে ঠেকাল রবিনহুড, চোখের পলকে আরেক বাড়ি বসিয়ে দিল তার পিঠে। এ সময়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য রবিনের মাথা অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল, সুযোগটা কাজে লাগাতে দেরি করল না দানব, ধাঁই করে শক্ত এক আঘাত বসিয়ে দিল।

ঠিকমত লাগলে ওই এক ঘা-তেই কম্ম কাবার হয়ে যাওয়ার কথা ছিল রবিনের, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ক্ষিপ্র গতিতে মাথাটা সরিয়ে নিল ও–পুরোপুরি সফল হলো না যদিও। শত্রুর লাঠি হালকাভাবে মাথার এক পাশ ছুঁয়ে গেছে, তাতেই মাথা ফেটে দরদর করে রক্তের ধারা নামল গাল বেয়ে। রক্ত দেখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল দানবের মুখে।

খেপে উঠল রবিন, বেপরোয়ার মতো সাঁই সাঁই করে লাঠি ঘোরাতে শুরু করল। ওর আক্রমণের তীব্রতার সামনে কিছু সময়ের জন্য রক্ষণাত্মক ভূমিকা নিল দৈত্যাকার লোকটা, মারের পর মার ঠেকিয়ে যেতে লাগল। রবিনহুড হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না। লোকটা ওর প্রতিটা মার ঠেকিয়ে তো দিলই, বরং ওর মধ্যেই ফাঁক খুঁজে নিয়ে এক-আধটা পাল্টা মারও দিল।

এভাবে পুরো একটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, কেউ নিজের জায়গা ছেড়ে এক ইঞ্চিও পিছালো না। শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ক্লান্তিতে দু'জনেরই শুয়ে পড়ার দশা, অসংখ্য ছোটখাটো আঘাতে দেহের অনেক জায়গা ফুলে দাগ হয়ে গেছে, তবু হার মানছে না। তবু ক্ষ্যান্ত দেয়ার লক্ষণ নেই কারও মধ্যে।

তার মধ্যে হঠাৎ একটা সুযোগ পেয়ে দৈত্যাকার লোকটার পাঁজরে এক ঘা বসিয়ে দিল রবিনহুড—আগেরবার যেখানে মেরেছিল, ঠিক সেখানটায়। সাঁকো থেকে পড়েই যাচ্ছিল লোকটা। অনেক কষ্টে সামলে নিল পাল্টা মার লাগাল ওর পিঠে। রবিন সে ধাক্কা সামাল দিতে পারল না, ঝপাৎ করে পানিতে পড়ে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ফেলল।

তাই দেখে হা-হা করে হেসে উঠল দানব। 'কি হলো ?'

'তোমারই জয় হলো !' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রবিন। ঝরনার কিনারায় গিয়ে হাঁটু পানিতে দাঁড়াল। 'বাপ্‌রে ! মাথার মধ্যে এমন ভন্ ভন্ করছে, মনে হয় ওটা যেন জুন মাসের সকালের মৌচাক।'

আরও কিনারায় চলে এলো রবিন। ছোট ছোট মাছগুলো ওর পায়ের ফাঁক দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে পালাচ্ছে। শিঙায় তিনটা ফুঁ দিল ও, তারপর একটা ঝোপ ধরে হাঁচড়েপাঁচড়ে ওপরে উঠে পড়ল।

'তা হয়েছে ঠিকই,' দীর্ঘদেহী বলল। 'কিন্তু তুমিও কম দেখাওনি, ভায়া। এমন বাহাদুর লাঠিয়াল আজ পর্যন্ত দেখিনি আমি।'

'আমিও না,' রবিন বলল।

কাছাকাছি কোথাও শুকনো পাতা মাড়ানোর আওয়াজ উঠল এই সময়, ঝোপঝাড় নড়তে লাগল খস-মস করে। মনে হলো, কারা যেন আসছে এদিকে, তাদের পায়ের চাপে শুকনো ডাল ভাঙছে। তারপর হঠাৎ করে বিশ-ত্রিশজন সবুজ পোশাক পরা লোক আড়াল থেকে উঁকি দিল। তাদের মধ্যে মিলারের ছেলে মাচ ও উইল স্কারলেটকে দেখা গেল।

'আরে !' উইল স্কারলেট বলে উঠল। 'এভাবে ভিজলে কি করে তুমি ?' অবাক হয়ে রবিনকে দেখল।

দীর্ঘদেহী আগন্তুককে দেখাল রবিনহুড। 'ওই লোকটার কারণে হয়েছে। ও মনের সুখে ধোলাই দিয়ে পানিতে ফেলে দিয়েছে আমাকে।'

'কি !' কয়েকজন হুঙ্কার ছেড়ে উঠল একযোগে। চোখ গরম করে লিটল জনের দিকে তাকাল। 'এতোবড় সাহস !'

লোকটার ওপর সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে দেখে হাসল রবিনহুড, এক আঙুল তুলে থামতে বলল সবাইকে। 'কেউ হাত দেবে না ওর গায়ে। সাহসী আর বীরদের ওপর কোন অন্যায় আচরণ করি না আমরা। আমি নিজেই লোকটার সাথে প্রতিযোগিতা করতে নেমে হেরে গেছি, সে জন্য ওর ওপর কোন রাগ নেই আমার। বীরের মতো যুদ্ধ করে জিতেছে সে।'

লোকটার দিকে ফিরল রবিন। 'তোমাকে সহকর্মী হিসেবে পেলে খুব খুশি হবো আমরা। আসবে আমাদের দলে ?'

'তোমার দলে ?' মাথা নাড়ল দানব। 'নাহ্, আমার চেয়ে অযোগ্য কাউকে নেতা হিসেবে মেনে নিতে পারবো না আমি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনহুডের। 'মানুষের যোগ্যতা কিভাবে বিচার করো তুমি ?' হাত তুলে সঙ্গীদের দেখালো। 'তুমি কি মনে করো এরা সবদিক থেকে আমার চেয়ে অযোগ্য ? না। এদের কেউ কেউ বুদ্ধিতে আমার তুলনায় বেশ এগিয়ে আছে, কেউ এগিয়ে আছে বিদ্যার ক্ষেত্রে। কেউ এগিয়ে আছে গায়ের জোরে, কেউ দ্রুততায়, কেউ লাঠি খেলা বা তলোয়ার যুদ্ধে বেশি পারদর্শিতায়, কেউ অভিজ্ঞতায়, কেউ আবার ...'

'তাহলে দলনেতা হিসেবে কেন তোমাকে মেনে নিয়েছে ওরা ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমি দলের মধ্যে সেরা তীরন্দাজ, তাই।'

'সেরা তীরন্দাজ ?' হাসল লোকটা। 'তাহলে এসো, সে বিষয়েও না হয় একহাত হয়ে যাক।'

'তীর-ধনুকেও খুব ভালো বুঝি তুমি ?' রবিনহুড বলল।

'এসো না, পরীক্ষা করেই দেখা যাক ভালো না মন্দ !' ঝুঁকে বিনয়ের ভান করল লোকটা।

'আচ্ছা !' ঠোঁট মুড়ে হাসল রবিন। 'তুমি বেশ ঘুঘু লোক মনে হচ্ছে। উইল, চার আঙুল লম্বা আর চার আঙুল চওড়া এক টুকরো গাছের ছালের টুকরো কেটে নিয়ে এসো, উল্টোদিকটা যেন সাদা হয়।'

কাঠুরে যুবক এক মিনিটের মধ্যে ছাল জোগাড় করে আনতে হাত তুলে দূরে একটা ওক গাছ নির্দেশ করল সে। 'আশি গজ দূরের ওই ওক গাছে সেঁটে দিয়ে এসো টুকরোটা।' আগন্তুকের দিকে ফিরে বলল, 'দূরত্বটা খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে না তো ?'

'একটুও না !' খুশি খুশি গলায় জবাব দিল সে। 'ভালো দেখে একটা ধনুক আর তীরও দাও। যদি লক্ষ্যভেদ করতে না পারি, তাহলে ধনুকের ছিলা দিয়ে পিটিয়ে আমার পিঠের চামড়া তুলে নিয়ো।'

অনেকেই ধনুক বাড়িয়ে ধরল তার জন্য, সেগুলোর মধ্যে থেকে পছন্দ অনুযায়ী মজবুত একটা বেছে নিল দানব। তারপর অনেক বাছবিচার করে একদম

সোজা একটা ধনুক তুলে নিল। সবশেষে যে দাগ থেকে তীর ছুড়তে হবে, সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাকিরা উইলের ফিরে আসার অপেক্ষায় অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

কাজটা সেরে ফিরে এল উইল। ছালের অবস্থান এক পলক দেখে নিল দৈত্যাকার লোকটা, তারপর বাঁ পা দাগে এবং ডান পা একটু পিছনে রেখে দাঁড়াল। ধনুকে তীর পরিয়ে এক টানে ছিলা যতদূর সম্ভব পিছনে নিয়ে এল, তারপর লক্ষ্য ঠিক করেই ছুড়ল। আশ্চর্য ! সোজা গিয়ে টুকরোটার একেবারে মাঝখানে বিঁধলো তীর।

ধনুক নামিয়ে হা হা করে হেসে উঠল সে। রবিনের উদ্দেশে বলল, 'তোমার টার্গেটের ঠিক কেন্দ্রবিন্দু দখল করে নিয়েছি আমি। এখন দেখা যাক, তোমার তীর কোথায় ঠাঁই পায়।'

লোকটার হাতের টিপ দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে সবাই। চারদিক থেকে মৃদু কণ্ঠের প্রশংসার গুঞ্জন উঠছে। খুশিতে কেউ কেউ হাততালিও দিল। কিন্তু রবিন দাগে এসে দাঁড়াতে খুশি মিলিয়ে গেল তাদের। শুকনো মুখে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এবার কি হবে ! ভাবল তারা। লোকটার চেয়ে ভালো আর কি করতে পারবে সে ?'

ধনুকের ছিলায় তীর বসালো রবিনহুড, তারপর খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্যস্থির করে ছুড়ল। তার এক মুহূর্ত পর চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দেখে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল প্রত্যেকে। তীরটা সোজা আগন্তুকের লক্ষ্যে বিঁধে থাকা তীরের লেজের মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর গতির তোড়ে সেটাকে চিরে দিয়ে ফলার কাছে গিয়ে থামল। কয়েক মুহূর্তের হতবিহ্বলতা কাটতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রবিনের দলের মানুষগুলো, তাদের চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল।

ওদিকে দৈত্যাকার মানুষটা কাণ্ড দেখে রীতিমতো হা হয়ে গিয়েছিল, হুঁশ ফিরতে কুর্নিশের ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি অভিবাদন জানাল রবিনকে।

'আশ্চর্য ! এমন কাণ্ড আমি জীবনেও দেখিনি। তোমার কাছে তো ধনুকের জাদুকর দস্যু রবিনহুডও হার মেনে যাবে।'

'তুমি চেনো তাকে ?' প্রশ্ন করল রবিন।

'না। তবে তার নাম শুনেছি অনেক। রবিনের খোঁজেই তো অনেক দূর থেকে এসেছি আমি।'

'তাকে কেন খুঁজছ তুমি ?'

'তার দলে যোগ দেব বলে।'

খুশিতে ঝলমল করে উঠল রবিনের চেহারা। একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিল ও। 'তাহলে খোঁজাখুঁজির অবসান হয়েছে, তাকে পেয়ে গেছো তুমি,' লোকটার থতমত খাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল। 'আজ তাকেই ধোলাই দিয়ে পানিতে ফেলেছো তুমি।'

লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল লোকটা। 'ছি, ছি ! আগেই পরিচয় দেয়া উচিত ছিল তোমার।'

'তাহলে কি তোমার গুণের কথা এতো তাড়াতাড়ি জানা যেতো ? এইভাবে তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনলাম, সেটাই কি ভালো হলো না ? আমার দলে তোমার মতো গুণী লোকের দরকার আছে। আজ থেকে আমাদের একজন হলে তুমি, আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হলে। তা, কি নামে ডাকবো তোমাকে ?'

'আমার নাম জন লিটল।'

'জন লিটল ?' হা হা করে হেসে উঠল উইল স্কারলেট। 'তা তোমার আকার-গঠন লিটলই বলা চলে। সাত ফুট লম্বা, তা আর এমন কি ! এক বছর হরিণের মাংস আর এল খেলে চওড়ার দিকে থেকেও আরও কিছুটা বাড়বে বটে !' আবার কিছু সময় খিক খিক করে হাসল সে। 'কিন্তু আজ তোমার নামটা উল্টে দেয়া হলো। জন লিটল থেকে লিটল জন করা হলো। ছোট জন আর কি ! দেখছো না, কিরকম ছোটখাটো ধড়টা ?'

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। তখনও ওরা জানে না, রবিনহুডের একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে খুব শিগগিরই বিশ্ববিখ্যাত হতে চলেছে এই লোকটি।

সেদিনের মত রোমাঞ্চের খায়েশ মিটে যেতে দলবল নিয়ে আস্তানার দিকে ফিরে চলল রবিনহুড। পথে দু'টো হরিণ শিকার করল–লিটল জনের সম্মানে রাতে শানদার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হবে আস্তানায়।

শেরউডে মেরিয়ান

রবিনের মামা, স্যার উইলিয়াম গ্যামওয়েলের বাসভবন গ্যামওয়েল হল নটিংহ্যাম থেকে বেশি দূরে নয়। একদিন বিকেলে সেখানে এসে উদয় হলো স্যার গাই অভ গিসবোর্ন। স্যার উইলিয়ামের তরফ থেকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

রাতে উপযুক্ত আতিথেয়তার পর তাকে আবার পরদিন আসার জন্য নিমন্ত্রণ করল স্যার উইলিয়াম–পরের দিনের ঐতিহ্যবাহী গ্যামওয়েল ফেস্টিভেলে যোগ দেয়ার জন্য। ওখানে গেলে হয়তো রবিনহুডের কোন খোঁজ পাওয়া যাবে, এই আশায় বলামাত্র রাজি হয়ে গেল সে। যদিও তার মনের কথা উইলিয়াম বা তার ছেলেকে বুঝতে দেয়নি সে।

শেরউড জঙ্গলের ভেতরে হয় সে অনুষ্ঠান। জায়গাটা গ্যামওয়েল হল থেকে বেশি দূরে নয়। সবুজ, খোলামেলা প্রান্তরে অনুষ্ঠিত এ উৎসবে প্রতিবছর নানান উপভোগ্য খেলাধুলা-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফুল দিয়ে সাজানো খুঁটিকে ঘিরে মেয়ে-পুরুষদের নাচ হয়, দেদারসে এল গেলা হয়। বয়স্ক ও তরুণদের খেলা হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

বড় একটা গাছের নিচে বসে স্যার উইলিয়ামের সাথে পুরো অনুষ্ঠান দেখল স্যার গাই। পুরোটা সময় তার চোখের তারায় আনন্দের ঝিলিক থাকলেও একবার ক্ষণিকের জন্য ক্রোধের আগুনও ঝল্‌সে উঠল সেখানে। কারণ স্যার উইলিয়ামের ছেলে, উইল গ্যামওয়েল হঠাৎ কোত্থেকে যেন লেডি মেরিয়ানকে ধরে নিয়ে এসে নাচতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও গ্রাম্য কৃষক পরিবারের মেয়েদের মত খুব সাধারণ পোশাক পরে আছে ও, তবু স্যার গাইয়ের তাকে চিনতে অসুবিধে হলো না।

'স্যার উইলিয়াম, ওই মেয়েটা কে, যে আপনার ছেলের সাথে নাচছে ?' প্রশ্ন করল সে।'

'ও ?' অন্যমনস্ক চেহারায় বলল গ্যামওয়েল। 'মেয়েটা রাখাল। ভেড়া চরায়। এখানকার সবাই ওকে ক্লোরিনডা নামে চেনে। ওর সম্পর্কে এরচে' বেশি কিছু জানি না।'

জানো না, নাকি বলতে চাও না ! লোকটাকে দ্রুত আলোচনার বিষয় পাল্টাতে দেখে মনে মনে বলল স্যার গাই। আমি তাহলে রবিনহুডের লেজের দেখা পেলাম ! সঠিক জায়গাতেই এসেছি তাহলে !

দিনের শেষভাগে শেরউড থেকে লিঙ্কন গ্রিন পরা একদল লোক এসে যোগ দিল অনুষ্ঠানে। সবশেষে তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। তাদের সাথে ক্লোরিনডাও যোগ দিল তাতে। দেখা গেল পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় কোন অংশে কম নয় সে। ঘোড়ায় চড়ল স্যার গাই, কাছ থেকে ক্লোরিনডার তীর ছোড়া দেখতে ওর দিকে এগিয়ে গেল।

একটা তীর ছুড়ল যুবতী, সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল দর্শকরা–টার্গেটের মাঝখানের সোনালি বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে লেগেছে সেটা। বন থেকে আসা দলটার প্রধান তাই দেখে হেসে বলল, 'ক্লোরিনডার মত তীরন্দাজ হতে হলে আমাকে আরও সতর্ক হয়ে ছুড়তে হবে।'

তীর ছুড়ল সে। আবার মাথার ওপর হাত ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করল দর্শকরা। কারণ তার তীর ক্লোরিনডার তীরের ঠিক নাকের কাছে এমনভাবে গেঁথেছে, মনে হয় যেন একটা ছিদ্রতেই ঢুকেছে দুই তীর।

'আমি তোমার হাত দাবি করছি, কুইন অভ দ্য মেরি,' বলে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল যুবক প্রতিদ্বন্দ্বী। লজ্জায় রাঙা হাসি হেসে তার দিকে হাত এগিয়ে দিল যুবতী, যুবক তাকে নিয়ে নাচতে লেগে পড়ল। স্যার গাই চোখ কুঁচকে দেখছিল যুবককে। হঠাৎ চিনে ফেলল। ঘুরে তাকাল পাশে দাঁড়নো উইল গ্যামওয়েলের দিকে।

'ওই তীরন্দাজের নাম কি ?' প্রশ্ন করল সে।

'রবিন, খুব সম্ভব,' বিশেষ গুরুত্ব দিল না যুবক। 'হ্যাঁ, ওকে সবাই রবিন বলে ডাকে।'

'শুধু এইটুকুই জানো ওর ব্যাপারে ?'

'আর কি জানার আছে ?'

'থাকবে না কেন !' থমথমে, কঠিন গলায় বলল স্যার গাই। 'আমি বলছি। ওই লোক আউটল রবার্ট ফিযূথ ওরফে তথাকথিত হান্টিংডনের আর্ল ছাড়া আর কেউ নয়। ওকে যে ধরে নটিংহ্যামের শেরিফের সামনে হাজির করতে পারবে, তাকে অনেক বড় অঙ্কের পুরস্কার দেয়া হবে।'

'তাই নাকি ?' এমনভাবে বলল যুবক, যেন এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।'

'ওকে ধরার পুরস্কার নেহায়েত কম না।'

'তাই তো হওয়া উচিত।'

'তাহলে চলো, আমরা দু'জনে মিলে ধরি ওকে।'

'ইচ্ছে হলে আপনি যান।'

'কিন্তু তোমাদের অনুচরেরা অনুগত নয় ?'

'নিশ্চয়ই অনুগত।'

ক্রমে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল স্যার গাই। 'তাহলে ... তাহলে যদি আমরা ওদেরকে রাজার দোহাই দিয়ে ডাকি, সাহায্য করবে না ওরা ?'

'করবে তো বটেই !' উইল বলল নির্বিকার কণ্ঠে। 'তোমাকে না করলে ওকে করবে, এই যা।'

'কিন্তু আমার কাছে যুবরাজ জনের ওয়ারেন্ট আছে রবিনকে গ্রেফতার করার,' জোর দিয়ে বলল স্যার গাই। 'এখন কি করি বলো দেখি !'

'আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে বলি। এখন, এই মুহূর্তে যত দ্রুত সম্ভব নটিংহ্যামের দিকে ছুটতে শুরু করুন। সময় থাকতে পালান। যদি তীর বৃষ্টি আর পাথর বৃষ্টির মধ্যে পড়তে না চান। যদি মুগুরপেটা হতে না চান।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র স্যার গাইয়ের সহকারী ঘোড়া ঘুরিয়ে পূর্ণ গতিতে ছুট্ লাগাল শহরের দিকে। মনিবও তার পিছন পিছন ছুটল।

চিৎকার করতে করতে গেল, 'থামো, কাপুরুষ কোথাকার ! থামো !'

কিন্তু না সহকারী, না তার মনিব, কারও মধ্যে থামার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তুফান বেগে শহরের দিকে ছুটে গেল তারা। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার দেখা দিল তারা–শেরিফ ও একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে গ্যামওয়েল হলের দিকে যাচ্ছে।

সূর্য ডুবতে শুরু করেছে, এমন সময় নদী পার হওয়ার ব্রিজের কাছে এসে থামল। দেখতে পেল, ওপারে একদল সবুজ পোশাক পরা লোক বনের মধ্যে ঢুকে গেল। ক্লোরিনডাও ঢুকতে যাচ্ছে। মেয়েটার হাতে এখনও তার ধনুক রয়েছে। এপাশে অনেকটা ওরে আগলে দাঁড়িয়ে আছে দানবীয় আকৃতির ব্রাদার মাইকেল টাক।

ক্রুদ্ধ গলায় বলল মোটা ফ্রায়ার, 'কারা তোমরা ? বাজি রেখে বলতে পারি, ওখানে সব কয়টা বিশ্বাসঘাতক ! ওই তো স্যার গাই অভ গিসবোর্ন। সাথে নটিংহ্যামের শেরিফ। যে মোটা টাকা দিতে পারে, তারই অনুগত গোলাম !'

'পথ থেকে সরে যাও, ধর্মভ্রষ্ট ফ্রায়ার !' ওপারের দলটা আগে ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছে দেখে রাগে চিৎকার করে বলল স্যার গাই। 'আর লেডি মেরিয়ান, তাড়াতাড়ি আরলিংটন দুর্গে ফিরে যাও। তুমি সন্দেহজনক, বিশ্বাসঘাতক গোছের লোকদের সাথে চলাফেরা করছ।'

'আপনার ভুল হচ্ছে, ভুয়া নাইট, ভুল হচ্ছেন !' ফ্রায়ার টাক বলল। 'এ লেডি মেরিয়ান নয়, ক্লোরিনডা। শেরউড জঙ্গলে সবাই একে চেনে মেষপালকদের রানী বলে। আপনি যে বিশ্বাসঘাতক গোছের লোকজনের কথা বললেন, সেরকম কাউকে আমি ব্রিজের এপারে দেখছি না।'

'পথ ছাড়ুন !' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ। 'আমরা রবিনহুডকে খুঁজছি। এক ঘণ্টা আগেও ওই ফরেস্টারদের সাথে ছিল সে।'

সমান তেজে জবাব দিল ফ্রায়ার, 'যতক্ষণ না আজেবাজে কথা বলার অপরাধে ক্লোরিনডা আর আমার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছেন, ততক্ষণ যেতে পারবেন না আপনি।'

'পথ থেকে সরিয়ে দাও ওদের !' অধৈর্য কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্যার গাই। 'রবিনহুড পালাচ্ছে। ওই মেয়েটাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো। ওকে নিয়ে যেতে পারলে লর্ড ফিটজওয়াল্টারের কাছ থেকে মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে।'

কথা বলতে বলতে মাথার ওপর হাত তুলেছিল স্যার গাই, পরমুহূর্তে ওপার থেকে ধনুক তুলেই একটা তীর ছুড়ল ক্লোরিনডা। স্যার গাইয়ের হাতে গিয়ে বিঁধল সেটা, ব্যথায় ষাঁড়ের গলায় চিৎকার দিয়ে উঠল সে।

'মারো ওদেরকে !' চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ। অমনি আরেকটা তীর এসে তার ঘোড়ার সামনে মাটিতে গেঁথে গেল, পিছনের দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল ঘোড়া। ঝাঁকি সামাল দিতে না পেরে ধপাস করে পিছনের এক হাঁটু থকথকে কাদার গর্তে পড়ে গেল সে।

শেরিফের লোকেরা তীর ছুড়তে ছুড়তে ব্রিজ পার হওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ফ্রায়ার একাই তাদের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। তার হাতের লাঠি কিছু মানছে না। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরছে। ওটার বাড়িতে তাদের ছোড়া তীর ছিটকে চলে যেতে লাগল, বেকায়দা ঘা খেয়ে কেউ বাপ-মাকে ডাকতে ডাকতে বসে পড়ছে, কারও পাঁজরের হাড় চুরমার হচ্ছে বা কাঁধের হাড়ের জোড়া খুলে যাচ্ছে। কারও নাক ফাটছে, কারও মাথা। কেউবা নদীতে লাফিয়ে পড়ে মারের হাত থেকে বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে।

যারা বাকি ছিল, তারা কোনমতে মান-ইজ্জত নিয়ে ভাগল সেখান থেকে। আহত স্যার গাইকে নিয়ে অসহায় রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে শেরিফও ভাগল। পেছনে ফরেস্টারের দল, দানবাকৃতির ফ্রায়ার ও ক্লোরিনডা প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

****

পরদিন সকালে নাস্তা করছিল লর্ড ফিটজওয়াল্টার, এমন সময় দুর্গের প্রধান ফটকে ট্রাম্পেট বেজে উঠতে তাড়াতাড়ি উঠে এল। সশস্ত্র যোদ্ধাদের বড়সড় একটা দল পরিখার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে দেখল সে। হেরাল্ড মুখের সামনে ট্রাম্পেট ধরে বসা। তার পাশে এক অফিসার।

'ড্র ব্রিজ নামাতে বলুন !' লর্ডকে দেখে সে বলল।

'কেন ?' রেগে উঠল লর্ড।

'আপনার সাথে জরুরি কথা আছে।'

'কিসের ব্যাপারে ?'

'নটিংহ্যামের শেরিফ মারাত্মক আহত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর লোকদের মধ্যে অনেকে আহত, অনেকে মৃতপ্রায়। স্যার গাই অভ গিসবোর্ন হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। এসবের জন্যে আমরা উইলিয়াম গ্যামওয়েল, লেডি মেরিয়ান, ফাউন্টেইনস অ্যাবির প্রাক্তন ব্রাদার মাইকেল টাককে দায়ী করছি। আউটল রবিনহুডের সমর্থন নিয়ে এই জঘন্য অপকর্ম ঘটিয়েছে তারা।'

কিছুক্ষণ বোকার মত লোকটার দিকে থাকলেন লর্ড, তারপর গর্জন করে উঠলেন, 'এসব কি ! আমার মেয়ে শেরিফ আর স্যার গাইকে তীর মেরে আহত করেছে ! এসব কি শুনছি আমি ! চলে যাও এখান থেকে। নইলে আমার লোকদেরকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলব আমি !'

'আমি তা না করতে অনুরোধ করব আপনাকে,' শান্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'ব্যাপারটাকে এত হালকভাবে নিতে নিষেধ করব। কারণ স্বয়ং যুবরাজ জন এর প্রতিকার চেয়েছেন।'

'তাহলে তাঁকে আসতে বলো, অথবা আর কাউকে পাঠাতে বলো যার ওপর আমি আস্থা রাখতে পারি। তোমরা যে শেরউডের ছদ্মবেশী ডাকাত না, ছল করে আমার দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করছ না, কি করে বুঝব ?'

কোন জবাব দিল না দলনেতা। দুর্গের প্রতিটা লুপ হোলে তীর-ধনুক নিয়ে তীরন্দাজ প্রস্তুত আছে দেখতে পেল সে। ড্র ব্রিজ এখনও তোলা রয়েছে, ওদিকে পরিখাও অনেক প্রশস্ত। কাজেই লর্ডের মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে সুবিধে করা যাবে না বুঝে বাধ্য হয়ে ফিরে চলল সে।

ভেতরে চলে এল লর্ড। রাগে ফুঁসছে। সাথে সাথে মেয়েকে ডেকে পাঠিয়ে ঘটনা সত্যি কি না জানতে চাইল সে। মেরিয়ান নির্ভয়ে বলল, সব সত্যি।

'তুমি আর দূর্গ থেকে বের হতে পারবে না ! যাও !' কড়া হুকুম জারি করল লর্ড।

'অবশ্যই যাব। সোজা পথে যেতে না পারলে বাঁকা পথে যাব !' কড়া জবাব দিল মেরিয়ান। 'কিন্তু তাহলে আর ফিরে আসার কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না।'

'তোমাকে দুর্গের টারেট চেম্বারে তালা দিয়ে রাখা হবে ! কারও সাধ্য নেই তোমাকে সেখান থেকে বের করে।'

'যুবরাজ পারবেন !' সমান ঝাঁঝের সাথে জবাব দিল মেয়ে। 'শুনেছি তিনি নটিংহ্যামে এসেছেন। বাইরের ওই লোকগুলো তাঁর লোক। রবিনের সাথে বিয়ের দিন আমাকে দেখেছেন তিনি। আমাকে তাঁর মনে ধরেছে। যে কোন মূল্যে আমাকে পেতে চান তিনি। আমাকে স্যার গাইয়ের হাতে তুলে দেয়ার প্রতিজ্ঞা নাকি ভুলে গেছেন।'

'আমি যুবরাজকে ফিরিয়ে দেব !' রাগে চিৎকার করে উঠল লর্ড।

'পারবে না,' মাথা নাড়ল মেরিয়ান। 'তাঁর কত ক্ষমতা ভেবেছ একবার। এই দুর্গ উড়িয়ে দেয়ার ক্ষমতা আছে তাঁর, তোমাকে ধরে গাছের ডালে ফাঁসি দেয়ার ক্ষমতাও আছে। তুমি চাও আর না চাও, যুবরাজ ইচ্ছে করলে আমাকে সহজেই কব্জা করতে পারেন। কিন্তু যদি তুমি আমাকে আটকে রাখো, আর আমি দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে পারি, তাহলে তোমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। বরং তিনি এলে তুমি আমার পালিয়ে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে অথবা আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে দায়মুক্ত হতে পারবে।'

'হুঁম ! ইয়ে ... ' কঠিন এক শপথ নিতে গিয়েও শেষ সময়ে থেমে গেল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। মেয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করল মনে মনে। 'তাহলে ... মানে, যদি তুমি পালিয়েই পাও, আউটল রবিনহুডের কাছেই যাবে ?'

'হ্যাঁ, ওর কাছেই যাব,' দৃঢ় স্বরে বলল মেরিয়ান। 'তবে রাজা রিচার্ড যতদিন না ফিরে আসছেন, রবিনকে ক্ষমা করে রবিনের ন্যায্য অধিকার, পদবি আর সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে আমাকে ওর হাতে সমর্পণ না করছেন, ততদিন আমি মেইড মেরিয়ান হিসেবেই থাকব। ওর সাথে আমার কোন বন্ধন থাকবে না। রবিন আগেই ঈশ্বর এবং মা মেরির নামে এ ব্যাপারে শপথ করেছে, আর আজ আমিও তোমার সামনে একই প্রতিজ্ঞা করছি, বাবা।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'রবিন বা রবার্ট যে-ই হোক, সত্যিকারের সম্মানী মানুষ। তুমি আমার মেয়ে। নজর রেখো বংশের মুখে যাতে চুনকালি না পড়ে। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। এখন নিজের রুমে যাও। আর ... দুর্গ থেকে বের হওয়ার সময় খেয়াল রেখো, কেউ যেন দেখে না ফেলে। তাহলে আমরা সবাই বিপদে পড়ব।'

কয়েক ঘণ্টা পর যুবরাজ জন এসে হাজির হলেন আরলিংটন দুর্গে। একশ সশস্ত্র, সুসজ্জিত যোদ্ধা রয়েছে তাঁর সাথে। লর্ড হাঁটু গেড়ে বসে একান্ত অনুগতের মত কেতাদুরস্ত অভ্যর্থনা জানাল যুবরাজকে। সকালে তাঁর পাঠানো হেরাল্ডকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল।

'আজ আমি নিজেকে খুব সম্মানিত বোধ করছি, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস। খুব সম্মানিত বোধ করছি,' বসা অবস্থায়ই বলল সে। 'আপনার মত অভ্যর্থনা পাওয়ার যোগ্য অতিথি আর হতে পারে না। সকালে আপনার হেরাল্ড যদি তেমন কোন প্রমাণ নিয়ে আসত, আমি অবশ্যই তাদেরকে ঢুকতে দিতাম। কিন্তু কি করব, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস। সেই আউটল রবিনহুড এই এলাকাতেই ঘুরঘুর করছে। কখন কোন বেশে দুর্গে এসে হাজির হয়, তাই ... '

যুবরাজ খুব খুশি হলেন লর্ডের অভিনয়ে। তার অপরাধ ক্ষমা করে আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরে যখন লেডি মেরিয়ানকে তাঁর সামনে হাজির করতে বলা হলো, তখন দেখা গেল গড়বড় হয়ে গেছে। সে তার কক্ষে

নেই। অমনি রাগে ফেটে পড়ল লর্ড ফিটজওয়াল্টার। কর্মচারীর এবং গার্ডদেরকে কাজে অবহেলার জন্য হুমকি-ধমকি দিয়ে অস্থির করে তুলল।

কিন্তু এতকিছুর পরও মেরিয়ানকে পাওয়া গেল না। দুর্গে নেই সে, কীভাবে যেন বেরিয়ে গেছে। অবশেষে এক গার্ড জানাল, যুবরাজ আসার ঘণ্টাখানেক আগে গেট হাউসের কাছে এক তরুণ তীরন্দাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। সে-ও এখন নেই। যুবরাজ হৃষ্টচিত্তে তাঁর লোকদেরকে মেরিয়ানকে খুঁজে বের করার কাজে লাগালেন। কয়েকদিন ধরে দুর্গের আশপাশের এলাকা চষে বেড়াল তারা, কিন্তু মেরিয়ানের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে মেয়েটা।

ওদিকে যুবরাজ তার পুরো বাহিনী নিয়ে নটিংহ্যামে আছেন জানতে পেরে ফরেস্ট রেঞ্জারের ছদ্মবেশ নিয়ে শেরউডের নটিংহ্যাম প্রান্তে এসে দাঁড়াল রবিনহুড। ইচ্ছে আছে, শহরের দিকে থেকে কেউ এলে চেষ্টা করে দেখা তার কাছ থেকে যুবরাজ সম্পর্কে কিছু জানা যায় কি না।

গ্রেট নর্থ রোড ধরে ঘণ্টাখানেক চলার পর বিশাল এক ওক গাছের তলায় থেমে দাঁড়াল ও, কারও দেখা পাওয়ার আশায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এমন সময় হালকা-পাতলা, সুন্দর চেহারার এক তরুণের দেখা পাওয়া গেল। বুনো পথ ধরে সোজা ওর দিকেই আসছে। তার হাতে ধনুক, পিঠে এক তূণ তীর, এবং কোমরে ঝুলছে চওড়া একটা তরবারি।

এক লাফে রাস্তা থেকে নেমে গেল ও। একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের ওপর চোখ রাখল। ছেলেটা কে, কোত্থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে জানা দরকার। সবার আগে জানা দরকার, ও একা কি না।

রবিনহুডের শত্রুর কোন অভাব নেই। কাজেই ছেলেটা তাদের কারও পাতা ফাঁদ হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। আড়াল থেকে তার ওপর কড়া নজর রাখল রবিন। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে ছেলেটা। সাথে আর কেউ নেই। একা। কাছাকাছি আসতে আড়াল ছেড়ে একলাফে রাস্তায় এসে দাঁড়াল রবিন। কড়া গলায় থামতে বলল ওকে।

'এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় চলেছ তুমি ?' বলল রবিন। 'নটিংহ্যাম শহরে আজ কি চলছে, বলতে পারো ?'

'আমি আমার কাজে যাচ্ছি, যেখানে খুশি সেখানে যাচ্ছি !' নির্ভয়ে জবাব দিল ছেলেটা। ডাকাতের মত চেহারার এক লোককে আচমকা লাফ দিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াতে দেখেও এক ফোঁটা ভয় পায়নি। 'তা জেনে তোমার কাজ নেই। নটিংহ্যামের খবর জানতে চাইলে শোনো, যুবরাজ জন এসেছেন সেখানে। জঙ্গলের সব আউটলকে খুঁজে খুঁজে নিকেশ করতে।'

'আচ্ছা !' মাথা দোলাল রবিনহুড। হঠাৎ মনে হলো, এ মুহূর্তে রেঞ্জার সেজে আছে ও–রাজকীয় হরিণের রক্ষক। কাজেই রক্ষকের ভূমিকা না নিলে চলে না। তাই বলল, 'তা তুমি তীর-ধনুক নিয়ে বনের মধ্যে কেন এসেছ বললে না ?'

'কেন বলব ?' বলল তরুণ। 'আমি পথচারী। পথচারীরা যা করে, আমিও তাই করব।'

'আর আমার কাজ কি, তা জানো ?' গম্ভীর হলো রবিন। 'তোমার মত অনিশ্চিত চরিত্রের পথচারীদের নাম-পরিচয় জেনে রাখা। কি, নিজে থেকে বলবে ? নাকি অস্ত্র দেখিয়ে মুখ দিয়ে বের করে নিতে হবে ?'

'এসো তাহলে,' এক লাফে পিছিয়ে গেল ছেলেটা। চট্ করে তূণ ও তীর মাটিতে রেখে তরবারি বের করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো। 'দেখা যাক, কত ওস্তাদ তুমি !'

মুহূর্তে তরবারির সাথে তরবারির সংঘর্ষের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল শেরউড। ছেলেটা যে তলোয়ারে ভাল দক্ষ, তা টের পেতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না রবিন হুডের। ভারি অবাক হয়ে গেল ও। পিছু হটার কোন লক্ষণ নেই ছেলেটার মধ্যে, সমান তেজের সাথে লড়ে যেতে থাকল। তলোয়ার যুদ্ধের সমস্ত কৌশল ভালই জানা আছে ছেলেটার, তবে কব্জির জোর এবং মারের ওজন রবিনের চেয়ে অনেক কম।

সমানে লড়ে চলেছে রবিন। কিন্তু একটা অপরিণত ছেলের বিরুদ্ধে পুরো শক্তি দিয়ে লড়তে বিবেকের বাধা আসছে। ফলে অনেকক্ষণ ধরে চলল যুদ্ধ। ছেলেটা এরমধ্যে মুহূর্তের জন্য বেকায়দায় পেয়ে রবিনের গাল খানিকটা কেটে দিয়েছে। রবিনের তরবারির ছোঁয়ায় তারও হাত কেটে গেছে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও !' একটু পর লড়াই বন্ধ করে পিছিয়ে দাঁড়াল রবিন। তরবারির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি বেশ ভাল লড়াই করতে পারো। কিন্তু এভাবে শক্তিক্ষয় করে কোন লাভ হবে না। তারচে' এক কাজ করো না কেন ?'

'কি কাজ ?' হাঁপাতে হাঁপাতে হাতের ক্ষতটা দেখল তরুণ। খানিকটা জায়গা কেটেছে তরবারির খোঁচায়। রক্ত এখনও পড়ছে, তবে অল্প অল্প।

'রবিনহুডের দলে যোগ দাও।'

'তুমি রবিনহুড !' ঢোঁক গিলল ছেলেটা।

'হ্যাঁ, আমি রবিনহুড।'

কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে থাকল তরুণ। তারপর প্রচণ্ড আবেগে কাঁপা গলায় ডাকল, 'রবিন ! রবিন !'

রবিন অবাক হলো। 'কে !'

'আমাকে চিনতে পারোনি তুমি ?'

'মেরিয়ান !' পরমুহূর্তে রবিনের প্রশস্ত বুকে আশ্রয় হলো ওর। 'শেরউডে তোমাকে স্বাগতম।'

ওর যা বলার ছিল, সব মন দিয়ে শুনল রবিন। তারপর বলল, 'চলো। আমার গোপন আস্তানায় চলো। স্কারলেট, লিটল জন, আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড আর মাচ, সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেব শেরউডের রানীর সাথে। ওরা তোমাকে রানীর মতই সম্মান করবে। তোমার একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক হয়ে থাকবে।'

সে রাতে রবিনের অনুসারীরা শেরউডের মাঝখানের গোপন গ্লেডে তাদের অপরূপ সুন্দরী রানীকে আনন্দ-উৎসব আর রাজকীয় খানাপিনার মাধ্যমে স্বাগত জানাল। গলা পর্যন্ত হরিণের রোস্ট এবং নাক পর্যন্ত ওয়াইন ও বাদামি এল খেল সবাই। তারপরও প্রচুর খাবার ও পানীয় বেঁচে গেল।

উৎসব শেষ হতে এক ফ্ল্যাগন (পেট মোটা বোতল) ওয়াইন হাতে উঠে দাঁড়াল রবিনহুড। চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধুরা ! এসো, রাজা রিচার্ড এবং তাঁর দ্রুত ফিরে আসা কামনা করে আমরা আরেকবার পান করি !'

আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড

এ ঘটনার কিছুদিন পরের কথা।

যত দিন যাচ্ছে, রবিনহুডের দল ততই ক্ষমতাধর হয়ে উঠছে। তার সাথে তাল মিলিয়ে শেরিফ আর স্যার গাই অভ গিসবোর্নের নিষ্ঠুরতা আর একনায়কতন্ত্র অচল হয়ে পড়ছে শেরউডে।

এর মধ্যে দলের সবার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে লিটল জন। দুঃসাহস, কূট রণকৌশল আর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে নিজেকে রবিনহুডের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে। নেতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, বিনয় ইত্যাদি প্রকাশের বেলায়ও নিজেকে সবার সেরা প্রমাণ করেছে।

রবিনহুড যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ লোক জোগাড় করেছিল ; যেমন লিটল জন, সেরকম আরেকজন ছিল আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড নামের এক দুর্দান্ত সাহসী লোক। তার পেশা ছিল চামড়া পাকা করা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে সে। পরে সেগুলোকে শুকিয়ে পাকা করে ধনী ব্যবসায়ী, এমনকি নাইট এবং তাদের স্ত্রীদের কাছে বিক্রি করে।

যেমন ছিল তার সাহস, তেমনি গায়ের জোর। কুস্তি, লাঠি খেলা আর তীর ছোড়ায় আর্থার-এ-ব্ল্যান্ডের সমকক্ষ কেউ ছিল না। কুস্তিতে পর পর পাঁচ বছর মিডকান্ট্রি চ্যাম্পিয়ন ছিল লোকটা। শেষবার কুস্তি লড়তে গিয়ে পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কুস্তি ছেড়ে শুধু লাঠি আর তীর-ধনুক নিয়ে আছে। এবার তাকে ঝোলায় পুরবে রবিনহুড।

***

মে মাস। একদিন বিকেলে আস্তানার এক গ্রিনউড গাছের নিচে সবুজ ঘাসের মোলায়েম কার্পেটে শুয়ে-বসে হালকা গল্প-গুজবে মেতে ছিল দলের কয়েকজন। বেশি গরম পড়ায় কেমন একটা আলস্য ভাব সবার মধ্যে। কাছ দিয়ে সেই ছোট ঝরনাটা বয়ে চলেছে, কোকিল আর ঘুঘুর উদাস, মিষ্টি গান তার সাথে মিশে অপূর্ব সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

মাথার ওপরের ওক গাছটার ঝাঁকড়া মাথা মৃদু বাতাসে দুলছে, চিক চিক করছে পাতাগুলো। শেষ বিকেলের অস্তমিত রোদের আলো ঘাসের ওপর আলো-ছায়ার খেলা খেলছে।

দলের বেশিরভাগ লোকই নেই, ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে নানান কাজে চলে গেছে। ডেরার পাহারায় রয়েছে মাত্র পাঁচ-ছয়জন। রবিনের এক পাশে মস্ত বড় লাঠিটা কোলবালিশের মত ধরে আধশোয়া হয়ে আছে লিটল জন। আরেক পাশে আছে উইল স্কারলেট। পেশিবহুল, শক্ত-পোক্ত শরীর লোকটার। চাউনি হাউন্ডের মত। দৌড়ে কেউ পারে না তার সাথে। তার পাশে বসেছে ডঙ্কাস্টারের ডেভিড নামের আরেক বিশালদেহী। প্রায় লিটল জনের সমান সে, গায়ের জোরও তেমনি। তবে বয়স খুব কম। দাড়ি গোঁফ সবেমাত্র গজাতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে উঠে বসল রবিন। 'নাহ্, শুয়ে-বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। যাই, একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি।'

'কোথায় ?' বলল লিটল জন। 'কোথায় যাবে ?' দলে বেশিদিন হয়নি যোগ দিয়েছে সে, কিন্তু এরমধ্যেই রবিনহুডের এই অভ্যেসের সাথে বেশ ভালই পরিচয় হয়ে গেছে ওর। বুঝে গেছে, একবার যখন ওর মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেছে, তখন দুনিয়া উল্টে গেলেও রবিনের কথার নড়চড় হবে না।

'তেমন কোথাও না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রবিনহুড। 'এই ধারেকাছেই যাব।'

উঠে পড়ল। কোমরের বেল্টটা ভালো করে এঁটে লাঠিটা তুলে নিল, তারপর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথে রওনা হয়ে গেল। হাঁটছে আর আপনমনে শিস বাজাচ্ছে।

ওদিকে চামড়া কিনতে নটিংহ্যাম থেকে বেরিয়েছে আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড। ঘোড়ার দুলুনির সাথে তাল রেখে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। কোমরের বেল্টে তলোয়ার ঝুলছে। চলতে চলতে গুন গুন করে দু-এক কলি গান গাইছে।

এখানে-সেখানে প্রচুর বুনো আপেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে, ফুলে ছেয়ে আছে সেগুলো। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সে ফুলের মিষ্টি গন্ধ। ঘাসের গালিচা ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে গায়ক পাখি ভরত, শূন্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে।

মে মাসের সকালের মিষ্টি রোদ মেখে ঝলমল করছে তাদের ডানা। আকাশ থেকে মধু বর্ষণ করছে তার মিষ্টি সুরেলা গান। এমন সময় আর্থার-এ-ব্ল্যান্ডের সাথে দেয়া হয়ে গেল রবিন হুডের। আজ তীর-ধনুক রেখে শুধু একটা লাঠি নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি এগিয়ে চলল তাদের ঘোড়া, রবিনও তাল মেলাল আর্থারের সুরের সাথে।

গান থামতে দু'জনেই পরস্পরের মিষ্টি গলার প্রশংসা করল। রবিন বলল, 'তোমাকে দেখে ট্যানার মনে হচ্ছে !'

'হ্যাঁ,' আর্থার মাথা ঝাঁকাল।

'চামড়া কিনতে চলেছ ?'

'না,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আউটল রবিনহুডকে ধরতে চলেছি।'

'তাই বুঝি ?' ঘুরে লোকটাকে ভাল করে দেখল ও।

'হ্যাঁ। নটিংহ্যামের শেরিফের স্বাক্ষর করা ওয়ারেন্ট আছে আমার সাথে। তাকে ধরতে পারলে পাঁচশো পাউন্ড পাব। তাহলে অনেকদিন আরামে কাটাতে পারব। চামড়া খোঁজাখুঁজি করতে যেতে হবে না, বিক্রি করতে যেতে হবে না।'

'ঠিকই তো !' তাকে উৎসাহ দিল রবিন।

'তুমি যদি আমাকে এ কাজে সাহায্য করো,' ট্যানার বলল। 'আমি তোমাকে টাকা দেবো। ধরো, একশো পাউন্ড। কি বলো ?'

'আগে তোমার ওয়ারেন্টটা দেখাও,' সহজ কণ্ঠে বলল রবিন। 'যদি ওটা ভুয়া না হয়, অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব আমি।'

'না, না !' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'ওই জিনিস কারও হাতে দিতে বিশ্বাস হয় না আমার। আমি কাউকে আমার এবং আমার পুরস্কারের মধ্যে দাঁড়তে দিতে রাজি নই।'

'না চাইলে আর কথা কি !' রবিন বলল। 'তবে আমারও এখানে দর কষাকষির সুযোগ আছে। ধরো, রবিনকে যেখানে একা, নিরস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যাবে, আমি যদি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই, আমার একশো পাউন্ড দেবে তো ?'

'অবশ্যই দেব,' বলে ওর বিশ্বাস অর্জনের জন্য শপথ নিল লোকটা।

'তাহলে নটিংহ্যামের দিকে চলো। ওখানে বনের প্রান্তে একটা সরাইখানা আছে। রবিন প্রায়ই সেখানে যায়। আজও মনে হচ্ছে যাবে।'

'চলো !' সোৎসাহে ঘোড়া ঘোরাল ট্যানার। অল্প সময়ের মধ্যে ব্লু বোর ইনে এসে পৌঁছল ওরা। রবিন ও ইন কিপারের মধ্যে যে দ্রুত কিছু বাক্য বিনিময় হলো, আর্থার তা বুঝতেই পারল না। এল আর ওয়াইনের অর্ডার দিয়ে ট্যানারের দিকে ফিরল রবিন। 'তোমার লোক না আসা পর্যন্ত আমরা পান করতে পারি, কি বলো ?'

'অবশ্যই, অবশ্যই !'

পান করতে লাগল ওরা। ট্যানারের পাত্র খালি হতে না হতেই নতুন পাত্রের অর্ডার দেয় রবিন, এবং দেখতে না দেখতে তা-ও খতম হয়ে যায়। এরকম কয়েকবার ঘটার পর দেখা গেল রবিনের পাত্র যেমন ছিল প্রায় তেমনই আছে, কিন্তু আর্থার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি মেঝেতে বসে থাকার ক্ষমতাও তখন অবশিষ্ট নেই।'

'এবার, বন্ধু,' বলল ও। 'রবিনহুডকে তুমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। আমিই রবিনহুড। ওয়াদা অনুযায়ী আমার সাথে কোন অস্ত্রও নেই। শুধু একটা বাঁশের লাঠি আছে, তাও ওখানে। দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। অথচ তোমার কাছে তরবারি আছে, পকেটে রবিনহুডকে গ্রেফতার করার শেরিফের স্বাক্ষর করা ওয়ারেন্ট আছে। যা খুশি করো। কিন্তু আগে কথামত আমার একশো পাউন্ড দিয়ে নাও !'

আর্থার এ ব্ল্যান্ডের মুখে কোন কথা জোগাল না। বোকার মত কিছুক্ষণ হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর আস্তে করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। নাক ডাকাতে শুরু করল জোরে জোরে।

লোকটার পাউচ খুলল রবিনহুড। ভেতরে শুধু শেরিফের স্বাক্ষর করা ওয়ারেন্ট আর দশটা রূপার মুদ্রা পাওয়া গেল। ওয়ারেন্টটা বাদে আর সব জায়গামত রেখে লাঠিটা নিল রবিন। ভেতরে গিয়ে ইন কিপারের সাথে কথা বলে চলে গেল। কিছু সময় পর ঘুম ভাঙল আর্থারের।

ধস্তা-ধস্তি করে উঠে বসল সে। মাথার ব্যথায় গোঙাচ্ছে। পাউচ পরীক্ষা করে ইন মালিককে ডেকে পাঠাল সে। 'তোমার এখানে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাগজ ছিনতাই হয়েছে। নটিংহ্যামের শেরিফের স্বাক্ষর করা একটা ওয়ারেন্ট ছিল আমার পাউচে। রবিনহুড নামের এক আউটলর গ্রেফতারি পরোয়ানা। লোকটাকে ধরতে পারলে মোটা টাকা পুরস্কার পেতাম আমি। কিছুদিন সুখে কাটাতে পারতাম। এখন ওয়ারেন্ট আর টাকা, সব গেল। আমার সেই বন্ধুই বা কোথায় গেল ? আমার সাথে যে এসেছিল ?'

'সে কি !' নকল বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল ইন মালিক। 'ওই লোক তোমার বন্ধু ছিল ! আরে সে-ই তো রবিনহুড !'

'রবিনহুড !' বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো আর্থারের। 'বলো কি ! তাহলে লোকটা ভালই চালাকি করেছে আমার সাথে ! কোনদিকে গেল লোকটা ?'

'কোথায় আবার, জঙ্গলের দিকে ! তুমিও যেতে চাও ? যাও তাহলে, কিন্তু তোমাদের দু'জনের মদের বিল এসেছে দশ শিলিং, ওটা দিয়ে যেয়ো। নইলে কিন্তু আটকে রাখব।'

কিছু করার নেই দেখে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড। ওই দশ শিলিংই সম্বল ছিল তার। মদের দাম শোধ করতে সব গেল দেখে রবিনের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর কঠিন এক শপথ নিল লোকটা। তারপর ঘোড়ায় চেপে শেরউডের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে, এমন সময় রবিনহুডের দেখা পেয়ে খুশি হয়ে উঠল আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড। সে কালে গ্রেট নর্থ রোড শেরউডের মধ্যে দিয়ে ছিল। সেই পথ দিয়ে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। হাতের লাঠিটা থেকে থেকে মাথার ওপর ঘোরাচ্ছে। ওকে দেখে গায়ে জ্বালা ধরে গেল আর্থারের।

চিৎকার করে বলল, 'থামো ! তোমার সাথে কিছু বোঝাপড়া আছে আমার। নইলে এই তলোয়ারের এক কোপে দিয়ে ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে দেব।'

চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রবিনহুড। লাঠিটা বাগিয়ে ধরল। 'আবার কোন পাজি এলো রে !'

'কোন পাজি আসেনি,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল ট্যানার। 'তুমি তা ভাল করেই জানো।'

'আরে, তাই তো ! আমার ট্যানার বন্ধু দেখছি !' চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'স্বাগতম, প্রিয় বন্ধু। স্বাগতম। তুমি নিশ্চয়ই আমার পাওনা একশো পাউন্ড দিতে এসেছ ?'

রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটা। হুঙ্কার ছেড়ে উঠল, 'একশো পাউন্ড ?'

'সেরকমই তো কথা ছিল,' গম্ভীর হলো রবিন। 'তুমি বলেছ আমি রবিনহুডকে একা, নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে তুমি টাকাটা দেবে। আমি তাই করেছি। আমি নিজেই রবিনহুড ! পরিচয় দেয়ার পর কোথায় তুমি আমাকে গ্রেফতার করবে, তা না। ওঠার কোন গরজই দেখালে না ! শুয়ে একেবারে ঘুম !'

'আমি এখনই গ্রেফতার করব তোমাকে !' চেঁচিয়ে উঠল আর্থার, পরমুহূর্তে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে একটানে খাপ থেকে তরবারি বের করে ওর দিকে তেড়ে গেল। কিন্তু তিন-চার কদমের বেশি যাওয়ার আগেই রবিনের লাঠির এক আঘাতে তার হাত থেকে অস্ত্র ছুটে গেল। উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল সেটা।

'লাঠির বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করা কোন কাজের কথা হলো না। লড়তে যদি হয়ই, একটা লাঠি জোগাড় করে নিয়ে এসো। তারপর দেখব কে কাকে গ্রেফতার করে।'

'আচ্ছা !' রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাছের একটা ঝোপের দিকে ছুটে গেল ট্যানার আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড। মজবুত দেখে একটা ওক গাছের ডাল কেটে নিয়ে এসে রবিনকে এত জোরে আঘাত করতে লগিল যে লাঠির সাথে লাঠির ঠোকাঠুকির বিকট শব্দ অনেক দূর থেকেও শোনা যেতে লাগল।

দীর্ঘ সময় লাঠালাঠি করেও কোন ফল না হওয়াতে বিছুক্ষণের জন্য জিরিয়ে নিতে বসল ওরা। রবিন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বন্ধু, মনে হচ্ছে আমার লাঠি তোমারটার চেয়ে একটু বেশি লম্বা। দাও তো দেখি তোমার লাঠিটা, মেপে সমান করে কেটে দিই !'

'ওটা কোন ব্যাপার না,' আর্থার মাথা নাড়ল। 'ওক গাছের এরকম আট ফুট লম্বা লাঠি দিয়ে আমি বুনো ষাঁড় পিটিয়ে মারি। আশা করি তোমাকে মারার মত যথেষ্ট লম্বা এটা।'

বিশ্রাম নিয়ে উঠে আবার শুরু করল তারা। এবার অল্প সময়ের মধ্যেই দু'জনের চোখমুখ বেয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করল। রবিনের ক্রুদ্ধ লাফঝাঁপ দেখে মনে হতে লাগল বুনো শুয়োর রক্তের স্বাদ পেয়েছে বুঝি। তবে আর্থার ওর মত করল না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিটা মার ঠেকিয়ে যেতে লাগল সে। এভাবে প্রায় দু' ঘণ্টা লড়াই করার পরও কোন ফল হলো না, শুধু লাঠালাঠির শব্দই শোনা যেতে লাগল।

'ব্যস, ব্যস ! এবার থামো !' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'আর ঝগড়া-মারামারি না। কারণ এভাবে চলতে থাকলে কোনকালেও কোন সমাধানে পৌঁছতে পারব না আমরা।'

'আমি এখনও আমার পাঁচশো পাউন্ডের আশা ছাড়িনি,' আর্থার বলল ঢোঁক গিলে। 'টাকাটা আমাকে অর্জন করতেই হবে, নইলে ওয়াদামত তোমাকে একশো পাউন্ড দেব কোত্থেকে ?'

'ঠিক আছে,' রবিন বলল। 'তাহলে আমার ঘাঁটিতে চলো। আমার দলে যোগ দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সেখানে পাঁচশো পাউন্ডের বেশি রোজগার করতে পারবে তুমি। আমার একশো পাউন্ডও শোধ করতে পারবে।'

ইতস্তত করতে লাগল ট্যানার। 'আমি একজন মুক্ত মানুষ। একজন নামকরা ট্যানার। তোমার চামড়া ট্যান করে শেরিফের কাছে বিক্রি করব ভাবছিলাম।'

'ঠিক আছে, পরে কোরো। এখন চলো, আমাদের সাথে আজ ডিনার খাবে তুমি। তোমার খরচে আজ গলা পর্যন্ত পান করেছি, তার বিনিময়ে ভাল খানাপিনা পাওনা হয়েছে তোমার। তবে মনে হয়, একবার আমাদের ওখানে গেলে তুমি

থেকে যেতে চাইবে। কারণ আমি শুনেছি তুমি একজন নামকরা তীরন্দাজও। লাঠিতে কত ভাল, সে তো হাড়ে হাড়ে টেরই পেলাম।'

কথা শেষ করে রবিন ওর শিঙায় ফুঁ দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই লিটল জনসহ আরও কয়েকজন এসে পৌঁছল সেখানে। তাদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে আর্থার চেঁচিয়ে উঠল। 'আরে ! ওটা কে আসছে, জন লিটল না ?'

'আগে ছিল ওই নাম,' রবিন বলল। 'আমার দলে যোগ দেয়ার পর নামটা ঘুরিয়ে লিটল জন করা হয়েছে। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত বন্ধুদের মধ্যে একজন ও।'

'তাহলে আমিও তোমার দলে যোগ দেব,' বলে হাসল ট্যানার। 'জন আমার আপন খালাত ভাই। আমাদের দু'জনের মা আপন বোন। কয়েক বছর ধরে ওদের খবর ছিল না। আমি মনে মনে খুঁজছিলাম জনকে।'

'কি হয়েছে ?' কাছে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল লিটল জন। 'ব্যাপার কি ?'

'এই ট্যানার আমার চামড়া ট্যান করতে এসেছে,' হাসিমুখে বলল রবিন।

পরমুহূর্তে লাঠি উঁচিয়ে প্রস্তুত হলো দানব লিটল জন। 'তাই নাকি ? তার আগে তাহলে ওর সাথে বোঝাপড়া করে নিতে হয় আমাকে !'

'রাখো, রাখো, লিটল জন !' দু' হাত তুলে বাধা দিল ও। 'এতক্ষণ অনেক লড়াই হয়েছে। আর না। আমাদের এই নতুন বন্ধুটির নাম আর্থার-এ-ব্ল্যান্ড। ও পেশায় ট্যানার। আমার ধারণা তুমি একে চেনো !'

ধীরে ধীরে হা হয়ে গেল লিটল জন। কিছুক্ষণ অপলক আর্থারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর লাঠি ফেলে দিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল তারা।

অ্যালান-এ-ডেল

শেরউডই রবিনহুড ও তার দলের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল না। অন্য আরও অনেক জায়গা ছিল। তার সবগুলোই যে বনে-জঙ্গলে, তা-ও কিন্তু নয়। দেশের নামকরা দু'-একজন নাইটও ছিলেন রবিনের পৃষ্ঠপোষক। ওর বা ওর দলের লোকদের জন্য তাদের দুয়ার সব সময় খোলা থাকত।

এরকম একজন ছিলেন স্যার রিচার্ড অভ লে (Legh)। রবিনের মত তিনিও ছিলেন রাজা রিচার্ডের অন্ধ সমর্থক এবং যুবরাজ জনের প্রধান শত্রুদের মধ্যে অন্যতম। এরকম সাহায্যকারী অনেক ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিদাসও ছিল। তাই রবিনের মাথার জন্য অনেক টাকা পুরস্কারের ঘোষণা থাকার পরও সুবিধে করে উঠতে পারেনি শেরিফ। টাকার লোভে কেউ রবিনকে ধরিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, বরং উল্টে তাকে আশ্রয় দিয়ে অত্মগোপন করে থাকতে সাহায্য করেছে। তাদের মধ্যে একজন ছিল চারণ কবি ও গায়ক, অ্যালান-এ-ডেল।

এক বসন্তে রবিনের সাথে অ্যালান-এ-ডেলের পরিচয়।

মন ভাল না বলে একদিন বিকেলে ঘুরতে বের হলো রবিনহুড। ডেরা ছেড়ে কিছুটা দূরে এসে রাস্তা থেকে একটু ভেতরে একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। এমন সময় হঠাৎ অপূর্ব মিষ্টি একটা সুর শুনতে পেল ও।

কে যেন গান গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে–গানের সাথে হার্পের তারে মৃদু মৃদু টোকাও দিচ্ছে। কে হতে পারে লোকটা ? ভাবল ও। ভারি মিষ্টি গলা তো ! আড়াল থেকে পথের দিকে তাকাল রবিন।

একটু পরই দেখা দিল গায়ক–অত্যন্ত সুদর্শন এক যুবক। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুল তার, মাথায় ছোট একটা টুপি। টুপির একদিকে কয়েকটা মোরগের পালক গোঁজা। যুবকের পরনে উজ্জ্বল লাল রঙের পোশাক। হাঁটার তালে তালে হার্পের তারে আঙুল বোলাচ্ছে সে, অপূর্ব এক প্রেমের গান গাইছে। গানটা এত ভাল লাগল রবিনের, মনে হলো সারা শেরউড বুঝি খুশিতে কাঁপছে। একেই মনে হয় সুরের জাদু বলে ! যুবক যেন আনন্দের জোয়ার নিয়ে এসেছে শেরউডে। বুকের ভেতরে কাঁপন উঠে গেল রবিনের।

কি মিষ্টি গলা ! কি আশ্চর্য সুন্দর গান। সামনে দিয়ে কানে মধু ঢালতে ঢালতে হেঁটে চলে গেল গায়ক। যতোক্ষণ তার গান শোনা গেল, ততোক্ষণ

একভাবে বসেই থাকল রবিন। এতো মিষ্টি গান জীবনে আর কখনও শোনেনি ও। একটু পর পূর্বদিকে তাকাল। দেখা গেল দূরের প্রকৃতিতে সন্ধের আঁধার ঘনিয়ে আসছে। আজ আর মক্কেলের আশা নেই বুঝতে পেরে উঠে পড়ল রবিন, গুন গুন করে একটু আগে শোনা অজ্ঞাত গায়কের গান গাইতে গাইতে আস্তানার দিকে ফিরে চলল।

পরদিন সকাল দশটার কথা। গ্লেডের বুড়ো ওকের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে রবিনহুড। ওর একপাশে চিত হয়ে শুয়ে আছে উইল স্কারলেট, আরেক পাশে বসা লিটল জন। ক্র্যাবট্রির একটা ডাল কেটে নিয়ে এসেছে সে, ছুরি দিয়ে সেটাকে চেঁছে সমান করে লাঠি বানাচ্ছে এখন। ওদের আশপাশে আরও কয়েকজন আছে। শুয়ে-বসে গল্প করছে।

এমন সময় দূর থেকে গান ভেসে এল। কে যেন গান গাইতে গাইতে এদিকেই আসছে। আগের দিনের সেই মিষ্টি কণ্ঠের গায়কের কথা মনে পড়ল রবিনের। কিন্তু সুরের এ কি আকাশ-পাতাল পরিবর্তন ! লোকটা কি কালকের সেই গায়ক, না নতুন কেউ ? কালকের জনই তো মনে হচ্ছে, তাহলে আজ এত দুঃখের গান কেন তার গলায় ?

একটু পর গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো গায়ক। সেই যুবকই। তবে আজ তার চেহারায় আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে হাঁটছে সে, চলার ভঙ্গি দেখে মনে হয় কেউ বুঝি তার জীবনের সমস্ত আনন্দ এক ফুঁ-তে উড়িয়ে দিয়েছে। কল্পনা করাও কঠিন, এই যুবকই কাল গান গেয়ে, চারদিকে খুশির বন্যা বইয়ে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। অথচ আজ মনে হচ্ছে গোটা শেরউড যেন স্তব্ধ হয়ে যুবকের বিলাপ শুনছে। সারা বন কাঁদছে তার অজানা কষ্টে।

দৈত্যাকার লিটল জনের চোখ পানিতে ভিজে উঠল। 'আহা,' বলল সে। 'এত কিসের দুঃখ ছেলেটার ?'

'অথচ কাল একে সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখেছি আমি,' রবিন বলল। 'নিশ্চই কিছু একটা হয়েছে বেচারার। যাও তো, এখানে ডেকে নিয়ে এসো ওকে। কি হয়েছে শুনি আমরা।'

লিটল জন আর মাচ এগিয়ে গেল তার দিকে। দেখা গেল, বিষণ্ন মনে করুণ গান গাইলেও যুবক মোটেও ভীরু নয়। বরং যথেষ্ট সাহসী। জন মোটা, গম্ভীর গলায় দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয়ামাত্র বাজনা থামিয়ে ঝট্ করে ওদের দিকে ঘুরল সে। দ্রুত হাতে কাঁধ থেকে ধনুক নামিয়ে তাতে তীর বসালো–আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করবে প্রয়োজন দেখা দিলে।

হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল লিটল জন। বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না আমরা। ওই দেখো আমাদের দলনেতা বসে আছে, তোমার সাথে দু'টো কথা বলতে চায়।'

খুব সমাদর করে যুবককে নিজের পাশে বসাল রবিনহুড। নরম গলায় বলল, 'তুমি নিশ্চই বুঝতে পারছ আমরা সাধারণ মানুষ নই ! আমাদেরকে দিয়ে যাওয়ার মত অতিরিক্ত কিছু কি আছে তোমার কাছে ?'

'পাঁচটা শিলিং আর একটা আংটি ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে।' পকেট থেকে শিলিং কটা বের করল যুবক। আংটিসহ রবিনহুডের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'এই নাও।'

'বিয়ের আংটি মনে হচ্ছে ?' প্রশ্ন করল রবিন।

মাথা নত হয়ে গেল যুবকের। 'হ্যাঁ। সাত বছর ধরে সাথে সাথে রেখেছি ওটা। আশা ছিল একদিন কাজে লাগবে। কিন্তু লাগল না। এখন আর ওটার কোন মূল্য নেই আমার কাছে। ইচ্ছে হলে নিয়ে নিতে পারো।'

'মূল্য নেই কেন ?'

'কারণ মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওরা।'

'হুঁম !' মাথা দোলাল রবিন। 'তাই তো বলি, কাল যাকে দেখেছি খুশির ঝড় তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলছে, আজ তার এতো পরিবর্তন কেন হলো ? কি হয়েছে, আমাকে খুলে বলো।'

'কাল আমাকে দেখেছো তুমি ? ঠিকই বলেছো। দুনিয়ার সেরা সুন্দরী, মিষ্টি এক মেয়েকে বিয়ে করবো বলে কাল এই পথ ধরে খুব খুশি মনেই গিয়েছিলাম আমি। কিন্তু হলো না,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল যুবক। 'হলো না। আমার কলজে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ওরা। আজ একজন ধনী, একেবারে বুড়ো নর্ম্যান নাইটের সাথে বিয়ে দিচ্ছে মেয়েটাকে।'

'মেয়েটা হঠাৎ মত পাল্টেছে বুঝি ?'

'না, না !' চেঁচিয়ে উঠল যুবক। 'ও কেন মত পাল্টাতে যাবে ? ও তো আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে ! কিন্তু আমার ঘরবাড়ি, টাকা-পয়সা, জমি-জমা কিছু নেই তো, তাই আমার সাথে বিয়ে দেবে না ওর আত্মীয়রা। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বুড়ো এক নাইটের সাথে আজ বিয়ে হবে ওর। তাই আমি চলে যাচ্ছি।'

'তোমার নাম কি ?' জানতে চাইল রবিনহুড।

'অ্যালান-এ-ডেল।'

'আচ্ছা !' বিস্মিত হয়ে যুবকের দিকে তাকাল ও। 'তোমার নাম শুনেছি আমি ! তুমিই তাহলে রডারস্ট্রিমের অ্যালান ?' যুবক মাথা ঝাঁকাতে ওর কাঁধে হাত রাখল ও। 'বয়স কত তোমার ?'

'বিশ বছর।'

'মেয়েটিকে সত্যিই ভালোবাসো তুমি ?'

'নিজের জীবনের চাইতেও বেশি।'

'সব কথা খুলে বলবে আমাদের ?' নরম গলায় বলল রবিন। 'তাহলে মনের বোঝা অনেক হালকা হয়ে যাবে।'

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল অ্যালান। 'তোমাকে তো ডাকাত বলে মনে হচ্ছে না আমার ! বরং মনে হয়, তোমার মতো ভালো মানুষ বুঝি আর নেই। বেশ, শোনো তাহলে ... '

প্রেমিকা এলেনের সাথে কিভাবে তার পরিচয় হলো, কিভাবে পরস্পরের ভালবাসা হলো, দু'জনের জীবনের কতো মধুর স্মৃতি আছে, একে একে সব খুলে বলল যুবক। ভালবাসার অসাধারণ এক কাহিনী মন দিয়ে শুনল ওরা। শুনতে শুনতে লিটল জনের মনে হলো গলার কাছে কি যেন একটা আটকে গেছে–উঠছেও না, নামছেও না। এত গভীর বেদনার কথা ছেলেটা এমন সহজ সরল ভাষায় বলে গেল যে আরও অনেকেই চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না।

'এলেনরা গরিব,' সবশেষে বলল অ্যালান। 'অনেক টাকা দেনা ওদের। বুড়ো নাইটকে বিয়ে করলে সে দেনার হাত থেকে বাঁচবে ওর পরিবার। কিন্তু আমি জানি, ও দুঃখের অনলে দাউ দাউ করে জ্বলব। আমার জন্যে ... এলেন ... ' গলা বুজে এল যুবকের। মাথা নত করে বসে থাকল।

কিছুক্ষণ পর আবার ওর কাঁধে হাত রাখল রবিন। নরম গলায় বলল, 'আচ্ছা, অ্যালান-এ-ডেল, আমি যদি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করি, যেমন করে হোক তোমাদের দু'জনের বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আমাকে কি দেবে তুমি ?'

'সত্যিই পারবে তুমি ? আমার টাকা-পয়সা নেই যে তোমাকে দেব। তবে কাজটা করে দিতে পারলে বাকি জীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব আমি। তুমি যা বলবে তাই করব।'

'না, না ! কেনা গোলাম হতে হবে না তোমাকে,' রবিন বলল। 'কিন্তু ধরো যদি বলি তোমার গান আমার খুব ভালো লাগে, তুমি আমাদের সাথে এই শেরউডে থাকবে ?'

'এলেনকে পেলে আমি দুনিয়ার যে কোনখানে গিয়ে মনের আনন্দে থাকতে পারবো।'

'ঠিক আছে, অ্যালান-এ-ডেল। ভেবো না। এবার বলো, এলেনের বিয়ে কোথায় হবে ?'

'এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরের এক গির্জায় হবে। বন থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে ...'

'বুঝেছি, পিটারবরো গির্জার কথা বলছ। সময়মত ওখানে পৌঁছে যাবো আমি।' খানিক চিন্তা করে যুবকের দিকে হাত বাড়াল রবিন। 'তোমার হার্পটা একটু ধার দিতে হবে আমাকে।'

সাথে যত অস্ত্র ছিল, সব খুলে লিটল জনের হাতে দিল রবিন। হার্পটা নিয়ে খানিকটা দূরে নিয়ে গেল তাকে। কিছু নির্দেশ দিল কানে কানে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গির্জার দিকে চলল। একা।

পিটারবরো গির্জার কাছে পৌঁছে হার্পে টুং টাং আওয়াজ তুলল ও, তাই শুনে দরজায় এসে দাঁড়াল দামি পোশাক পরা এক বিশপ। 'ও তুমি !' বলল লোকটা। 'আমি আরও ভেবেছিলাম বিয়েবাড়ির লোকজন এসেছে বুঝি। তা তুমি কে ? এখানে কি চাই ?'

মাথার টুপি খুলে বিশপকে লম্বা অভিবাদন জানাল ও। বলল, 'আমি একজন ভবঘুরে হার্প-বাদক, ফাদার। লোকে বলে, এ অঞ্চলে আমার চেয়ে ভালো হার্প-বাদক নাকি আর নেই। শুনলাম, আজ আপনার ছেলেবেলার এক বন্ধুর বিয়ে পড়াতে যাচ্ছেন আপনি। তাই চলে এলাম, যদি এরকম খুশির দিনে বাজনা বাজিয়ে দু'চার পয়সা ...'

'তা মন্দ করোনি এসে,' খুশি হলো বিশপ। 'ভেতরে এসো। দেখি, কেমন বাজাতে পারো।'

'এখনই বাজানো কি ঠিক হবে, ফাদার ? শুনেছি, বর-কনে পৌঁছার আগে বাজনা বাজালে নাকি অমঙ্গল হয়। অবশ্য আপনি বললে ... কিন্তু আমাদের ওদিকে একটা কথা চালু আছে ...'

'থাক, থাক। অমঙ্গল হলে দরকার নেই। তবে তুমি তৈরি হয়ে নাও, ওদের পৌঁছতে বেশি দেরি নেই।'

কিছুক্ষণ পরই এসে হাজির হলো বুড়ো বর ও একদম অল্প বয়সী, অপরূপ সুন্দরী কনে। বিয়ের অনুষ্ঠান দেখার জন্য বেশ লোকজন জড়ো হয়েছিল গির্জায়, বর ও কনেকে দেখে বোকার মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তারা। অসমর্থনের গুঞ্জন উঠল সবার মধ্যে–কেউ মেনে নিতে পারছে না। বর লোকটা একেবারে বুড়ো। থুতনির চামড়া ঝুলে আছে, প্রতি পদক্ষেপে কাঁপে। অন্যদিকে কনেটি ফুটফুটে সুন্দর। বলতে গেলে একেবারে বাচ্চা মেয়ে। নিষ্পাপ তাজা গোলাপের মত লাগছে ওকে।

এলেনের দিকে লোভীর দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছে লোকটা। দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। তবে বিশপ আর ধনী নাইটের পোশাকের জাঁকজমক দেখে কেউ তেমন কোন জোরাল প্রতিবাদ জানাতে সাহস পেল না।

তাদের সবার বিস্ময় রবিনের মুখ দিয়ে ভাষা হয়ে বের হলো। 'আশ্চর্য !' বলল ও। 'জীবনে অনেক বিয়ে দেখেছি, বাপ্, কিন্তু বর-কনের এমন বেমানান জুটি তো আর কখনও দেখিনি !'

'চোপ্ !' ধমকে উঠল বিশপ। 'কথা বলবে না ! বর-কনে এসে গেছে, এখনই বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হবে।'

'তা হোক,' রবিন বলল। 'কিন্তু এই ঘাটের মড়ার সাথে ওই মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। বোঝা যাচ্ছে, বাধ্য করা না হলে এই বেমানান বিয়েতে রাজি হতেই পারে না মেয়েটা। কাজেই ওকে নিজের পছন্দমতো বর বেছে নেয়ার সুযোগ দিতে হবে।'

'আবার কথা বলে !' তেড়ে এল বিশপ। 'বখশিশ যদি চাও, বকবকানি থামিয়ে বাজনা বাজাতে শুরু করো।'

'বাজনা ?' জোরে হেসে উঠল রবিন। 'ঠিক বলেছেন, ফাদার। এখন তো বাজনা বাজানোরই সময়। তবে কি জানেন ? আমি আসলে হার্পের চেয়ে বিউগল ভালো বাজাতে পারি।' এই বলে পোশাকের নিচ থেকে শিঙাটা বের করে তিনটা ফুঁ দিল রবিনহুড। পরক্ষণে কোত্থেকে সবুজ পোশাক পরা চব্বিশজন তীরন্দাজ এসে হুড়মুড় করে গির্জায় ঢুকল। তাদের সবার আগে আছে অ্যালান-এ-ডেল।

মহা হই-হট্টগোল বেধে গেল ভেতরে। বিশপ রাগে লাল হয়ে উঠল। বুড়ো নাইটও রাগে কাঁপতে শুরু করেছে। কেননা অ্যালান-এ-ডেলকে দেখামাত্র কনে ছুটে গিয়ে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেদিকে এগোতে গিয়েও সামলে নিল সে। অ্যালানের সাথে যারা এসেছে, তাদের চেহারা-সুরত সুবিধের মনে হলো না তার। কিছু করতে সাহস হলো না। গির্জায় উপস্থিত সবাই এবার হার্প বাদকের দিকে ফিরল, যার শিঙার ধ্বনি এই পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।

এক হাত মাথার ওপরে তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল রবিন, মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল সমস্ত গুঞ্জন। পিনপতন নীরবতা নেমে এলো গির্জায়। সবাই রহস্যময় যুবকের বক্তব্য শুনতে চায়।

'অ্যালান-এ-ডেল,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'তুমি এলেনকে ভালোবাসো ?'

'মনপ্রাণ দিয়ে বাসি,' বলল হার্প-বাদক। 'চিরকাল বাসবো।'

'বেশ, এবার এলেনের বক্তব্য শোনা যাক। এলেন, তুমি অ্যালেন-এ-ডেলকে ভালোবাসো ?'

'বাসি !' ছোট্ট করে জবাব দিল মেয়েটি।

'তোমরা একে অন্যকে বিয়ে করতে রাজি আছো ?'

'আছি,' দু'জনে একসাথে বলল।

'বেশ।' এবার জনতার দিকে ফিরল রবিনহুড। 'এখানে আমি দু'টো কথা বলতে চাই। আমরা সবাই এইমাত্র জানতে পারলাম, এই দু'টি তরুণ-তরুণী পরস্পরকে ভালোবাসে। টাকার বিনিময়ে এই ধনী, বুড়ো নাইটের সাথে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া হচ্ছিলো ওকে। আমার মনে হয় টাকার জোরে নিষ্পাপ এক প্রেমকে এভাবে পায়ের তলায় পিষে মারার, দু'টি নিষ্পাপ জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার মত নিষ্ঠুরতা, অধর্ম আর হতে পারে না। তাই আমার প্রস্তাব, এখনই উপস্থিত সবার সামনে ওদের দু'জনের বিয়ে সম্পন্ন করা হোক।'

বিশপের দিকে ফিরল রবিনহুড। 'ফাদার। এবার কাজ শুরু করে দিন। আপনার ...'

'কে রে তুই !' রাগে হুঙ্কর ছেড়ে উঠল বিশপ। 'হার্প-বাদক হয়ে গির্জায় ঢুকে এখন রাজার মত হুকুম করছিস্ ?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন, বিশপ,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'আমিও এক ধরনের রাজা। আমার সাত কুড়ি দুর্ধর্ষ সহকর্মী আমাকে সেইরকম সম্মানই দিয়ে থাকে। আমার নাম রবিনহুড।'

রবিনহুড ! নামটা শুনেই চরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই। মানুষের মুখে মুখে ফেরে যে নাম, বিখ্যাত সেই দুঃসাহসী যুবকটিকে দু'চোখ ভরে দেখে নিতে লাগল। ওদিকে নামটা কানে যাওয়ামাত্র ভয়ে নর্ম্যান নাইটের কলজের পানি শুকিয়ে গেল, বিশপও কাঁপতে শুরু করল থর থর করে।

'কই, বিশপ,' আগের মতই শান্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'বিয়েটা পড়িয়ে দিন ওদের।'

'না !' জোর গলায় বলার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ততটা জোরাল শোনাল না। পা কাঁপছে, তবু চেহারায় একগুঁয়েমির ভাব ফুটিয়ে রেখেছে সে।

'না কেন, জানতে পারি ?'

'গির্জার আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার কাছ থেকে তিনবার জানতে হয় বিয়েতে কারও কোন আপত্তি আছে কি না,' বলল বিশপ। 'নইলে বিয়ে সিদ্ধ হয় না।'

'বেশ তো। তাই করুন।'

'শুধু তাই না। আরও আছে। পবিত্র গির্জায় ঢুকে যা খুশি করার অধিকার নেই তোমার। যা খুশি তাই ...'

'আপনিই বা পবিত্র গির্জার মধ্যে ইচ্ছেমত অধর্ম করে বেড়ানোর অধিকার কোথায় পেলেন ?' রেগে উঠল রবিন। 'শুনুন, আমার গায়ে অনেক শক্তি আছে, কিন্তু আপনার মত দুর্বলের ওপর আমি সে শক্তি প্রয়োগ করতে চাই না। আপনি অত্যন্ত ছোট মনের মানুষ। তবু লোকে আপনাকে মান্য করে শুধু পরনের ওই আলখাল্লার জন্যে। আপনি বিয়ে পড়াতে রাজি না হলে এখনই ওটা খুলে নেয়া হবে আপনার গা থেকে। আমার লোক ওটা পরে কাজটা করবে।'

বিশপ দ্বিধায় পড়ে গেছে দেখে মৃদু হাসল রবিন। বুঝতে পেরেছে, আরেকটু ভয় দেখালেই কাজ হয়ে যাবে। চোখের ইশারায় কিছু একটা নির্দেশ দিল ও, সাথে সাথে দুই অনুচর এসে এক মাইনর যাজকের গা থেকে আলখাল্লা খুলে নিল। রবিন উঁচু গলায় ডাকল, 'লিটল জন, এখানে এসো। এটা গায়ে দিয়ে এদের বিয়ে পড়াও।'

এ-কান ও-কান হেসে আলখাল্লাটা গায়ে দিল লিটল জন, অমনি হাসতে শুরু করল উপস্থিত সবাই। কারণ পোশাকটায় ওকে এত বিদঘুটে দেখাচ্ছে যে আপনা থেকেই হাসি এসে যাচ্ছে সবার। কিন্তু লিটল জন গম্ভীর। এ বিয়েতে কারও অমত আছে কি না জানতে চাইল সে। তিনবার 'হ্যাঁ' যথেষ্ট না-ও হতে পারে ভেবে সবাইকে সাতবার 'হ্যাঁ' করিয়ে তবে থামল।

এরপর বিশপের দিকে ফিরল রবিন। 'বিয়েটা ভালোমানুষের মতো পড়াবেন, না আমাদের সাথে শেরউডে যাবেন, কোনটা ?'

শেরউডে যাওয়ার কথা শুনে জান উড়ে গেল বিশপের, এক কথায় বিয়ে পড়াতে রাজি হয়ে গেল। অতএব লিটল জন আলখাল্লা খুলে দিতে সেটা গায়ে চড়িয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করে দিল সে। কনে সম্প্রদান কে করবে প্রশ্ন উঠতে রবিনহুড সামনে এগিয়ে এলো।

'আমি সম্প্রদান করবো। এলেনকে আমি অ্যালান-এ-ডেলের হাতে তুলে দেবো। কামনা করি তোমরা সুখী হও। কেউ যদি তোমাদের সুখের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে চায়, কেউ কোন গণ্ডগোল পাকাতে চায়, তাহলে আগে আমার সাথে বোঝাপড়া করতে হবে তাকে।'

শেষ হয়ে গেল বিয়ের অনুষ্ঠান। রবিনের কাছে এসে ওর একটা হাত তুলে নিয়ে আলতো করে চুমু খেল অ্যালান-এ-ডেল। কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'ধন্যবাদ।'

যেমন ঝড়ের গতিতে গির্জায় ঢুকেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল তীরন্দাজ বাহিনী। তাদের সাথে নব-দম্পতিও শেরউডের দিকে পা বাড়াল।

ফ্রায়ার টাক

অ্যালান-এ-ডেলের বিয়ের কিছুদিন পর এক সকালে ঘুম ভাঙতেই রবিনহুডের মনটা আনন্দে নেচে উঠল। খুব সুন্দর একটা দিন। সবাইকে ডেকে ঘোষণা করে দিল ও, 'আজ কারও কোন কাজ নেই। সবার ছুটি আজ।'

রোদে ঝলমল করছে প্রকৃতি। পরিষ্কার নীল আকাশে মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও। শেরউড অনেক বেশি সবুজ লাগছে আজ। অল্প অল্প বাতাসে বিশাল সমস্ত ওক গাছের শাখা-প্রশাখা মাথা দোলাচ্ছে। পায়ের নিচে সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর আলোছায়ার মায়াবী খেলা চলছে। তাই দেখে মন আনন্দে নেচে উঠল সবার। খেলাধুলায় মেতে উঠল প্রত্যেকে।

কেউ ছুটছে, কেউ লাফ-ঝাঁপ করছে, কেউ কুস্তিখেলায় মেতে উঠেছে। কেউ লাঠি খেলছে, কেউ নাচছে, আবার কেউ বা গান গাইছে। মোট কথা ছুটি পেয়ে যার যা খুশি তাই করতে লেগেছে সবাই। কয়েকজন মিলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে হরিণ শিকার করতে গেল তীর-ধনুক নিয়ে। রবিনও এরকম একটা দলের সাথে বেরিয়ে পড়ল।

জন, মাচ, উইল স্কারলেট এবং মেরিয়ান আছে সে দলে। মাচ ছোট হলেও এরমধ্যেই যথেষ্ট পরিণত হয়ে উঠেছে। তীর ছুড়তে পারে ভাল। কিছুদূর যেতে দেড়-দু'শো গজ সামনে একদল হরিণ চরে বেড়াতে দেখল ওরা। ইচ্ছে করলে দলটার আরও কাছে যাওয়া যেত, কিন্তু রবিন আর না এগিয়ে সেখান থেকেই চ্যালেঞ্জ করল সবাইকে।

'সবাই এসো,' দাঁড়িয়ে পড়ল ও। 'এতদূর থেকে এক তীরে কে হরিণ মারতে পারে দেখা যাক।'

সবাই একযোগে তীর ছুড়ল। উইল স্কারলেটের তীরে ঘায়েল হলো একটা বাচ্চা হরিণ, মাচের তীরে মারা পড়ল একটা বড় হরিণী। তবে লিটল জন প্রায় দু'শো গজ দূরের একটা শিংওয়ালা মর্দা হরিণ শিকার করে তাক লাগিয়ে দিল।

'বাহ্, দারুণ !' লোকটার প্রশংসা করল রবিন। 'তোমার তুলনা হয় না।'

উইল স্কারলেট হেসে উঠল। 'লিটল জনের সমকক্ষ আরও একজন তীরন্দাজ কিন্তু আমাদের খুব কাছেই আছে।'

'আমাদের কাছেই আছে ?' বিস্মিত হলো ও। 'বলো কি ! কোথায় থাকে সে ? পরিচয় কি ?'

'যে অ্যাবিতে আমাদের বিয়ে হতে হতেও হলো না, সেই অ্যাবির এক ফ্রায়ার সে,' মেরিয়ান বলল। 'তার নাম মাইকেল টাক। শূটিংয়ে লিটল জনকে তো পারবেই, বলা যায় না হয়তো তোমাকেও হারিয়ে দেবে।'

'ফ্রায়ার !' ভুরু কুঁচকে মেরিয়ানের দিকে তাকাল রবিন। 'আন্দাজে বলছো, না ঠিকমত জেনে বলছো !'

'জেনেই বলছি। ইচ্ছে করলে তুমিও জেনে নিতে পারবে। মানুষটা আজব ধরনের।'

'তোমাদের পরিচয় আছে মনে হচ্ছে ?'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মেরিয়ান। 'কিন্তু অনেকদিন দেখি না লোকটাকে।'

চিন্তিত মনে মাথা দোলাল উইল। 'সে মনে হয় জানে তুমি দুর্গ ছেড়ে জঙ্গলে চলে এসেছ। যেদিন স্যার গাই আর শেরিফ তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে গ্যাওয়েল হলে গিয়েছিল, সেদিন লোকটা তাদের বাধা দিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল মেরিয়ান। 'হঠাৎ কোত্থেকে বিরাট এক লাঠি নিয়ে হাজির হলো লোকটা। সেদিন বলতে গেলে তার বাধার মুখেই পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল শেরিফ আর স্যার গাই। তারপর লোকটা আমার সাথে একটা কথাও না বলে আবার উধাও হয়ে গেল। বাবা তাকে আমাদের দুর্গে থাকতে দেয়নি বলে রাগ করে এখন কম্প্যানহার্স্টের কোন এক হারমিট'স সেলে থাকে। নদীটা যেখানে অগভীর, সেখান দিয়ে লোকজন নদী পার হয়।'

সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিল রবিন, এই লোককেই তার চাই। যে করে হোক এই লোককে দলে আনতেই হবে। কিছুদিন থেকে মনে মনে একটা কিছুর অভাব অনুভব করছিল ও, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল না সেটা কিসের। আজ হঠাৎ করেই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে–অভাবটা আসলে একজন ধর্মযাজকের। ওদের ডেরায় প্রার্থনার কোন ব্যবস্থা নেই। ধরা পড়ার ভয়ে শহরের গির্জাতেও যেতে পারে না ওরা। এভাবে চলতে থাকলে ধীরে ধীরে অধর্ম ঢুকে পড়বে তাদের মধ্যে।

নিজেদের মধ্যে একজন ধর্মযাজক থাকলে সেদিন অ্যালান-এ-ডেল ও এলেনের বিয়ে দিতে এত ঝামেলা পোহাতে হত না। একজন যাজক ওদের খুবই দরকার। তারওপর সে যদি উইল স্কারলেটের কথামত ওস্তাদ তীরন্দাজ আর মেরিয়ানের কথামত লাঠি খেলায় ওস্তাদ হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ঠিক করে ফেলল রবিনহুড, যেভাবে হোক ফ্রায়ার টাককে দলে ভেড়াতেই হবে।

লোকটার খোঁজে যাবে ঠিক করল ও। দেরি না করে আজই খুঁজে বের করবে তাকে। অ্যালান-এ-ডেলের সাধারণ চারণ গায়কের পোশাক পরে নিল রবিন, তারপর তার হার্পটা নিয়ে তখনই কম্প্যানহার্স্টের দিকে যাত্রা করল। বুনো পথ ধরে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল। মাঝে মাঝে এক-আধটা ছোট ঝরনা পড়ছে পথে, কখনও দেখা হয়ে যাচ্ছে একদল হরিণের সাথে–মানুষের সাড়া পেয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

কখনও ঘন হয়ে আসছে বন, কখনও হালকা হয়ে আসছে। তার মধ্যে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে দলটা। কখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, খেয়ালই নেই সেদিকে। বিকেলের দিকে একটা শান্ত রূপালি নদীর ধারে এসে পৌঁছলো ও। দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে বড় বড় মালবাহী নৌকা এই নদী দিয়ে ঘোড়ার সাহায্যে গুণ-টেনে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের বাজারে। সেসব ঘোড়ার পায়ে পায়ে নদীর তীর ঘেঁষে সরু একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। তবে এ মুহূর্তে কেউ নেই সেখানে। একদম নীরব, নির্জন গোটা এলাকা।

দু'চোখ ভরে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হাঁটছে রবিন। মৃদু বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে নদীতে। ফড়িংগুলো কিছু সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে বাতাসে ভাসছে, তারপরই মত পাল্টে ছুটে যাচ্ছে যেদিকে খুশি। ওঁৎ পেতে থাকা মাছরাঙা পাখি তীরবেগে উড়ে গিয়ে ঝুপ্ করে পানিতে পড়ছে, একটু পর তলোয়ারের মত বাঁকা ঠোঁটে ছোট মাছ আঁকড়ে ধরে ফিরে গিয়ে আবার গাছের ডালে বসছে।

নদীটা যেখানে অগভীর, কম্প্যানহার্স্টের সেই জায়গায় এসে সামনে তাকাল রবিনহুড। নদীটা এখানে কেবল অগভীরই নয়, পাশেও অনেক কম। দেড় থেকে দু'শো ফুট চওড়া বড়জোর। হারমিট'স সেলটা ওপারে। গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প চেখে পড়ে। ওপারে একটা নৌকা বাঁধা আছে। কিন্তু মাঝির খবর নেই।

মুখের সামনে দুই হাত জড়ে করে হাঁক ছাড়ল রবিন, 'ও ভাই, মাঝি ! কোথায় গেলে ? আমাকে পার করে দাও ভাই !' বলে হার্পটা কাঁধে ঠেকিয়ে তারে মৃদু টোকা দিতে লাগল। মাঝির সাড়া না পেয়ে খানিক বিরতি দিয়ে আবার ডাকল রবিন। এবারও তথৈবচ।

দাঁড়িয়ে থাকল ও। কান খাড়া হয়ে গেল মানুষের গলা শুনে। কারা যেন কথা বলছে। কি কথা হচ্ছে শোনার জন্য কান পাতল ও। কাছেই কোথাও রসালো বিষয় নিয়ে আলাপ করছে দু'জন। কিন্তু তাদের গলার স্বর অবিকল এক বলে অবাক হয়ে গেল ও। নদীর এপারেরই ছোট ছোট ঝোপের আড়াল থেকে আসছে কথাগুলো। আশ্চর্য ! ভাবল ও। ব্যাপারটা একটু দেখতে হয় তো !

পা টিপে টিপে প্রায় খাড়া পাড়ের কাছে চলে এলো রবিন, একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে নিচে উঁকি দিল। প্রথমেই নদীর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড

এক ওয়াটার-উইলোর ওপর চোখ পড়ল। সেটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে ইয়া মোটা এক লোক। কিন্তু তার সাথে আর কাউকে দেখা গেল না।

লোকটাকে ভাল করে দেখল রবিন। যেমন দেহের গঠন, তেমনি তার মাথাটাও প্রকাণ্ড এবং একদম ফুটবলের মত গোল। মুখটা প্রায় লাল। মাথার সামনে ও পেছনে কালো রঙের কোঁকড়া চুল লোকটার, গাল ভর্তি কালো, কোঁকড়া দাড়ি, অথচ মাথার তালু পুরো ফরসা। একেবারে কিছুই নেই ওখানে। ছোটখাটো গাছের গুঁড়ির মত ঘাড়ের ওপর ষাঁড়ের মতো মোটা গর্দান।

পরনের ঢোলা পোশাক, পাশে খুলে রাখা টুপি, জপমালা আর মাথার টাক ইত্যাদি দেখে লোকটার পেশা অনুমান করা যায়। নইলে স্রেফ ডাকাত ছাড়া আর কিছু ভাববে না কেউ। ঘন কালো ভুরুর নিচে ছোট ছোট চঞ্চল একজোড়া চোখ। দেখলে মনে হবে প্রতি মুহূর্তে কি যেন এক মজার বুদ্ধি ঝিলিক মারছে তার মাথায়। লোহার হেলমেট খুলে একপাশে রেখে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসেছে সে।

তার হাঁটুর ওপর রাখা বড় এক পাত্রে রান্না মাংস, ডান হাতে একটা পাউরুটি। পাত্র থেকে বাঁ হাতে বড় বড় মাংসের টুকরো তুলে টপাটপ্ মুখে পুরছে লোকটা, মাঝেমধ্যে রুটিতে কামড় বসাচ্ছে। একটু পরপর আবার বড় এক বোতল থেকে মদও ঢালছে গলায়। সর্বনাশ ! ভাবল রবিন, এ যে আস্ত রাক্ষস ! কেমন হাভাতের মত খাচ্ছে দেখো ! মনে হয় লোকটা নিজেই নিজের সাথে কথা বলছিলো এতোক্ষণ। সাথে কেউ নেই। একে জিজ্ঞেস করলে বোধহয় ফ্রায়ার টাকের খবর জানা যাবে।

নীরবে লোকটাকে লক্ষ করতে লাগল রবিন। তার কোনদিকে খেয়াল নেই, গপাগপ্ খেয়েই চলেছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মুখ নাড়া থামিয়ে সামনে তাকাল লোকটা। বলল, 'আরে, তুমি যে মোটেই খাচ্ছো না ! এমন করলে কি শরীর টিকবে ? ক'দিন বাঁচা যাবে এভাবে ? দাও, এবার রুটিটা আমাকে দাও দেখি ! তুমি কয়েক টুকরো মাংস মুখে দাও, কেমন ?' বলে রুটিটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল সে। তারপর ডান হাতটা মাংসের পাত্রে ভরে দিয়ে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, বন্ধু। একা একা দু'জনের রুটি আর খেতে পারছিলাম না। এবার একটু মাংস খেয়ে স্বাদ পাল্টাই।'

অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রবিনহুড, তারপর হেসে ফেলল ব্যাপার টের পেয়ে। বেশি বেশি খাওয়া ভাল না, তাই নিজেই নিজেকে দু' ভাগ করে নিয়েছে ফাদার। একজনের খাবারই সাধাসাধি করে একে অন্যকে খাওয়াচ্ছে। খাওয়া শেষ হতে লতাপাতায় হাত মুছে মদের বোতল নিয়ে বসল যাজক।

'দেখো,' আবার বলতে শুরু করল সে। 'তুমি দেখতে যেমন সুন্দর, তোমার মনটাও তেমনি। আমি তোমাকে যতো বেশি ভালোবাসি, তুমি বিশ্বাস করো আর না-ই করো, দুনিয়ার কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ততো বেশি ভালোবাসে না।

'এসব বলে কেন লজ্জা দিচ্ছো ? তবে কেউ যখন ধারেকাছে নেই, তখন আমার মনের কথাটাও তোমাকে জানিয়ে রাখছি। আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তুমি আমাকে যতোটা বাসো, ঠিক ততোটা।

'বেশ বেশ। এই কথার ওপরে তাহলে দু'ঢোক হয়ে যাক, কি বলো ? না, না ! কোন আপত্তি শুনতে চাই না। নাও, ধরো। আগে তুমি।' বোতলটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল সে।

'ঠি-ই-ক আছে, দাও ! তুমি যখন ছাড়বেই না, কি আর করা ! তোমার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘ আয়ু কামনা করি।' বড় বড় দু'ঢোকে বোতলের অর্ধেক পানীয় শেষ করে ফেলল মোটা লোকটা। 'এবার তুমি নাও।' আরেকবার হাত বদল হলো বোতল।

'আমিও তোমার সুস্বাস্থ্য আর দীর্ঘ আয়ু কামনা করি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।' বোতলের অবশিষ্ট মদ দুই চুমুকে শেষ করে বোতলটা পাশে রেখে দিল যাজক।

এদিকে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাওয়ার অবস্থা হলো রবিন হুডের। এক হাতে মুখ চেপে ধরে রেখেছে যাতে কোন শব্দ না বেরিয়ে যায়, সতর্ক হয়ে ওঠে লোকটা। কিন্তু নীরব হাসি কিছুতেই ঠেকাতে পারছে না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীর কাঁপছে ওর।

খানিক বিরতি দিয়ে আবার শুরু করল সে। 'খাওয়া-দাওয়া তো যা হোক ভালোই হলো। এবার একটা গান শুনতে পারলে মনটা খুব খুশি হতো। ধরো, ভাই। একটা গান ধরো।

'গান ? আরে না, গান জানি না আমি। তাছাড়া গলাটাও আজ সুবিধের লাগছে না। দেখছো না, কেমন কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হচ্ছে ?

'কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বেরুচ্ছে কে বললো ? আমার কানে তো ফিঞ্চ পাখির মিষ্টি গলার মতো লাগছে তোমার কণ্ঠ। ধরো, ধরো ! একটা গান শোনাও আজ। তোমার ওই গলার গান শুনতে পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিন কাটিয়ে দিতে পারবো আমি। প্লিজ, ধরো একটা গান !

'তোমার নিজের এতো সুন্দর গানের গলা, তোমার সামনে গান গাইতে রীতিমতো লজ্জা করছে আমার। বেশ, এতো করে যখন বলছো, শোনাচ্ছি। কিন্তু সবচে' ভালো হতো দু'জনে একসাথে গাইলে।

'ঠিক আছে। তাহলে তুমি পুরুষের অংশটুকু গাও, আমি মেয়েদের অংশ গাইছি।'

'ঠিক আছে। সেই ভালো।' প্রথমে মোটা, পুরুষালী কণ্ঠে এক লাইন গাইলো আজব কিসিমের লোকটা, তারপর যথাসম্ভব চিকন কণ্ঠে গাইলো পরের লাইন।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না রবিনহুড। গলা ছেড়ে হা হা করে হেসে উঠল ও, খাড়া পাড় বেয়ে নিচে নেমে এলো। কিন্তু কোনদিকে খেয়াল নেই লোকটার। তখনও দু'চোখ বুজে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে–অর্থাৎ গান গাইছে। পুরো গান শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখ খুলল না সে। গান শেষে চোখ মেলেই ওকে সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে দেখে ঘন ভুরু কুঁচকে উঠল তার। দ্রুত হাতে শিরস্ত্রাণটা পরে নিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'এতো হাসির কি দেখলে?'

'এমনিই হাসি আসছে,' ও বলল।

'এমনি মানে? এমনি এমনি হাসে তো বোকা আর পাগল। তুমি এর কোনটা?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো, আশেপাশের এলাকা আপনার ঠিকমত চেনা আছে?'

'তা মোটামুটি আছে। কেন?'

'আমি ফাউন্টেইনস অ্যাবির ফ্রায়ার মাইকেল টাককে খুঁজছি। তার সাথে পরিচয় আছে আপনার?'

একটু ভাবল লোকটা। 'তা মোটামুটি আছে। কেন?'

'তাকে কোথায় পাবো, বলতে পারেন? নদীর এপারে, না ওপারে?'

'শোনো, বাছা, তোমার বোধহয় জানা নেই যে "ওপার" ছাড়া নদীর আর কোন পার হয় না!'

'তাই নাকি?' রবিনহুড বলল। 'প্রমাণ করতে পারবেন?'

হাসল লোকটা। 'পানির মতো।' নদীর অপর পার দেখিয়ে বলল, 'ওইদিকটা ওপার তো?'

'অবশ্যই!'

'অথচ ওদিকটা হলো নদী এক পার। ঠিক না?'

'ঠিক।'

'তাহলে ওটা যদি এক পার হয়, এটা স্বভাবতই আরেক পার। কিন্তু তুমি আগেই মেনে নিয়েছ যে ওদিকটাই ওপার। কাজেই নদীর দুই পারই ওপার। এটাই আসল কথা।'

'দারুণ যুক্তি! কিন্তু আপনার এই অকাট্য যুক্তি আমার কোন কাজে আসছে না। আমি যে তিমিরে ছিলাম, এখনও সেই তিমিরেই আছি। আচ্ছা, প্রশ্নটা আমি অন্যভাবে করছি। এখন আমরা যে পারে দাঁড়িয়ে আছি, ফ্রায়ার টাককে কি সে পারে পাওয়া যাবে? না যে পারে আমরা নেই, সেই পারে পাওয়া যাবে?'

'এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো একটা প্রশ্ন করেছ। এবার আর গালচালাকি করে জবাব এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এ মুহূর্তে তাকে কোন পারে পাওয়া যাবে বলতে পারি না, তবে তার হারমিটেজে যেতে চাইলে তোমাকে নদীটা পার হতে হবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু ... '

'কিন্তু নৌকাটা ওপারে ! ফ্রায়ারেরও দেখা নেই, তাহলে নদী পার হবে কি করে, এই তো ?'

'হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম।'

'কিছু করার নেই,' প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়ল সে। 'নৌকাটা ওপারে ফুটো হয়ে পড়ে আছে,' থুতনি তাক করে ওটা দেখাল। 'মেরামত না করানো পর্যন্ত যাত্রী পারপার বন্ধ। তেমন প্রয়োজন হলে হেঁটে পার হতে হবে।'

কি ভেবে হাসতে লাগল রবিনহুড। তাই দেখে চোখ কোঁচকাল মোটা লোকটা। 'আবার অকারণে হাসছ ?'

'অকারণে না। এবার হাসছি আপনার দুরবস্থার কথা ভেবে,' রবিন বলল। 'খাওয়া-দাওয়ার পর নদী পার হতে কি ভালো লাগবে আপনার ?'

'বুঝলাম না, আমাকে নদী পার হতে হবে কেন ?'

'দেখতেই পাচ্ছেন,' মৃদু হাসল রবিনহুড, 'আমি কি সুন্দর জামা-কাপড় পরে আছি। এসব ভিজিয়ে নদী পার হওয়া কি উচিত হবে ? তাই ঠিক করলাম, আপনার কাঁধে চড়ে নদী পাড়ি দেবো।'

রেগে উঠল লোকটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল। 'কি, এতবড় সাহস ! এতবড় আস্পর্ধা ! আমাকে কিনা ... নিজেকে কি মনে করো তুমি ? দাঁড়াও, তোমাকে আমি ... তোমাকে ... '

একটানে খাপ থেকে তলোয়ারটা বের করে ফেলল রবিন। তাই দেখে মুহূর্তে বাকহারা হয়ে গেল সে। রবিনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল, তারপর নিজের অসহায়ত্ব বোঝাতে এমন মুখভঙ্গি করল যে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে।

'ঠিক আছে,' নিচু হয়ে বসল লোকটা। 'কি আর করা ! এসো।'

রবিন খোলা তলোয়ার হাতে হাসতে হাসতে তার বিশাল কাঁধে চড়ে বসল। লোকটাকে বোকা বানানো গেছে ভেবে ভারি মজা পাচ্ছে। যদি জানত সে ওকে নিয়ে কি মতলব এঁটেছে, তাহলে হাসা ভুলে বরং শঙ্কিত হয়ে উঠত।

নদীর পানি এখানটায় কোমর সমান বলে নদী পার হতে কোন সমস্যা হলো না। কিন্তু এখানে-সেখানে পিচ্ছিল পাথর থাকায় মোটা মানুষটাকে সময় নিয়ে, খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে হলো। ওপারে পৌঁছে লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে পড়ল রবিনহুড। লোকটাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য ঘুরতে যাবে, এমন সময় পিছন থেকে লোহার সাঁড়াশির মত একটা হাত চেপে ধরল ওকে। পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণধার একটা ছোরা গলায় চেপে বসল।

'আরে, আরে !' আঁতকে উঠল রবিনহুড। 'এ কি হচ্ছে ? আপনি জানেন না, রাজা রিচার্ডের রাজত্বে রক্ত ঝরানো নিষেধ আছে ?'

'যদি রক্ত ঝরে,' শান্ত গলায় বলল লোকটা, 'দায়ী হবে তুমি, বাছা। আমার কথামতো চললে এক ফোঁটা রক্তও ঝরবে না। কিন্তু কথা না শুনলে গলা তিন আঙুল ফাঁক করে দেবো।'

'কি করতে হবে আমাকে ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'আমার সব জিনিসপত্র ওপারে রয়ে গেছে,' লোকটা বলল। 'তোমাকে নিয়ে নদী পাড়ি দিতে গিয়ে ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। এখন তোমার সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে ওপারে যাওয়া সম্ভব না।'

ওরকম ভারি একটা দেহ কাঁধে নিয়ে নদী পাড়ি দেয়ার কথা ভাবতেই গলা শুকিয়ে উঠল রবিনের। কিন্তু কাজটা না করে যে উপায় নেই, তা-ও ঠিকই বুঝল। তীক্ষ্ণধার ছোরাটা ওর গলায় ঠেসে ধরে আছে ব্যাটা। এ অবস্থায় জোরাজুরি করার যেমন কোন উপায় নেই, করে লাভও নেই। কারণ লোকটার গায়ে ষাঁড়ের মত শক্তি।

বাধ্য হয়ে অসম্ভব ভারী দেহটা কাঁধে তুলে নিল রবিনহুড। কোমরের হাড়গোড় এত ওজন সইতে না পেরে মড়মড় শব্দে প্রতিবাদ জানাল, শরীর বাঁকা হয়ে যেতে চাইছে। তার ওপর নদীর কোথায় খানা-খন্দ, কোথায় পিছলা পাথর

জানা নেই বলে টলোমলো পায়ে এগোতে হলো ওকে। কয়েকবারই আছাড় খেতে খেতে অনেক কষ্টে সামলে নিল। কিছুদূর যেতেই দরদর ঘাম শুরু হয়ে গেল ওর, দম নিচ্ছে হাঁ করে। মনে হলো, লোকটার ওজন প্রতি মুহূর্তে কয়েক পাউন্ড করে বাড়ছে বুঝি।

ওদিকে মোটা মহাশয় মহানন্দে বসে আছে ওর কাঁধে। এক হাতে ওর চুল মুঠো করে ধরে আছে, পায়ের গোড়ালি দিয়ে পেটে খোঁচা মারছে আর শিশুর মত হাসছে হি হি করে। 'হ্যাট, হ্যাট !'

কঠিন পরিশ্রমে চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে রবিনহুডের, দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসার জোগাড়, তারপরও আর সব কষ্টের মত ওর কষ্টেরও শেষ হলো এক সময়। তীরে পৌঁছে গেল ও, সাথে সাথে কাঁধ থেকে লাফিয়ে নেমে গেল মোটকা। খুশি মনে খাড়া তীর বেয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার পা ধরে হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে আনল রবিন।

ধুম করে আছড়ে পড়ল মোটা মিয়া। এতই জোরে পড়ল যে মাথার শিরস্ত্রাণ খুলে ছিট্‌কে গিয়ে ছয় হাত দূরে পড়ল। তাকে সামলে দেয়ার সময় দিল না রবিন, একটানে তলোয়ার বের করে তার গলায় চেপে ধরল।

'এইবার ?' কপালের ঘাম মুছে বলল। 'আমাকে ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসবে, নাকি এক কোপে দু'ভাগ করে দেবো তোমার টাক ?'

ওর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে মনে ভয় পেয়ে গেল লোকটা। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'দেবো, দেবো !'

অতএব আবার ওকে কাঁধে নিয়ে পানিতে নামল লোকটা। কষ্টেসৃষ্টে নদীর মাঝখানে পৌঁছে থামল। রবিন ভাবল, হয়তো কোন পিছলা পাথরকে পাশ কাটাবার জন্য থেমেছে। মৃদু হাসল ও। কিন্তু পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল ওর হাসি। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিয়ে ওকে কাঁধ থেকে ছুড়ে ফেলে দিল লোকটা, ঝপাৎ করে মাঝ নদীতে পড়ে নাকানি-চুবানি খেতে লাগল রবিনহুড। কিন্তু সেদিকে একবারও না তাকিয়ে নিজের পারে ফিরে গেল লোকটা।

কোনমতে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন, তাকিয়ে দেখল তীর থেকে ওর দুর্দশা দেখে হেসে অস্থির হচ্ছে ব্যাটা। রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল রবিনের, চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি ! আজ তোমার একদিন কি আমারই একদিন !' তলোয়ার বের করে পানি কেটে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তীরের দিকে এগোতে লাগল ও।

কিন্তু মানুষটা তাতে একটুও ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না, বরং ধীরেসুস্থে নিজের ঢোলা পোশাকের ভেতর থেকে একটা প্রকাণ্ড তলোয়ার ও একটা ছোট ঢাল বের করল সে। রবিনকে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো। রবিন তীরে পৌঁছতেই শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। দুই তলোয়ারের অনবরত

ঠোকাঠুকির ঝনঝন শব্দে গরম হয়ে উঠল এলাকা, প্রাণপণে লড়ে যেতে লাগল দু'জনে, কিন্তু কেউ কারও ওপর সামান্যতম প্রভাব বিস্তার করতে পারল না।

প্রভাব বিস্তার তো দূরের কথা, একজন অন্যজনকে স্পর্শই করতে পারল না। এভাবে টানা এক ঘণ্টা লড়াইয়ের পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল দু'জনেই, যার যার তলোয়ারের ওপর ভর দিয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল।

দম ফিরে পেতে রবিনহুড বলল, 'একটা ব্যাপারে আমার একটা সন্দেহ জাগছে।'

'কোন ব্যাপারে, বাছা ?'

'আপনিই কি টাক ? মানে, ফাউন্টেইনস অ্যাবির সেই ফ্রায়ার, আমি যাঁর খোঁজে এসেছি ? সত্যি বলছি, আপনার মত এমন যুদ্ধবাজ জীবনে আর দেখিনি আমি।'

প্রকাণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠল লোকটা। 'যুদ্ধের দেখেছটা কি, বাছা ! সাথে তীর-ধনুক থাকলে তোমার পিলে চমকে দিতাম আমি।'

'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।'

'কেন দেবো, তোমাকে আমি চিনি যে নিজের পরিচয় দেবো ? তুমি কে ? নিজের পরিচয় আগে জানাও।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে আমার শিঙাটা একটু বাজাতে চাই।'

'বাজাও, বাজাও ! যতো খুশি বাজাও। কে নিষেধ করতে গেছে ?'

রবিনের শিঙা শুনে কিছুক্ষণের মধ্যে লিঙ্কন গ্রিন পরা কয়েকজন এসে হাজির হলো সেখানে। তাদের ভয়ঙ্কর চেহারা-সুরত দেখে মনে হলো একটু যেন ঘাবড়ে গেল লোকটা। ছোট ছোট চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'কি আশ্চর্য ! মাটি ফুঁড়ে বের হলো নাকি এরা ? কারা এরা ? তুমিই বা কে ?'

'এরা আমার অনুচর,' বলল ও। 'আমি রবিনহুড।'

'আচ্ছা !' অবাক চোখে ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল ফ্রায়ার। 'তুমিই তাহলে সেই ... !'

'এবার তাহলে আপনার পরিচয়টা ... '

'বলছি। কিন্তু তার আগে আমার বাঁশিটা একটু বাজাতে চাই।'

'একটু কেন ? যত খুশি বাজান না, কে নিষেধ করতে গেছে ?'

গলায় ঝোলানো একটা বাঁশি মুখে তুলে ফুঁ দিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে বন-বাদাড় ভেঙে, প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে চারটা ভয়ঙ্কর চেহারার হাউন্ড ছুটে এলো। লোকটার দু'পাশে সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল অতন্দ্র-প্রহরীর মত। চোখ গরম করে রবিন ও তার সঙ্গীদেরকে দিকে তাকাচ্ছে। হ্য হ্য করে হাঁপাচ্ছে গোলাপি রঙের লম্বা জিভ বের করে।

'এরা আমার অনুচর,' যাজক বলল। 'আর আমিই টাক।'

'আপনি ... !' কথা শেষ করতে পারল না রবিন।

'হ্যাঁ, আমি। কেন ?'

'আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন, ফাদার,' কোন রকম ভূমিকা না করে বলল রবিন। 'কারণ প্রার্থনা করতে শহরের গির্জায় যেতে পারি না আমরা। শেরউডেও কোন উপাসনার কোন ব্যবস্থা নেই। তাই যাতে আমরা পুরোপুরি অধার্মিক না হয়ে যাই, সে জন্যে একজন যাজকের খুব প্রয়োজন। কিন্তু যাকে-তাকে শেরউডে নিয়ে যেতে পারি না আমরা। আপনি যদি যেতে রাজি হন, আপনাকে আমরা মাথায় তুলে রাখব, ফাদার।'

রবিনহুডের দলে যোগ দিল বিখ্যাত ফ্রায়ার মাইকেল টাক। অনেক গাঁথা রচিত হয়েছে তাকে নিয়ে। তার মত জ্ঞানী, ওস্তাদ যোদ্ধা আর মহৎপ্রাণ ফ্রায়ার সে যুগে দ্বিতীয়জন ছিল কি না সন্দেহ।

সবাই খুশি তাকে পেয়ে।

নটিংহ্যামের শূটিং প্রতিযোগিতা

রেগে আগুন হয়ে আছে নটিংহ্যামের শেরিফ। যুবরাজ জনের নির্দেশে রবিনহুডকে ধরে আনার জন্য শেরউডে সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়েছিল সে, পরপর কয়েকবার। কিন্তু ধরে আনা তো দূরের কথা, উল্টে চরম নাকাল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে তাদেরকে। প্রথমবার রবিন তার দল নিয়ে ইয়র্কশায়ারের জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা ওই একবারই।

তারপর দিনে দিনে দলটা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে শেরিফের বাহিনীকে তাদের আস্তানার ধারেকাছেও ভিড়তে দেয়নি। অদ্ভুত সব কৌশল খাটিয়ে তাদেরকে ঠেকিয়ে দিয়েছে।

নগদ পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে রবিনকে হত্যার জন্য শেরউডে গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছে শেরিফ--হয় ওকে ধরে আনবে, নয়তো মেরে রেখে আসবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই হাওয়া হয়ে গেছে। এই ধরনের একের পর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টার কারণে সাধারণ মানুষের সম্মানই কেবল হারায়নি শেরিফ, সবার কাছে নিজেকে খেলো করে তুলেছে।

লোকে আজকাল তাকে নিয়ে হাসাহাসি, কানাকানি শুরু করে দিয়েছে। সবার টিটকারির পাত্র হয়ে উঠেছে শেরিফ। এসব কারণে রাগে গা জ্বলছে তার। হাসি-মশকরার পাত্র হতে কারই বা ভাল লাগে ? ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠতে যুবরাজের কাছে নালিশ জানাতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো। উল্টে তাকেই দাবড়ি লাগালেন যবুরাজ জন।

বকাঝকা খেয়ে বিষণ্ন মনে নিজ কাউন্টির দিকে ফিরে চলল শেরিফ। ভাল ফ্যাসাদেই পড়েছে নালিশ জানাতে গিয়ে, এখন তার নিজেরই চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। ফেরার সময় মুখ তুলল না সে। কারও সাথে কথাও বলল না। মাথা নিচু করে কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল। বেশ কিছুদূর আসার পর হঠাৎ মুখ তুলল সে--মৃদু হাসছে, মনে হলো কি যেন একটা আবিষ্কার করে বসেছে।

'পেয়ে গেছি !' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'জলদি চলো সবাই। দারুণ এক আইডিয়া এসেছে আমার মাথায়। এইবার ! দু' সপ্তার মধ্যে যদি শয়তান রবিনহুডকে পাকড়াও করে বন্দিশালায় ভরতে না পারি, তাহলে আমার নামই নেই।'

শেরিফের এত খুশি হয়ে ওঠার কি কারণ থাকতে পারে ? আসলে পথ চলতে চলতে নানান ফন্দি-ফিকির ঘুরপাক খাচ্ছিল তার মাথায়, যদিও শেষ পর্যন্ত একটাও সুবিধের মনে হচ্ছিল না। সব ক'টা থেকেই কিছু না কিছু ত্রুটি বেরিয়ে আসছিল। এরমধ্যে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল–শেরিফ আগেই খবর পেয়েছে দুঃসাহসী রবিনহুড নাকি প্রায়ই নটিংহ্যাম শহরে আসে। এই সময়ের মধ্যে একবার যদি কোনমতে তাকে শহরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে ফেলা যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে করে ফেলতে পারে সে।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করার বুদ্ধি এল তার মাথায়। শেরউডের ডাকাতরা নিজেদেরকে খুব বড় তীরন্দাজ মনে করে। কাজেই যদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে বিজয়ীর জন্য লোভনীয় কোন পুরস্কারের ঘোষণা দেয়া যায়, তাহলে ঠিকই এসে হাজির হবে রবিনহুড। ঠিক করল শেরিফ, শূটিং প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাই করবে।

শহরে ফিরেই প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করার জন্য চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিল সে। বলা হলো–অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যে বিজয়ী হবে, তাকে একটা সোনার তীর এবং পেনি ভর্তি একটা রূপার শিঙা পুরস্কার দেয়া হবে। কি এক কাজে লিঙ্কন শহরে গিয়েছিল রবিনহুড, সেখানে ঘোষণাটা শুনে এসে অনুচরদেরকে জানাল।

'দেশে যত তীরন্দাজ আছে, এই প্রতিযোগিতায় তারা প্রত্যেকে অংশ নেবে। তাই আমি ঠিক করেছি এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না, আমিও যাবো। তোমরা কি বলো ?'

কেউ কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য ডঙ্কাস্টারের ডেভিড লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমার কিছু বলার আছে। আগে কথাগুলো শোনো, তারপর ঠিক করো কি করবে। এইমাত্র ব্লু বোর সরাইখানা থেকে শুনে এলাম, শেরিফ নাকি ওই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে শুধুমাত্র রবিনকেই ধরার জন্যে।

'শেরিফের ধারণা, এত বড় প্রতিযোগিতার কথা শুনলে অংশ নেয়ার লোভ সামলাতে না পেরে রবিনহুড ঠিকই নটিংহ্যামের চার দেয়ালের মধ্যে গিয়ে হাজির হবে। তখন তাকে ধরা পানির মত সহজ হয়ে যাবে। সে জন্যেই এই শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন। কিন্তু আমরা নেতাকে হারাতে চাই না। তাই আমার মনে হয় তার সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।'

ভুরু কুঁচকে ছেলেটার কথা শুনল রবিন, তারপর উঠে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিল। 'অনেক ধন্যবাদ, ডেভিড। চোখ-কান খোলা রেখে চলা বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের তো আরও অনেক বেশি তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলা জরুরি। খবরটা যদি সত্যিও হয়, তবুও আমি মনে করি এই প্রতিযোগিতায় আমাদের অংশ নেয়া

উচিত। না নিলে লোকে বলবে, শেরিফের ভয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার বদলে অনুচরদের নিয়ে গর্তে গা ঢাকা দিয়েছিল রবিন। নটিংহ্যামে পা রাখার সাহস হয়নি। এসব শুনতে কেমন লাগবে তোমাদের ?

'ডেভিডের কথা শুনে তো আরও রোখ চেপে যাচ্ছে আমার। ভাবছি, যে করেই হোক পুরস্কারটা ছিনিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু বোকার মত কিছু করে বসা ঠিক হবে না আমাদের। শেরিফের চাতুরীকে চাতুরী দিয়েই মোকাবিলা করতে হবে। ছদ্মবেশ নিয়ে যাবো আমি। তোমরাও যাবে। সবাই ভিক্ষুক সেজে যাবো আমরা। সাথে তলোয়ার, তীর-ধনুক লুকিয়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করা যায়। সোনার তীর আর রূপার বিউগল জিতে নিয়ে আসব আমি। এই গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখব সেসব। কি বলো তোমরা ?'

সবাই এক কথায় রাজি হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে উৎসবের সাজে সাজলো নটিংহ্যাম। নগর প্রাচীরের কাছের বিরাট একটা মাঠে শূটিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো। কয়েক সারি বেঞ্চ পেতে নাইট, জমিদার, শহরের অভিজাত এবং পয়সাওয়ালা লোকদের সপরিবারে বসার ব্যবস্থা করা হলো। শেরিফ ও তার স্ত্রীর বসার জন্য টার্গেটের কাছেই একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, রঙিন সিল্কের রিবন ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে সেটাকে।

সেটার শ' দেড়েক গজ দূরে প্রতিযোগীদের জন্য মস্তবড় এক ডোরা কাটা তাঁবু টাঙানো হয়েছে। নানান ধরনের নকশা করা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো সেটা। তাঁবুর এক খুঁটিতে নানান রঙের পতাকা উড়ছে। ভেতরে বিরাট একটা মদের পিপে রাখা, প্রতিযোগীরা ইচ্ছেমত মদ খেতে পারে সেটা থেকে। বেঞ্চগুলোর উল্টোদিকের কিছুটা জায়গা সাধারণ দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বসার ব্যবস্থা নেই, শুধু রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জায়গাটা, যাতে তারা মাঠে ঢুকে পড়তে না পারে।

প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই দর্শকরা দলে দলে মাঠে এসে জড়ো হতে শুরু করে দিয়েছে। অভিজাত শ্রেণীর দর্শকরা ঘোড়ায় চড়ে অথবা গাড়িতে করে আসছে, সাধারণ দর্শক পায়ে হেঁটে। রেলিং ঘেরা জায়গায় বসে পড়েছে তারা, কেউ কেউ শুয়েও পড়েছে।

প্রতিযোগীরা একজন-দু' জন করে এসে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে জড়ো হতে শুরু করেছে। তাদের কেউ চড়া গলায় নিজের বাহাদুরির ফিরিস্তি শোনাচ্ছে অন্যদেরকে, কেউ বা নিজের ধনুকের ছিলা টেনে পরখ করে দেখছে কোন ত্রুটি আছে কি না। অন্যরা নিজের কোন তীর বাঁকা কি না, এক চোখ বুজে অন্য চোখ দিয়ে তা পরীক্ষা করছে।

দামি পুরস্কারের লোভে দেশের নানান জায়গা থেকে বিখ্যাত সব তীরন্দাজ এসে জড়ো হয়েছে নটিংহ্যামে। তাদের মধ্যে আছে শেরিফের বনরক্ষী বাহিনীর সেরা তীরন্দাজ, রেড ক্যাপের গিল বা গিলবার্ট। আরও আছে লিঙ্কনের ক্রুইকশ্যাঙ্ক এবং উডস্টকের বিখ্যাত শূটিং প্রতিযোগিতায় যে সেকালের সেরা তীরন্দাজ ক্রিমকে হারিয়ে শিরোপা কেড়ে নিয়েছিল, সেই লেসলির উইলিয়ামসহ আরও অনেকে।

সবার শেষে দুধ সাদা রঙের ঘোড়ায় চড়ে মাঠে এলো শেরিফ, পাশাপাশি আরেক ঘোড়ায় তার স্ত্রী। শেরিফ বেগনি রঙের সিল্কের পোশাক পরে আছে, মাথায় একই রঙের ভেলভেটের টুপি এবং পায়ে কালো ভেলভেটের মোজা। তার স্ত্রী রাজহাঁসের পালক দিয়ে নকশা করা নীল ভেলভেটের পোশাক ও বহু মূল্যবান সোনার গহনা পরে এসেছে। গদাই লস্করি চালে এসে মঞ্চের পাশে থামল তারা। ঘোড়া থেকে নেমে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসতেই ইউনিফর্ম পরা বর্শাধারী প্রহরী দাঁড়িয়ে গেল দু' পাশে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে সবকিছু ঠিক আছে কি না দেখে নিল শেরিফ, তারপর কাছে দাঁড়ানো ঘোষকের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। রূপার তৈরি একটা শিঙা তুলে তিনটা ফুঁ দিল সে, অমনি তাঁবু থেকে এক এক করে বেরিয়ে আসতে লাগল তীরন্দাজরা। অপেক্ষমাণ জনতা চিৎকার করে স্বাগত জানাল তাদেরকে।

হাত তুলে সবাইকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল ঘোষক, তারপর প্রতিযোগিতার নিয়ম বর্ণনা করতে লাগল :

'প্রথম রাউন্ডে এই টার্গেটে একটা করে তীর ছুড়তে হবে আপনাদের সবাইকে। দেড়শো গজ দূরের ওই দাগে দাঁড়িয়ে ছুড়তে হবে তীর। প্রথম রাউন্ডে যারা নিজেদেরকে সেরা তীরন্দাজ প্রমাণ করতে পারবে, তাদের মধ্যে থেকে দশজনকে বাছাই করা হবে পরবর্তী রাউন্ডের জন্যে। দ্বিতীয় রাউন্ডে দু'টো করে তীর ছোড়ার সুযোগ দেয়া হবে। তারপর তাদের মধ্যে থেকে আবার তিনজনকে বাছাই করা হবে তৃতীয় রাউন্ডের জন্যে। সেই তিনজন তিনটা করে তীর ছোড়ার সুযোগ পাবে। তার মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হবে, তাকেই পুরস্কার দেয়া হবে।'

নিজের আসনে ঝুঁকে বসল শেরিফ। তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিযোগীদের মধ্যে রবিনহুডকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু ওর মধ্যে সবুজ পোশাক পরা কাউকে না দেখে মন দমে গেল তার। লোকটা অংশ নিতে এসে থাকলেও এতো প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে থেকে চিনে বের করা কঠিন হবে, ভাবল শেরিফ। তবে এসে থাকলে ও দশজনের মধ্যে একজন যে হবেই, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তখন ওকে চিনে বের করা মোটেই কঠিন হবে না।

একটু পর প্রতিযোগিতা শুরু হলো। নিয়ম অনুযায়ী সবাই একটা করে তীর ছুড়ল, কিন্তু টার্গেটে গিয়ে লাগল মাত্র সাতটা। তার মধ্যে চারটা বিধল টার্গেটের

কেন্দ্রের বাইরের কালো রঙের বড় বৃত্তের এখানে-সেখানে, বাকি দু'টো সাদা রঙের মূল বৃত্তের কাছাকাছি। আর শেষ তীরটা বিঁধল টার্গেটের একদম মাঝখানে। কানে তালা লাগানো হই-হুল্লোড় ও বিপুল হাততালির মাধ্যমে শেষের তীরন্দাজকে অভিনন্দন জানাল দর্শকরা।

দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য এই সাতজনসহ আরও তিনজনকে নেয়া হলো। তার মধ্যে ছয়জন সারা দেশে নামকরা তীরন্দাজ, সবাই চেনে। রেড ক্যাপের গিল বা গিলবার্ট, ট্যামওয়ার্থের অ্যাডাম, ডিকন ক্রুইকশ্যাঙ্ক, লেসলির উইলিয়াম, ক্লাউডের হিউবার্ট এবং হার্টফোর্ডশায়ারের সুইডিন। এরা ছাড়া ইয়র্কশায়ারের আরও দু'জন তীরন্দাজ আছে, আর আছে লন্ডন থেকে আসা নীল পোশাক পরা এক তীরন্দাজ। এরা সবাই মোটামুটি চেনা।

কিন্তু সবার শেষে যে লোকের তীর টার্গেটের একদম মাঝখানে গিয়ে বিঁধেছিল, তাকে কেউই চেনে না। এক চোখ কালো পট্টি দিয়ে ঢাকা রয়েছে তার–ওটা দিয়ে দেখতে পায় না সে। পরনে শতচ্ছিন্ন একটা লাল জামা। পাশে বর্শা হাতে দাঁড়ানো প্রহরীদের একজনকে ইশারায় কাছে ডাকল শেরিফ। লোকটা ঝুঁকে আসতে তার কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'ওই দশজনের মধ্যে রবিনহুড শয়তানটা আছে মনে হয় ?'

'না, স্যার শেরিফ,' মাথা নাড়ল সে। 'ওর মধ্যে ছয়জনকে খুব ভালো করে চিনি আমি। ইয়র্কশায়ার থেকে যে দু'জন এসেছে, তাদের একজন রবিনের চেয়ে লম্বা, অন্যজন খাটো। কাজেই ওরাও বাদ। আর ওই যে লাল জামা পরা ভিখারি, তাকেও বাদ দেয়া যায়। কারণ রবিনের দাড়ির রং সোনালি, কিন্তু এর দাড়ি খয়েরি। তাছাড়া লোকটার এক চোখ কানা, স্যার। বাকি থাকল নীল পোশাক পরা ওই লোকটা। আমার ধারণা, তার কাঁধের চেয়ে রবিনের কাঁধ আরও অন্তত তিন ইঞ্চি বেশি চওড়া হবে।'

'শয়তানটা তাহলে সত্যিই আসেনি ?' ভুরু কুঁচকে উঠল শেরিফের। 'ওকে এতদিন সাহসী লোক বলেই জানতাম আমি, কিন্তু আজ বোঝা গেল লোকটা আসলে ভীরু আর কাপুরুষ।' গলার স্বরেই বোঝা গেল খুব হতাশ হয়েছে সে। একরকম নিশ্চিত ছিল, এতবড় একটা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার লোভ কিছুতেই সামাল দিতে পারবে না রবিনহুড।

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য বাছাই করা দশজন তীরন্দাজ এসে দাঁড়াল দাগের ওপর। নীরব হয়ে গেল মাঠ। কোনরকম সাড়াশব্দ নেই দর্শকদের মধ্যে। দম ছাড়তেও যেন ভুলে গেছে। দুটো করে তীর ছুড়ল নয়জন প্রতিযোগী, তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু সেই অন্ধ ভিখারি তীর ছুড়তেই পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল–উল্লাসে ফেটে পড়ল দর্শক। গগনবিদারী চিৎকারে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। মাথার টুপি খুলে শূন্যে ছুড়ে দিল তারা।

বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার :

তৃতীয় রাউন্ডের জন্য তিনজন টিকলো–রেড ক্যাপের গিলবার্ট, ট্যামওয়ার্থের অ্যাডাম এবং সেই কানা ভিখারি। 'গিলবার্ট,' চেঁচিয়ে ডাকল শেরিফ। 'মুখ রাখা চাই মনে রেখো। জিততে পারলে পুরস্কার তো পাবেই, নিজের পকেট থেকে আরও একশো রূপোর পেনি দেবো আমি।'

'চেষ্টার ত্রুটি হবে না, স্যার,' বলল লোকটা। তূণ থেকে ভাল দেখে একটা তীর বাছাই করে নিয়ে সতর্কতার সাথে ছুড়ল টার্গেট লক্ষ্য করে। কেন্দ্রবিন্দুর এক আঙুল পরিমাণ ডানে গিয়ে বিঁধল সেটা। অমনি চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল দর্শকদের মধ্যে।

'চমৎকার, গিলবার্ট ! বাহ্, চমৎকার !'

এবার ছিলায় তীর বসালো ছেঁড়া পোশাক পরা সেই কানা ভিখারি। তীর ছোঁড়ার আগ মুহূর্তে হাত উঁচু করতেই তার বগলের তলায় হলুদ রঙের বড় এক তালি দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল দর্শকরা, কিন্তু পরমুহূর্তে হাসি জমে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। গিলবার্টের তীরের চেয়ে দু'টো শর্ষের দানা পরিমাণ ভেতরে বিঁধেছে তারটা–কেন্দ্রবিন্দুর কিছুটা কাছে। শেরিফ অজান্তেই তীরন্দাজের প্রশংসা করে বলল, 'চমৎকার, চমৎকার !'

সবার শেষে অ্যাডাম তীর ছুড়ল। প্রথম দুই তীরের মাঝখানে গিয়ে বিঁধল সেটা। তৃতীয় রাউন্ডের প্রথম দফায় ভিখারি প্রথম হলো, দ্বিতীয় হলো অ্যাডাম এবং তৃতীয় গিলবার্ট। কিছু সময়ের বিরতির পর দ্বিতীয় দফা তীর ছুড়ল তারা। কিন্তু সেবার অ্যাডাম হলো তৃতীয়, গিলবার্ট দ্বিতীয়। ভিখারি প্রথম। আরও একবার বিরতির পর শেষ দফা তীর ছোড়ার জন্য দাগের ওপর এসে দাঁড়াল তিন প্রতিযোগী।

শেষ তীর ছোড়ার আগে বেশ কিছু সময় ধরে প্রস্তুতি নিল রেড ক্যাপের গিলবার্ট, তারপর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ছুড়ল। অদ্ভুত কাণ্ড ! এবার কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাত্র এক সুতা পরিমাণ ডানে বিঁধল তীরটা। তাই দেখে দর্শকরা এমনভাবে হই-হই করে আনন্দ প্রকাশ করল যে বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কিছু দাঁড়কাক ভয়ে উড়ে পালালো।

'দারুণ দেখিয়েছো, গিলবার্ট !' খুশি চেপে রাখতে না পেরে বসা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'পুরস্কার তোমার কপালেই লেখা আছে, কোন সন্দেহ নেই। এর চেয়ে ভালো কিছু করার সাধ্য কারও নেই।' হাসতে হাসতে ভিখারির দিকে ফিরল। 'কি খবর, আরও তীর ছোড়ার ইচ্ছে আছে, নাকি এখানেই ক্ষ্যান্ত দিতে চাও ?'

কিছু না বলে দাগের ওপর গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। নীরব হয়ে গেল দর্শক। কি হয় কি হয় ভেবে চাপা উত্তেজনায় ভুগছে সবাই। দম আটকে ভিখারির দিকে তাকিয়ে আছে। ছিলায় তীর বসিয়ে কয়েক সেকেন্ড পাথরের মূর্তির মতো অনড়

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা, তারপর একটানে ছিলাটা কান পর্যন্ত নিয়ে এসেই ছেড়ে দিল তীর। টোয়াং ! শব্দের সাথে সাঁ করে উড়ে গেল সেটা–সবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের সামনে গিলবার্টের তীরের একটা পালক খসিয়ে দিয়ে ঠক্ করে কেন্দ্রবিন্দুর ঠিক মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো।

গোড়াটা কাঁপলো কিছুক্ষণ থরথর করে, তারপর ক্রমে স্থির হয়ে এলো। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে দর্শকরা এতোটাই তাজ্জব হয়ে গেল যে আনন্দ প্রকাশ করার কথাও মনে থাকল না কারও, হাঁ করে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল তারা।

দাগের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের পালা আসার অপেক্ষায় ছিল তৃতীয় প্রতিযোগী। কিন্তু দ্বিতীয় তীরটার ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল। ধনুক তোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা।

'নাহ্, চল্লিশ বছর ধরে তীর-ধনুক নিয়ে কারবার করে আসছি। বেশিরভাগ প্রতিযোগিতা থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরেছি। কিন্তু এবার আর তা হওয়ার নয়। এই লোকটি কে জানি না। কিন্তু এর কোন তুলনা হয় না। হার মেনে নিলাম আমি।' হাতের তীরটা তূণে ভরে রেখে দাগ থেকে পিছিয়ে এল সে।

পুরস্কার দিল শেরিফ। দর্শকদের আকাশ ফাটানো উল্লাস আর প্রচণ্ড হাততালির মধ্যে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল শতচ্ছিন্ন লাল পোশাক পরা ভিখারি। খুব বিনয়ের সাথে পুরস্কার নিল। শেরিফ বলল, 'আজ অতুলনীয় দক্ষতা দেখিয়ে বিজয়ী হয়েছো তুমি, ভিখারি। নাম কি তোমার ? বাড়ি কোথায় ?'

'লোকে আমাকে ডাকে টেভিয়োডেলের জক বলে, স্যার,' জবাব দিল সে। 'ওখানেই আমার বাড়ি।'

'বেশ, বেশ ! এর আগে আর কাউকে এত ভাল তীর ছুড়তে দেখিনি আমি। আমার বাহিনীতে যোগ দেবে ? ভাল বেতন পাবে। তোমার ভাগ্য ভাল যে কাপুরুষ রবিনহুড আজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসেনি, এলে তাকেও হার মানাতে হতো তোমাকে। কি বলো, আসবে আমার বাহিনীতে ?'

'না ! আমি কারও গোলামি করি না। আমি নিজেই নিজের মনিব।'

রাগে লাল হয়ে উঠল শেরিফ। 'তাহলে দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে,' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'এই বেআদবির জন্যে তোমাকে উপযুক্ত সাজা দিতে পারতাম আমি, কিন্তু আজকের মতো ক্ষমা করে দিলাম। যাও, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে !'

'যাচ্ছি !' সে-ও সমান তেজের সাথে জবাব দিল। 'কিন্তু কারও ক্ষমা-টমারও ধার ধারি না আমি, মনে রাখবেন।' পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল লোকটা।

ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা এক ভিখারির মুখে এতবড় কথা শুনতে হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি শেরিফ। তাই অসহ্য রাগে কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে থাকল। হুঁশ ফিরতে দেখল সাধারণ দর্শকদের জন্য ঘেরা দেয়া জায়গার কাছে পৌঁছে গেছে ভিখারি। চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ, 'ধরো, ধরো ! ধরে আনো হারামজাদাকে।'

পিছন থেকে কয়েকজনের পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল ভিখারি। দেখল সাত-আটজন বর্শাধারী প্রহরী ছুটে আসছে তার দিকে। অমনি চোখের পলকে তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিল সে, সেটা ধনুকে পরিয়েই শেরিফের কপাল লক্ষ্য করে তুলল। ছিলা যতোদূর সম্ভব কাছে টেনে নিয়ে এসে প্রস্তুত হলো তীর ছোড়ার জন্য। উপস্থিত সবাই হা হয়ে গেল ঘটনার আকস্মিকতায়।

'সাবধান !' ধমকে উঠল লোকটা। 'আপনার লেলিয়ে দেয়া কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে নিন, শেরিফ। 'নইলে এই তীর ঠিক আপনার দু' চোখের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেবো।'

দাঁড়িয়ে পড়ল প্রহরীর দল, পিছনে ফিরে অসহায়ের মত শেরিফের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকল। ওদিকে শেরিফের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। কিন্তু নিজের বিপদ ঠিকই টের পেলো সে। জানে, এখন ঘাড় ত্যাড়ামির অর্থ হবে ভিখারির অব্যর্থ তীরে প্রাণটা হারানো।

'চলে এসো !' প্রহরীদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল শেরিফ। 'যেতে দাও ওকে। তোমরা ফিরে এসো।'

আর এগোলো না লোকগুলো, তবে ফিরেও গেল না। শেরিফের বিপদ কেটে গেলেই বেয়াড়া লোকটাকে তাড়া করবে বলে প্রস্তুত। ওদিকে ব্যাপারটা টের পেয়ে রেলিং টপকে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ঢুকে পড়ল ভিখারি। কিছুদূর গিয়ে পুরস্কার পাওয়া পেনি ভর্তি রূপোর শিঙাটা বের করে পেনিগুলো শূন্যে ছুড়ে দিল।

'কুড়িয়ে নাও তোমরা !' চেঁচিয়ে বলল সে। 'যে যতোগুলো পারো।'

মাটিতে ছড়িয়ে পড়া পেনি নিয়ে মহা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল দর্শকদের মধ্যে, তাদের হুড়োহুড়ির কারণে বহু চেষ্টা করেও আর এগোতে পারল না প্রহরীরা। অন্যদিকে দর্শকদের মধ্যে থেকে শতচ্ছিন্ন কাপড়চোপড় পরা একদল হতদরিদ্র, দুঃখী মানুষ এগিয়ে এসে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ভিখারিকে। শহর থেকে বের করে নিয়ে গেল।

সেদিন বিকেলে শেরউডের সেই বিখ্যাত গ্রিনউড গাছের নিচে জড়ো হলো বিচিত্র পোশাক-আশাক পরা একদল মানুষ। কেউ পরে এসেছে ভিক্ষুকের পোশাক, কেউ পাদ্রির আলখাল্লা, কেউ বা ঝালাইকারের অথবা হাবাগোবা চাষীর পোশাক। আনন্দ-উল্লাসে মেতে আছে সবাই। তাদের মাঝখানে বসে আছে সেই ভিখারি। তার এক হাতে সোনার তীর, অন্য হাতে রূপোর শিঙা।

হই-চইয়ের মধ্যে ভিখারির চোখের পট্টিটা খুলে ফেলতে দেখা গেল অন্ধ নয় সে, দু' চোখেই দেখতে পায়। খুশিতে চকচক করছে তার চাউনি। পরনের শত তালি মারা পোশাকটা খুলে ফেলতে দেখা গেল তার নিচে লিঙ্কন গ্রিনের তৈরি পোশাক পরে আছে সে। হাসিমুখে দাড়িতে হাত বোলালো ভিখারি।

'কিন্তু আমার এত সাধের সোনালি দাড়ির কি হবে ?' বলল সে। 'এগুলো থেকে ওয়ালনাটের কষের দাগ তুলবো কি করে ?'

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। রবিনহুড উঠে পুরস্কার পাওয়া সোনার তীরটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, 'এবার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা দরকার। খুব খিদে পেয়েছে।'

ওয়েকফিল্ডের খোঁয়াড় মালিক : জর্জ-এ-গ্রিন

বছরগুলো দ্রুত কেটে যাচ্ছে। রবিনহুড তার সঙ্গীদের নিয়ে শেরউডে যেমন ছিল, তেমনি আছে। এদিকে বাইরের পৃথিবীতে যুবরাজ জন, ভাই রিচার্ডকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতায় বসার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন। ভাই বেঁচে নেই, যুদ্ধে গিয়ে মরে গেছেন ইত্যাদি খবর রটিয়ে ক্ষমতায় বসার পরিবেশ নিজের অনুকূলে নিয়ে এসেছিলেন তিনি, এমন সময় জানা গেল রিচার্ড মরেননি। জেরুজালেমে ধর্মযুদ্ধে হেরে গিয়ে অস্ট্রিয়ার আর্চডিউকের হাতে বন্দি হয়ে কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন।

রিচার্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চারণ কবি ব্লনডেল তাঁর খোজে ইউরোপের অনেক দেশ ঘুরে অবশেষে তাঁকে অস্ট্রিয়ায় খুঁজে পেয়েছে। আর্চডিউকের দুর্গ কারাগারে বন্দি আছেন রিচার্ড। তাঁকে ছাড়াতে অনেক টাকা দরকার।

টাকা সংগ্রহ করার চেষ্টা দূরে থাক, খবরটা যাতে জানাজানি হতে না পারে, যুবরাজ জন বরং সেই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু লাভ হলো না। সারাদেশ জেনে গেল তাদের প্রিয় রাজার অনুপস্থিতির কারণ। ধনী-গরিব, সবাই এগিয়ে এল টাকা নিয়ে। অস্ট্রিয়ান আর্চডিউকের দাবি পূরণে যে যা পারে সাহায্য করতে লাগল।

রবিনহুডও এ ব্যাপারে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল। লোকে যুবরাজের অনুসারী বলে জানে এমন কোন বিশপ বা অ্যাবট, ব্যারন বা নাইট, কেউ রেহাই পেল না ওর তৎপরতার হাত থেকে। শেরউড অতিক্রম করার সময় তাদের সবার পকেটের ওজন হালকা করতে লাগল রবিন। সারাদেশে যখন টাকা সংগ্রহের কাজ জোরেশোরে চলছে, তখন আরেকবার ক্ষমতা দখলের মরিয়া চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগলেন জন।

উত্তর ইংল্যান্ডে, যেখানে বেশিরভাগ ব্যারন জনের সমর্থক, সেখানে একমাত্র চেস্টারের আর্ল, রেনালফ তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াল। প্রতিজ্ঞা করল, রিচার্ডের বিরোধিতাকারীদের কাউকে হাতের মুঠোয় পেলে তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হত্যা করবে সে। রিচার্ডের এরকম আরেক অন্ধ সমর্থক ছিল ইয়র্কশায়ারের ওয়েকফিল্ডের জর্জ-এ-গ্রিন নামের এক খোঁয়াড় মালিক।

লোকটার পেশা ছিল বেওয়ারিশের মত ঘুরে বেড়ানো এবং অন্যের বাগানে ঢুকে সবজি বা গাছ খাওয়া বা খড়ের গাদায় মুখ দেয়া ভেড়া-গরু যা-ই হোক,

ধরে নিয়ে খোঁয়াড়ে আটকে রাখা। পরে মালিককে এসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হত সেগুলোকে। উঁচু পাথরের দেয়াল এবং মজবুত গেট থাকত খোঁয়াড়ের।

জর্জ-এ-গ্রিন ছিল আজব খোঁয়াড় মালিক। কেবল পশুই নয়, রিচার্ডে বিপক্ষের যাকেই পেত, তাকেই ধরে আটকে রাখত। যুবরাজ জনের তরফ থেকে অনেকবার অনেক সশস্ত্র যোদ্ধা বাহিনী, তীরন্দাজ বাহিনী এসেছে তাকে দমন করতে। কিন্তু জর্জ-এ-গ্রিনের হাতে উল্টে বন্দি হয়েছে তারা। এ ধরনের লড়াইয়ে লোকটা খুব বেশি সুনাম অর্জন করেছিল। যে কারণে তখন ইংল্যান্ডে রবিনহুডের চেয়ে সে-ই বেশি আলোচিত ছিল।

প্রচণ্ড শক্তিধর ছিল লোকটা, সব ধরনের অস্ত্র চালনায় সমান পারদর্শী। ফলে ওয়েকফিল্ডের সমস্ত কুমারী মেয়ের লোভ ছিল তার ভালবাসা অর্জনের। তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বেট্রিস জয় করতে পেরেছিল জর্জ-এ-গ্রিনকে। গ্রাইম নামে এক ধনী বিচারকের মেয়ে ছিল বেট্রিস। বিচারক অবশ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত মেয়েকে গ্রিনের সাথে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। কারণ যুবরাজের প্রতি দুর্বলতা ছিল তার। তাছাড়া যুবরাজের পক্ষের এক লর্ডও বেট্রিসকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

গ্রিন আর বেট্রিসকে নিয়ে অনেক গাঁথা-কবিতা রচনা হয়েছে, যার ফলে দু'জনেই ওয়েকফিল্ডে যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল। রবিনহুড দুঃসাহসী গ্রিন ও অপরূপা বেট্রিসের কথা জানতে পারে অন্য এক চারণ কবির মাধ্যমে। লোকটা একবার ঘুরতে ঘুরতে শেরউডে এসে প্রবল বৃষ্টিতে প্রায় দু' সপ্তাহের জন্য আটকে গিয়েছিল। তখন সেখানে থাকা-খাওয়ার মূল্য হিসেবে রবিন ও তার দলের সদস্যদেরকে গান-গাঁথা ইত্যাদি শোনাত সে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন বরিন খেয়াল করল, মেরিয়ান কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছে। সারাক্ষণ মনমরা, বিষণ্ন থাকে। মেজাজও সারাক্ষণ এত বেশি চড়া আর খিঁচড়ে থাকে যে অল্পতেই রেগেমেগে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয় ও। অনেক মাথা খাটিয়েও এর কোন কারণ খুঁজে পেল না রবিন। এপ্রিলের এক সুন্দর বিকেলে মেরিয়ানকে নিয়ে গ্লেডের এক ডালিম গাছের নিচে এসে বসল রবিন।

'তোমার কি হয়েছে, মেরিয়ান !' প্রশ্ন করল ও। 'আজকাল সারাক্ষণ এত মনমরা থাকো কেন তুমি ? তোমার এই বিষণ্নতা আমার সহ্য হয় না, প্রিয়তমা। কি হয়েছে তোমার, বলো আমাকে। রাজার ফিরতে দেরির কারণে আমাদের বিয়েতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ...'

মিষ্টি করে হাসল মেরিয়ান। রবিনের কাঁধে মাথা রেখে বসল। 'না, না ! সে জন্যে না।'

'তাহলে কি ?'

'তুমি হাসবে না তো শুনে ?' লজ্জায় চোখমুখ লাল হয়ে উঠল ওর।

'না। হাসব না।'

মুখ নামিয়ে নিল সুন্দরী মেরিয়ান। দ্বিধাগ্রস্তের মত কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে বলল, 'আজকাল সবার মুখে সব সময় কেবল জর্জ-এ-গ্রিনের আর অপূর্ব সুন্দরী বেট্রিসের প্রশংসা শুনি। অথচ ক'দিন আগেও সবার মুখে-মুখে, গানে-গানে শুধু আমার রবিনের বন্দনা আর আমার রূপের গাঁথা শুনতাম।'

রবিন আবার হাসল। ঘোষণা করল, 'কিছুদিন পর আবারও তা শুনতে পাবে। এই জর্জ লোকটার সুনাম হঠাৎ করে যেমন তুঙ্গে উঠে গেছে, তেমনি হঠাৎ করেই পড়ে যাবে। কিছুদিন অপেক্ষা করো, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। আর যারা শুধু বেট্রিসকে দেখে তার রূপের প্রশংসা করে, তারা তোমাকে একবার দেখলে চুপ হয়ে যাবে। আর কিছু বলবে না।'

'আচ্ছা, আমরা ওয়েকফিল্ডে যেতে পারি না ?' ইতস্তত করে বলল মেরিয়ান। 'লাঠি যুদ্ধে রবিন জর্জ-এ-গ্রিনের কাছে হেরে যাবে, এ কথা আর সহ্য করতে পারছি না আমি।'

জোর গলায় হেসে উঠল রবিনহুড। 'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো ! ওয়েকফিল্ডে অবশ্যই যাব আমরা।'

'কবে ?'

'খুব শীঘ্রি। শেরউডের গুহায় বন্দি থাকতে আমারও আর ভাল লাগছে না। আমাদের সাথে উইল স্কারলেট আর লিটল জনও যাবে। চলো, ওদেরকে খবরটা জানাই। মজবুত ছিলা আর বাছাই করা তীর নিয়ে যেতে হবে। আর ওকের লাঠি। তোমাকে কথা দিতে পারি,' হাসিল রবিন, 'জর্জ-এ-গ্রিনের সাথে আমার দেখা হলে মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড ঘটবেই।

***

এই ঘটনার কিছুদিন পর। প্রেমিকা বেট্রিসকে নিয়ে বিকেলে ঘুরতে বেরিয়েছে জর্জ। ওয়েকফিল্ড থেকে বেরিয়ে এসে বিশাল শস্য খেতের পাশে থামল তারা। বেট্রিস তার কাঁধে মাথা রেখে সামনের দিগন্তজোড়া চোখ জুড়ানো সবুজের সমারোহের দিকে তাকিয়ে থাকল।

এমন সময় হঠাৎ প্রেমিকের কাঁধের পেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠতে অবাক হয়ে গেল বেট্রিস। 'কি হলো ?' জর্জকে লাঠিটা শক্ত করে ধরে ফসলের মাঠের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাতে দেখে সে-ও তাকাল।

'ওই চারজনকে দেখো !' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জর্জ। 'বোকা কোথাকার ! কেমন ফসল মাড়িয়ে আসছে।' গলা চড়িয়ে লোকগুলোকে ধমক লাগাল। 'এদিক দিয়ে না, বোকার দল ! ওদিক দিয়ে এসো !'

'দুঃখিত !' আগন্তুকদের মধ্যে সবার আগে থাকা লোকটি মাথা নাড়ল। আপদমস্তক লিঙ্কন গ্রিন কাপড়ের পোশাক পরে আছে লোকগুলো। সবার হাতে লাঠি আর কাঁধে তীর-ধনুক। 'আমরা চারজন, দুঃসাহসী ফরেস্টার, আর তুমি সাধারণ একজন ইয়োম্যান। আমাদেরকে কোন পথে যেতে হবে, সে কথা বলার সাহস কে দিল তোমাকে ?'

'ঘুরে ওদিক দিয়ে এসো !' চেঁচিয়ে উঠল জর্জ-এ-গ্রিন। 'কেন, রাজপথ দিয়ে হাঁটতে পারো না, কচি ফসলের মাঠের মধ্যে দিয়ে কেন ? যাও ! নইলে মেরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেব সব ক'টার !'

'পাগল নাকি !' বলে উঠল রবিন। সবার আগে ছিল ও। 'আমাদের চারজনের সাথে তুমি একা লড়াই করবে ? বাচ্চা ছেলে পেয়েছ ? আমাদের আকার দেখেছ ?'

'কেন ? যার আকার বড়, তার সাহসও তেমনি হবে বোঝাতে চাইছ ? আমি মানি না। তছাড়া তুমি যদি শেরউডের রবিনহুডের মত শক্তিধরও হও, তবু কচি ফসল মাড়িয়ে আসার কোন অধিকার নেই তোমার। আমি ওয়েকফিল্ডের খোঁয়াড় মালিক। নাম শুনেছ আমার ? গরুর মত পিটিয়ে তল্লাট ছাড়া করব সবক'টাকে। অবশ্য তোমরা যদি সাহসী হও, তাহলে একজন একজন করে আসতে পারো। দেখি, তোমরা কে কত ওস্তাদ।'

'তাই নাকি ?' টিটকারির হাসি ফুটল স্কারলেটের মুখে। লাঠি বাগিয়ে ধরে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল সে। 'তুমি এত পারো ? তাহলে তোমার রাজার চ্যাম্পিয়ন হবার কথা ছিল। শূন্য হাঁড়ি বেশি ঠন্ ঠন্ করে জানো তো ? কাপুরুষরাও বেশি "পারি, পারি !" করে।'

'আমার সাথে লড়ার সাহস আছে তোমার ?' একটু অবাক হলো জর্জ।

'তা আছে,' মাথা ঝাঁকাল স্কারলেট। লাঠি বাগিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

বেট্রিসকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াতে বলে জর্জ এগিয়ে গেল স্কারলেটের দিকে, কয়েক মুহূর্তে মধ্যে শুরু হয়ে গেল লড়াই। দু'জনেই সামনে সামন চলল কিছু সময়, তারপর দেখা গেল স্কারলেটের দম ফুরিয়ে আসছে। জর্জের প্রচণ্ড শক্তির মারের ওজন সামাল দিতে পারছে না সে, হাঁপিয়ে উঠেছে। আর কিছুক্ষণ পর শেষ হলো লড়াই।

ফলাফল—উইল স্কারলেট পথের পাশে পড়ে আছে, তার মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে।

'বুড়োদের সাথে বাহাদুরি, না !' চেঁচিয়ে বলল লিটল জন। 'আমার সাথে এসো। তোমার ক্ষমতা কত দেখি একবার !'

মুহূর্তের মধ্যে আবার শুরু হয়ে গেল। পাকা ওকের লাঠির ঠোকাঠুকি দূরাগত মেঘ ডাকার মত মনে হতে লাগল। এবারও খোঁয়াড় মালিক জয়ী হলো। জনকে মুহূর্তের জন্য বেকায়দায় পেয়ে সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দিল। তিন মিনিটের মধ্যে জনকে ধরাশায়ী করে রবিনের দিকে মন দিল।

তবে এবারের যুদ্ধ আগের দু' বারের মত ক্ষণস্থায়ী হলো না বা এক তরফাও হলো না। দুই ওস্তাদ লাঠিয়াল একনাগাড়ে এক ঘণ্টারও বেশি প্রবল প্রতাপের সাথে লড়াই করেও সুবিধে করতে পারল না। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো। ক্লান্ত হয়ে কিছু সময় জিরিয়ে নিতে বসল তারা। রবিন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আর লড়াইয়ে কাজ নেই, জর্জ-এ-গ্রিন ! আমার লাঠির শপথ করে বলছি, তোমার মত এতবড় লাঠিয়াল আমি আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমি আমার জুড়ি খুঁজে পেয়েছি। এসো, আজ থেকে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই। ওয়েকফিল্ড ছেড়ে চলো আমার সাথে।'

কপালের ঘাম মুছে চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল খোঁয়াড় মালিক। 'তুমি কে বলো তো !'

'কেন, তুমি যার কথা একটু আগে বলছিলে, আমি সেই রবিনহুড ! ওরা দু'জন হচ্ছে উইল স্কারলেট আর লিটল জন।'

'রবিনহুড !' আনন্দে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল জর্জ-এ-গ্রিন। 'তুমি রবিনহুড ! ওহ্, তোমাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি আমি ! রাজা রিচার্ডের পর তুমিই একমাত্র মানুষ যাকে আমি সবচেয়ে বেশি সম্মান করি। নিশ্চয়ই তোমার সাথে যাব আমি। কিছুদিন তোমাদের শেরউডে গিয়ে থেকে আসব।'

কথা বলতে বলতে রবিনের দলের ছোটখাটো, চতুর্থ সদস্যটির দিকে চোখ গেল তার। 'ও কে ?'

মুচকে হাসল রবিন। 'ও মেরিয়ান !'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল বেট্রিস। 'লেডি মেরিয়ান !'

মেরিয়ান মাথার হুড ফেলে দিতে ওর অপূর্ব সুন্দর চেহারা দেখে হা হয়ে গেল জর্জ ও বেট্রিস। ওর সৌন্দর্য আর কমনীয়তা দেখে তাক লেগে গেছে। রবিনের কোন সন্দেহ রইল না যে উত্তর ইংল্যান্ডে মেরিয়ানই সেরা সুন্দরী। বেট্রিসও অবশ্যই সুন্দরী–তবে মেরিয়ানের সাথে কোনদিক থেকেই তুলনার যোগ্য নয়।

বেট্রিস মেরিয়ানের সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল, ওর বাড়ানো হাতে চুমু খেল। 'না, না !' মৃদু কণ্ঠে বাধা দিল ও। 'শেরউডে কোন লেডি মেরিয়ান নেই, বেট্রিস। মেইড মেরিয়ান আছে।' বেট্রিসকে বসা থেকে তুলে দাঁড় করাল।

'অনেক হয়েছে, রবিনহুড !' জর্জ বলল। 'এবার চলো, আজ আমার অতিথি তোমরা। সবেচে' গুরুত্বপূর্ণ অতিথি। তুমি, প্রিয় মুখ মেরিয়ান, আর বিখ্যাত দুই যোদ্ধা উইল স্কারলেট এবং লিটল জন। তীর-ধনুকের ওস্তাদিতে যাদের সাথে আমি কোনদিন পেরে উঠব না। আমি গরিব মানুষ, ছোট ঘরে থাকি। কিন্তু তোমাদের জন্যে আজ এমন জিনিস রাঁধব, যা তোমরা কোন ম্যানর হাউসেও পাবে না। গরুর আস্ত একটা রান, তাজা মাটন, বাছুরের মাংস আর কেক আছে আমার বাসায়। আর এত এল আছে, যা তোমরা সারা বছর খেয়েও শেষ করতে পারবে না।'

'ঠিক আছে,' রবিন বলল। 'আজ আমরা তোমার অতিথি, আগামীকাল তোমরা শেরউডে আমাদের অতিথি হবে।'

'নিশ্চয়ই !' সানন্দে রাজি হলো জর্জ।

'আমিও যাব,' বেট্রিস বলল। 'মেরিয়ানের মত পোশাক পরে।'

উইল স্কারলেটের বিপদ

শূটিং প্রতিযোগিতার বুদ্ধি মাঠে মারা গেছে। তাই নতুন এক সিদ্ধান্ত নিল শেরিফ। একদিন শহরে সমস্ত কনস্টেবল, নগর রক্ষী আর বনরক্ষী আছে, সবাইকে ডেকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম পরে নিয়ে তৈরি হতে নির্দেশ দিল সে।

'এবার আমাদের সমস্ত শক্তি এক করে শেষবারের মতো ডাকাতটাকে ধরার চেষ্টা করে দেখতে হবে। সবাই বর্ম পরে নাও। প্রতি মুহূর্তের জন্যে ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক সাথে রাখবে। চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শেরউডের প্রতিটা রাস্তা, প্রতিটা মেঠোপথ আর বুনোপথের কাছে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। যদি রবিনের বড় কোন দলের সামনাসামনি পড়ে যাও, শিঙা বাজিয়ে ধারেকাছের দলগুলোকে ডেকে নিয়ে একজোট হয়ে আক্রমণ চালাবে।

'যে আমার সামনে জ্যান্ত বা মৃত রবিনহুডকে হাজির করতে পারবে, তাকে অনেক পুরস্কার দেয়া হবে। তাছাড়া ওর দলের আর কাউকে ধরে আনতে পারলেও নগদ পুরস্কার আছে–তাদের বেলায় মাথাপিছু চল্লিশ পাউন্ড করে দেয়া হবে। এই কাজ ছাড়া আপাতত তোমাদের আর কোন কাজ নেই। কিছুদিনের জন্যে অন্য সব কাজ বাতিল। যাও, যেভাবে পারো ধরে নিয়ে এসো রবিনহুডকে।'

পাঁচজন করে রক্ষী নিয়ে মোট ষাটটি দল তৈরি করা হলো। অস্ত্রেশস্ত্রে পূর্ণ সজ্জিত হয়ে সাড়ম্বরে শেরউডের দিকে রওনা হয়ে গেল তারা। সবাই মনে মনে আশা করছে–পুরস্করটা হয়তো তার কপালেই আছে। একনাগাড়ে সাতদিন সাতরাত পাহারা দিল রক্ষীরা। শেরিফের নির্দেশমত বনের প্রতিটা রাস্তায়, মেঠোপথ ও বুনোপথের কাছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে ধৈর্যের সাথে ওঁৎ পেতে বসে থাকল।

কিন্তু ডাকাতদলের কারও দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, এক টুকরো লিঙ্কন গ্রিনও চোখে পড়ল না কারও। কারণ আগেই শেরিফের উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে রবিন এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। নিজে তো খোলা জায়গায় বের হয়ইনি, দলের আর কাউকেও বের হতে দেয়নি।

'অহেতুক রক্ত ঝরানো পছন্দ করি না আমি,' এ প্রসঙ্গে বলেছে রবিনহুড। 'শেরিফের রক্ষীদের সাথে মুখোমুখি লড়াই বাধলে আমরাই জিতবো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু তাতে দু'দিকেরই অনেক মানুষ হতাহত হবে। অনেক মেয়ে তাদের স্বামীকে হারাবে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাদের বাবাকে হারাবে। তাই এড়ানো সম্ভব হলে যুদ্ধে জড়াতে চাই না আমি। কতোদিন আর টহল দেবে ওরা ? একদিন না একদিন হয়রান হয়ে ফিরে যাবেই। ততোদিন আমরা আস্তানা ছেড়ে বের হবো না। সবার ভালোর জন্যে এটা করবো আমরা। কিন্তু তারপরও যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেই হয়, জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করব। ওদেরকে দেখিয়ে দেব যুদ্ধ কাকে বলে।'

নেতার এই গা ঢাকা দেয়ার পরিকল্পনা দলের অনেকেরই পছন্দ হয়নি। কেউ কেউ আড়ালে মন্তব্য করেছে, 'শেরিফ তাহলে আমাদেরকে ভীরু, কাপুরুষ ভাববে। দেশের মানুষ ভাববে, কাপুরুষ রবিনহুডের শেরিফের মুখোমুখি হওয়ার সাহসের অভাব আছে।'

তবে মুখে যে যা-ই বলুক, রবিনের নির্দেশ বিনা ওজরে মেনে নিল সবাই। আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে সাতদিন, সাতরাত আত্মগোপন করে থাকল। কেউ মুখ দেখালো না বাইরে। আটদিনের দিন সকালে আবার সবাইকে ডেকে পাঠালো রবিনহুড।

'ব্যাটারা এসেছে তো অনেকদিন হলো,' বলল ও। 'এবার খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার এখনও আছে কিনা, থাকলে কি করছে। আমার তো মনে হয় এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে ওরা। তোমাদের মধ্যে কে যাবে দেখে আসতে ?'

একযোগে হই-হই করে উঠল একশো চল্লিশজন অনুচর–সবাই যেতে চায়। তাদের সাহস দেখে গর্বে বুক ভরে উঠল রবিনের। 'সবাইকে পাঠানো সম্ভব নয়,' বলল ও। 'যে কোন একজনকে যেতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে অত্যন্ত সাহসী, বীর। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কাজে সবচে' বেশি প্রয়োজন চতুরতার। তাই বুড়ো শেয়ালের মতো চতুর কাউকে দরকার। আমি স্কারলেটের নাম প্রস্তাব করছি এ কাজে।'

খুশি হলো উইল এত মানুষের মধ্যে থেকে তাকেই বাছাই করা হয়েছে দেখে। 'ধন্যবাদ, রবিন,' বলল সে। যদি ব্যাটাদের খবর জেনে আসতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমার নামই নেই।'

সবুজ ইউনিফর্মের ওপর যাজকের ঢোলা আলখাল্লা পরল সে। তলোয়ারটা তার নিচে এমনভাবে ঝুলিয়ে নিল যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়, অথচ প্রয়োজনের সময় এক টানে বের করে আনা যায়। তারপর মাথার হুড সামনের দিকে বেশ খানিকটা টেনে দিয়ে লাঠি নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল সে।

কিছুদূর যেতে না যেতেই রক্ষিদের দু'টো দল চোখে পড়ল তার। ভারি অবাক হলো ব্যাটারা এখনও আগের মতই কড়া পাহারা দিয়ে চলেছে দেখে। তখনই ফিরে যেতে চাইছিল সে, কিন্তু পরে ঠিক করল তার আগে একবার ব্লু বোর থেকে ঘুরে আসবে। ওটার মালিকের কাছ থেকে শেরিফের তরফের নতুন কোন খবর আছে কি না, জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আসবে। দু'হাত বুকে বেঁধে পথের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল উইল, ভাবখানা গভীর কোন চিন্তায় ডুবে আছে।

সরাইখানায় শেরিফের কয়েকজন রক্ষীকে মদ পান করতে দেখল সে। তাদের পাশ কাটিয়ে নীরবে ভেতরে ঢুকল, এক কোনায় গিয়ে হাতের লাঠির ওপর ভর দিয়ে মাথা নত করে ধ্যানমগ্নের মত বসে থাকল। ঈডমকে একা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে আসলে। ঈডম ওর দিকে তাকাল এক পলক, কিন্তু চিনতে পারল না। অচেনা কোন যাজক ভেবে নিল ওকে। বিশ্রাম নিচ্ছে। তা নিক।

কেউ ক্লান্ত হয়ে এখানে একটু জিরিয়ে নিলে তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু সে না চিনলেও তার পোষা বিড়ালটা উইলকে চিনতে ভুল করল না। এখানে এলেই সব সময় ওকে আদর করে সে, এবারও সেই আশায় ওর দিকে এগিয়ে গেল বিড়ালটা। তার পায়ে গা ঘষতে লাগল। ঘষায় ঘষায় উইলের আলখাল্লা কিছুটা উঠে যেতে তলা দিয়ে লিঙ্কন গ্রিন বেরিয়ে পড়ল। সাথে সাথেই আলখাল্লা টেনে দিয়েছিল উইল, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে।

এক কনস্টেবল দেখে ফেলেছে ব্যাপারটা। যদিও তখনই কাউকে কিছু বলল না সে। মনে মনে ভাবল, ওই লোক কিছুতেই যাজক হতে পারে না। ও নিশ্চয়ই রবিনহুডের লোক। ব্যাটাকে কায়দা করে ধরতে হবে ভেবে বিনয়ের সাথে তাকে কাছে ডাকল সে।

'আসুন, ফাদার। দেখে মনে হচ্ছে আপনি খুব ক্লান্ত। আসুন, কয়েক ঢোক বিয়ার খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিন।'

মাথা নেড়ে আমন্ত্রণটা ফিরিয়ে দিল উইল। কেউ গলা চিনে ফেলতে পারে, তাই মুখ খুলতে সাহস হলো না। কিন্তু কনস্টেবল তাকে মুখ খুলতে বাধ্য করল। 'এতো গরমের মধ্যে কোথায় চললেন, ফাদার ?'

'তীর্থে যাচ্ছি।'

হেসে উঠল লোকটা। 'তা, ওই কাজে যেতে হলে আলখাল্লার নিচে লিঙ্কন গ্রিন পরে নিতে হয় বুঝি, ফাদার ? হা হা হা ! আমার চোখকে ফাঁকি দেবে ভেবেছো ? আমি জানি তুমি রবিনহুডের লোক। সাবধান ! এই তলোয়ার দেখেছো ? একটু নড়লেই এটা দিয়ে তোমার কলজে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবো।'

কথা শেষ করেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ব্যাপার বুঝতে পেরে আগেই সতর্ক হয়ে গেছে উইল। জোব্বার তলা থেকে এক ঝট্‌কায় নিজের তলোয়ার বের করে ফেলেছে। কনস্টেবলের আঘাত মাঝপথে ঠেকিয়ে

দিয়ে পাল্টা আঘাত করল সে। তারপর বিরতি না দিয়ে একের পর এক আঘাত করেই চলল। দেখতে দেখতে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে উঠল কনস্টেবল। সারা গা দিয়ে দরদর করে রক্ত গড়িয়ে নামছে। অল্প সময়ের মধ্যেই শক্তি হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা।

এই সুযোগে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল উইল, কিন্তু পারল না। কারণ মাটিতে পড়েই ওর পা জড়িয়ে ধরেছে লোকটা। সাথে সাথে তার তিন-চারজন সঙ্গী ছুটে এসে ঘিরে ফেলল উইলকে। তার মধ্যে সবার আগে যে ছিল, তার মাথা সই করে প্রচণ্ড বেগে তলোয়ার চালাল সে। কিন্তু ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেল লোকটা–শিরস্ত্রাণে গভীর দাগের সৃষ্টি হওয়া ও মাথাটা একটু ঘুরে ওঠা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হলো না।

এদিকে প্রচুর রক্তপাতের ফলে জ্ঞান হারানোর অবস্থা হলেও কনস্টেবলের হাতের বাঁধন কিছুতেই আলগা করতে পারল না। উইল যতো পা ছাড়ানোর চেষ্টা করে, সে-ও ততো জোরে আঁকড়ে ধরে। তবু হার মানল না সে, একাই চারজনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এভাবে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হলো না।

পিছন থেকে কেউ মাথায় আঘাত করতে মাথা ফেটে দরদর করে রক্তের ধারা নামল। তাজা রক্তে চোখমুখ ভিজে একাকার হয়ে গেল উইলের, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। পড়ে গেল সে, তলোয়ার ছুটে গেল হাত থেকে। এবার সব ক'জন রক্ষী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল উইলের ওপর, অনেক ধস্তাধস্তির পর কোনরকমে আটক করল তাকে।

ওদিকে গ্রিনউড গাছের নিচে বসে উইলের কথাই ভাবছিল রবিন। তার দেরি দেখে উদ্বিগ্ন। এমন সময় দুই অনুচরকে তারই দিকে ছুটে আসতে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার দিকেই আসছে লোক দুটো। তাদের মাঝখানে রয়েছে ব্লু বোরের ইয়া মোটা পরিচারিকা মেকেন। ওদের দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল রবিনের। বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই এখন কোন অশুভ খবর শুনতে হবে। ভাবনাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, তাদের একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'উইল স্কারলেট ধরা পড়ে গেছে।'

'খবরটা কে এনেছে, তুমি ?' মেয়েটাকে প্রশ্ন করল ও।

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা দোলাল মেকেন। 'হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখেছি পুরো ঘটনা। বীরের মতো লড়াই করে ধরা পড়েছে উইল। অনেক রক্ত পড়েছে। ওকে হাত-পা বেঁধে নটিংহ্যামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাল নাকি ফাঁসি দেয়া হবে। খবরটা তোমাদেরকে জানাতে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি।'

'ওর ফাঁসি হবে না !' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল রবিনহুড। 'অন্তত আমরা বেঁচে থাকতে নয় !' বলে শিঙায় তিনটা ফুঁ দিল। দেখতে দেখতে লিঙ্কন গ্রিনে ছেয়ে

গেল চারদিক। দলের একশো চল্লিশজন অনুচর চোখের পলকে বন থেকে বেরিয়ে ঘিরে ধরল ওকে।

'তোমরা সবাই শোনো। শেরিফের লোকেরা উইলকে ধরে নিয়ে গেছে। আগামীকাল নাকি নটিংহ্যামে ওর ফাঁসি। ব্যাপারটা ঠেকাতে হবে যে করে হোক। উইলকে উদ্ধার করে আনতে হবে। ও আমাদের জন্যে অনেক বড় ঝুঁকি নিয়েছে, নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। প্রয়োজন হলে আমরাও ওর জন্যে তাই করবো। কিন্তু কাজটা ছেলেখেলা নয়, প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা আছে। এমনকি মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে, তাই কারও ওপর জোর খাটাতে চাই না আমি। লিটল জন আর আমি ওকে ছাড়িয়ে আনতে যাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে আরও কেউ যদি যেতে চাও, তাহলে হাত তোলো।'

মাত্র দু'টি শব্দ কানে এলো ওদের, 'আমিও যাবো !' প্রচণ্ড হুঙ্কারে পরিণত হয়ে গোটা শেরউড কাঁপিয়ে দিল ওই দুই শব্দ–কারণ দলের প্রত্যেকে একযোগে উচ্চারণ করেছে কথাটা। প্রত্যেকে বজ্রমুঠিতে মাথার ওপরে তুলে ধরে আছে যার যার তীর-ধনুক।

'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ,' বলল ও। 'বন্ধুর বিপদে যদি তাকে সাহায্যই করতে না পারলাম, তাহলে কিসের মানুষ আমরা ! ঠিক আছে। সবাই তৈরি হয়ে থেকো। কাল খুব ভোরে রওনা করতে হবে।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই ছদ্মবেশ ধরে তৈরি হয়ে নিল ওরা, তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পথে নটিংহ্যামের দিকে রওনা হলো। কথা থাকল, শহরের বাইরে এক জংলা উপত্যকায় মিলিত হবে সবাই। জায়গামত সমবেত হয়ে রবিন বলল, 'আগে শহরের খবর জানতে হবে। ওরা কোথায় কিভাবে কাজ সারতে যাচ্ছে, না জানতে পারা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে থাকো সবাই, শহরে ঢোকার গেটগুলোর দিকে নজর রাখো। একা কাউকে বের হতে দেখলেই তার সাথে কথা বলতে হবে।'

নির্দেশমত লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল তারা। ঘাপটি মেরে বসে থাকল। বেলা একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। কিন্তু শহর থেকে কাউকে বের হতে দেখা যাচ্ছে না। রবিন ভাবল, হয়তো উইলের ফাঁসি দেখার জন্য অপেক্ষা করছে শহরবাসী। ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত বের হবে না। অপেক্ষা করতে করতে কারও দেখা পাওয়ার আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছে ওরা, তখনই এক হাড্ডিসার বুড়োকে শহর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। পরনে পাদ্রিদের আলখাল্লা। দেখে মনে হয় তীর্থে যাচ্ছে।

নগর-প্রাকারের ধার ঘেঁষে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে লোকটা। পাশে বসা ডেভিডের পাঁজরে কনুই দিয়ে মৃদু গুঁতো মারল রবিন। বলল, 'যাও, লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখো উইলের কোন খবর পাওয়া যায় কি না।'

আড়াল ছেড়ে এগিয়ে গেল তরুণ। লোকটাকে অভিবাদন জানিয়ে বিনয়ের সাথে জানতে চাইল, 'হোলি ফাদার, উইল স্কারলেটের কোন খবর জানেন ? আমি অনেক দূর থেকে এসেছি বদমাশ ডাকাতটার ফাঁসি দেখব বলে। ওর ফাঁসি কখন, কোথায় হবে বলতে পারেন ?'

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল বৃদ্ধের। ডেভিডের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'ছি, ছি ! একজন ভালো মানুষকে বিনা অপরাধে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে, আর তুমি সেটাকে তামাশা ধরে নিয়ে দেখতে এসেছো ?' হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকল সে। 'অন্যায় কথা ! ভারি অন্যায় কথা ! ও কি এমন অপরাধ করেছে যে ফাঁসি দিতে হবে ? গোল্লায় যাবে সব। এই আমি বলে রাখছি, সব গোল্লায় যাবে। জিজ্ঞেস করলে, তাই বলছি, আজ সূর্যাস্তের আগে নগর-প্রাচীরের বাইরে নিয়ে আসা হবে উইলকে। ওই তিন রাস্তার মাথায় ফাঁসি দেয়া হবে, যাতে তাই দেখে আর সব ডাকাত সতর্ক হয়।

'কিন্তু ডাকাত কাদের বলতে চাইছো তুমি ? রবিনহুডকে ?' ডান-বাঁয়ে মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'না, বাপু। ধন-সম্পদ সে কেড়ে নেয় ঠিকই, কিন্তু কাদের ধন-সম্পদ ? যতোরকম অসৎ আর নিষ্ঠুর উপায়ে সম্ভব গরিবের রক্ত চুষে ধনী হওয়া পাজিদের সম্পদ। সে টাকা কোথায় যায় ? খবর নিলেই জানতে পারবে, এ অঞ্চলে যতো অক্ষম বৃদ্ধ, অসহায় বিধবা, পঙ্গু আর গরিব-দুঃখী আছে, অসচ্ছল কৃষক-শ্রমিক আছে, তাদের কল্যাণে খরচ হয়। সে টাকা দিয়ে রবিনহুড বছরের পর বছর ধরে সবার পেটের খিদে আর শীতের বস্ত্র জুগিয়ে আসছে।

'তারই এক অনুচরকে আজ ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছে নিষ্ঠুর শেরিফ, ভাবতেই বুক ফেটে যাচ্ছে। তাই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। যদি জানতাম রবিনহুড কোথায় থাকে, আমি নিজে গিয়ে তাকে খবরটা জানিয়ে আসতাম। তাকে বলতাম, তোমার এক সহকর্মীকে অন্যায়ভাবে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে। তুমি যেমন করে পারো তাকে উদ্ধার করো।'

কথা শেষ করে নিজের পথে পা বাড়িয়েছিল বৃদ্ধ, কিন্তু তিন কদম গিয়েই যুবকের মন্তব্য শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। 'আপনার কথা রবিনের কানে পৌঁছে যাবে, ফাদার,' পিছন থেকে বলল সে। 'আমার মনে হয়, নিজের লোককে উদ্ধার করতে রবিনের চেষ্টার কোন কমতি থাকবে না। চিন্তা করবেন না, ফাদার। আজ যদি উইল স্কারলেটের ফাঁসি হয়েই যায়, রবিনহুড তার উপযুক্ত প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে।'

বুড়ো পাদ্রি তাকিয়ে দেখল দৃঢ়পায়ে চলে যাচ্ছে ছেলেটা। তার ঋজু ভাব-ভঙ্গি দেখে ধীরে ধীরে হাসি ফুটল তার মুখে। হাত তুলে বিড়বিড় করে তাকে আশীর্বাদ করে নিজের পথে চলে গেল সে। বুঝতে পেরেছে, এ ছেলে রবিনহুডের দলের না হয়েই যায় না। তার মানে ধারেকাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে রবিনহুড। বেশ, বেশ।

কিছুক্ষণ পর ডেভিডের মুখ থেকে শেরিফের ইচ্ছের কথা জানল রবিন। সবাইকে ডেকে বলল, 'আমার মনে হয়, উইলের ফাঁসি দেখতে দুপুরের পর থেকে আশেপাশের সবখান থেকে লোকজন আসতে শুরু করবে। আমরা তাদের সাথে মিশে শহরে ঢুকে পড়বো। কেউ যেন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখবে সবাই। সবাই সবার কাছাকাছি থাকবে। রক্ষীরা উইলকে নিয়ে তিন রাস্তার দিকে যাত্রা করলে আমরাও তাদের সাথে যাবো। তাদের যতোটা সম্ভব কাছাকাছি থাকবো।

'লিটল জনকে কি করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়েছি আমি। ও নিজের কাজ করতে থাকবে, কিন্তু তোমরা কেউ আমার শিঙার সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না। আর মনে রেখো, সঙ্কেত পেলেও কেউ অযথা রক্তপাত ঘটাতে যাবে না। বিনা প্রয়োজনে কাউকে আঘাত করবে না। আর যদি করতেই হয়, এমনভাবে করবে যাতে দ্বিতীয়বার করতে না হয়।

'খেয়াল রাখবে, আমাদের আসল উদ্দেশ্য উইল স্কারলেটকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়া। শেরিফকে বা তার লোকজনকে শায়েস্তা করা নয়। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে দল বেঁধে বনের দিকে সরে যেতে থাকবো আমরা। আমাদের কেউ হতাহত হলে তাকে ফেলে রেখে পালাবো না, কাঁধে করে নিয়ে যাবো। বুঝতে পেরেছ ?'

সবাই মাথা দোলাল।

পশ্চিমে ঢলে পড়তে লাগল সূর্য। নগর প্রাকারের ওপর থেকে বিউগল বেজে উঠল। শহরের লোকজন সব কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে এল। দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল রাজপথ–সবাই চলেছে তিন রাস্তার মাথায়। জানে, সেখানে আজ রবিনহুডের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী উইল স্কারলেটের ফাঁসি হবে। নগর প্রাচীরের তোরণ খুলে গেল ধীরে ধীরে। ধপধপে সাদা ঘোড়ায় চড়া শেরিফকে দেখা গেল সেখানে। সবার আগে শহর থেকে বেরিয়ে এলো সে, তার পিছন পিছন মার্চ করে আসছে রক্ষীর দল।

রক্ষীদের মাঝখানে ঘোড়ায় টানা দু' চাকার একটা গাড়িতে গলায় ফাঁস পরানো অবস্থায় বসা উইল স্কারলেটের। দু' হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। প্রচুর রক্ত হারানোর ফলে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। কয়েক গাছি চুল রক্তে জমাট বেঁধে খাড়া হয়ে কপালের ওপর ঝুলছে। বাইরে এসেই আশা নিয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল যুবক।

কিছু কিছু চেহারায় বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির ছোঁয়া দেখতে পেল বটে, কিন্তু তার মধ্যে চেনা মুখ একটাও নেই দেখে তার সমস্ত আশা-ভরসা ভারি সিসার মতো খুব দ্রুত অতলে তলিয়ে গেল।

তবু দমলো না উইল, মৃত্যু অবধারিত জেনেও মনকে শক্ত করল। শেরিফের উদ্দেশে বলল, 'স্যার শেরিফ। আমাকে এভাবে না মেরে লড়াই করে মরার সুযোগ

দিন। একটা তলোয়ার দিন আমাকে, তারপর আপনারা যতোজন খুশি আসুন, লড়াই করে মরি।'

'না হে,' শেরিফ মাথা নাড়ল। 'বীরের মৃত্যু তোমার মত একজনের কপালে নেই। তলোয়ার পাবে না। তুমি সাধারণ চোর-ডাকাতের মতো, মরতেও হবে তাদেরই মতো।'

'ঠিক আছে। অস্ত্র না হয় না-ই দিলেন, আমার হাতের বাঁধন অন্তত খুলে দিতে বলুন। খালি হাতেই যুদ্ধ করে মরবো।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল শেরিফ। 'কেন, ফাঁসিতে মৃত্যু ভালো লাগে না ? বুক কাঁপছে বুঝি ? রবিনহুডের দলে যোগ দেয়ার সময় এই ভয়টা কোথায় ছিল ? এখন খুব খারাপ লাগছে ?' আবার খিক্ খিক্ করে হাসল সে। 'না মিয়া, ফাঁসিতে ঝুলেই মরতে হবে তোমাকে। দাঁড়কাকেরা কোটর থেকে ঠুকরে ঠুকরে তুলে আনবে তোমার চোখ।'

রাগে মেজাজ চড়ে গেল উইলের। যা-তা বলে গালাগালি শুরু করে দিল শেরিফকে। 'কাপুরুষ কোথাকার ! নিচ, নরকের কীট, বদমাশ ! তুমি ভেবেছো আমাকে ফাঁসি দিলেই রবিনহুডকে দমন করা যাবে ? সে সাধ্য তোমার অন্তত নেই, শেরিফ। থাকলে তোমাকে নিয়ে লোকে আড়ালে হাসাহাসি করতো না। তোমার গাধামি দেখে ঠাট্টা করত না। আজ তুমি যা করছো, রবিনহুড তার ফল তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দেবে মনে রেখো।'

'তাই নাকি ?' রেগে উঠল শেরিফ। 'তা কোথায় আছে সে ? এতোই যদি বাহাদুর হয়ে থাকে, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে না থেকে এগিয়ে আসছে না কেন ? সে যা হোক, এই ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্যে তোমার শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ফাঁসির পর তোমার হাত-পা, মাথা আর ধড়, সব কেটে আলাদা আলাদা করা হবে।'

বিশাল তোরণের সামনে এসে পৌঁছল দলটা। খোলা গেট দিয়ে বাইরে তাকাল উইল, প্রকৃতির অপূর্ব রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। কি মনোরম দৃশ্য ! যতোদূর চোখ যায়, ঘন সবুজ ঘাসে ছেয়ে আছে পাহাড়, টিলা, ঢিবি আর মাঠ। অনেক দূরে আবছামত দেখা যাচ্ছে শেরউডের বিশাল সমস্ত ওক গাছের সারি। মাঠে, শস্যের ক্ষেতে লালচে রোদ গা এলিয়ে দিয়ে আছে। অনেক দূরে কিছু কুটির দেখা যাচ্ছে—লালচে আলোয় কি ভীষণ সুন্দর লাগছে ওগুলোকে। কি এক শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য !

কান পেতে পাখিদের গান আর দূর পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসা ভেড়ার ডাক শুনলো উইল স্কারলেটের। উড়ন্ত সোয়ালো পাখির ঝাঁক দেখলো। হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠলো তার। দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে এলো, গরম পানির ধারা নামলো দু' গাল বেয়ে। কতো মধুর, কতো মায়াময় এই পৃথিবী। অথচ সব ছেড়ে অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে তাকে।

চোখের পানি আড়াল করতে মাথা নামিয়ে নিল উইল স্কারলেট। তার এ কান্না ভয়ের নয়, ভালবাসার। কিন্তু লোকে যদি তা বুঝতে না পারে ? তাহলে রবিনহুডকে অসম্মান করা হবে ভেবে বাকি পথ মাথা নিচু করেই থাকলো সে। গেট দিয়ে বাইরে চলে এলো সবাই। একটু পর মুখ তুলল যুবক, সাথে সাথে বুকটা ধক্ করে উঠলো। আরে ! ভিড়ের মধ্যে অতি পরিচিত এক সহকর্মীকে দেখে চরম বিস্ময়ের সাথে ভাবল, ওই লোক এখানে কেন ?

জনতার ওপর আরেকটু ভালো করে নজর বোলাতেই খুশিতে দম আটকে এলো তার। শুধু একজন নয়, শেরউডের প্রায় প্রতিটি প্রিয় সহকর্মীই আছে এখানে–ছদ্মবেশ নিয়ে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রেখেছে শেরিফের রক্ষীদেরকে। আবার ধক্ করে উঠল বুকটা। ওদের মধ্যে প্রিয় নেতা রবিনহুডের মুখটাও পলকের জন্য দেখা গেছে ! আশেপাশের লোকদের কনুইয়ের গুঁতোয় সরিয়ে দিয়ে উইলের কাছে পৌঁছার চেষ্টা করছে।

'অ্যাই, ব্যাটারা !' ঠেলাঠেলি করতে থাকা একদল লোককে কষে ধমক লাগালো শেরিফ। 'এখানে এতো গুঁতোগুঁতি হচ্ছে কেন ? সরে যাও !'

'অ্যাই ব্যাটা, সরে যা সামনে থেকে ! ধাক্কাধাক্কি করছিস্ কেন, বদমাশ কোথাকার ! সরে যা !'

'তুই সর্, কুত্তার বাচ্চা !' পাল্টা খ্যাঁকানি মেরে উঠলো দৈত্যাকার মানুষটা, পরমুহূর্তে ঠাশ্ করে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল রক্ষীর গালে। মাথা ঘুরে দড়াম করে পড়ে গেলো লোকটা, পরক্ষণে এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়লো লিটল জন। বললো, 'বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে তোমার, উইল ? আর যদি যেতেই হয়, তাহলে আমাকেও নিয়ে চলো। তোমার মতো বন্ধুর সাথে মরতে আমার আপত্তি নেই।' দুই জোর পোঁচে তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল সে, অমনি এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো উইল।

'আরে, আরে ! বন্দির বাঁধন কেটে দিল ওই লোকটা কে ?' চিৎকার করে উঠলো শেরিফ। 'ধরো ব্যাটাকে ! ধরো, ধরো !' বলতে বলতে নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে তেড়ে গেল সেদিকে, তলোয়ারটা এক ঝট্কায় খাপমুক্ত করেই লিটল জনের গলা সই করে চালালো। কিন্তু সময়মতো নিজের তলোয়ার বের করে তার মারটা ঠেকিয়ে দিল জন। ইচ্ছে করলে তখনই শেরিফের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারতো, কিন্তু তা না করে বাঁ হাতে তার অস্ত্র ধরা হাতের কব্জি চেপে ধরে কষে এক মোচড় দিল। ব্যথা পেয়ে বাপ্ বাপ্ বলে তলোয়ার ছেড়ে দিল শেরিফ। সেটা তুলে নিয়ে উইলের দিকে এগিয়ে দিল জন।

'নাও, ধরো। শেরিফ এটা তোমাকে ধার দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি আমার পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়াও। ব্যাটাচ্ছেলেদের কচুকাটা করে পথ তৈরি করে সরে পড়তে হবে।'

এ কথা শুনে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলো শেরিফ। 'ধরো ওদের ! সবাই মিলে একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ো ওদের ঘাড়ের ওপর।'

ঠিক এমন সময় রবিনের শিঙা বেজে উঠলো, এবং একই মুহূর্তে একটা তীর কোত্থেকে উড়ে এসে খটাং করে আছড়ে পড়ল শেরিফের ইস্পাতের হেলমেটের ওপর। ধাক্কাটা কোনমতে সামলে এদিক-ওদিক তাকাল শেরিফ, হতভম্ব হয়ে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়বে কি, নিজের নিজের জান বাঁচাতেই তো অস্থির হয়ে পড়েছে রক্ষীরা ! পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, গরিব দর্শকদের একটা অংশ হঠাৎ করে খেপে গেছে–রবিনের শিঙার সঙ্কেত পেয়ে—কেউ তলোয়ার, কেউ তীর-ধনুক বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রক্ষীদের ওপর।

ইস্পাতে ইস্পাতে ঠোকাঠুকির ফলে অনবরত ঠং ঠং শব্দ উঠছে চারদিকে, ছিটকে উঠছে আগুনের ফুল্‌কি। অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় থেকে থেকে ঝিলিক মারছে ইস্পাতের ফলা। শহরবাসীরা যে যেদিকে পারছে ভেগে যাচ্ছে–চারিদিকে পালাও পালাও ডাক উঠে গেছে।

ওদিকে আরও কয়েকটা তীর সাঁ সাঁ করে নিজের দিকে ছুটে এলো দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণল শেরিফ। তার মনে হলো, নিরস্ত্র অবস্থায় তীর খেয়ে মরার চেয়ে পৈতৃক প্রাণটা মুঠোয় নিয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। তাই নিজের বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করে চেঁচাতে লাগল সে, 'সরে এসো ! সবাই সরে এসো ! নইলে মারা পড়বে !' কথা শেষ করেই ঘোড়া ঘুরিয়ে পিঠটান দিল সে। নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না দেখার জন্য দাঁড়াল না।

ইচ্ছে করলে সেদিন শেরিফের দলের বেশিরভাগ লোককেই খতম করে দিতে পারতো রবিনের অনুচরেরা, কিন্তু তা না করে তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল। শেরিফকে প্রাণপণে ভাগতে দেখে পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল উইল। 'আরে, আরে ! যাচ্ছেন কোথায়, মাননীয় শেরিফ ? দাঁড়ান, দাঁড়ান। পালিয়ে গেলে রবিনহুডকে ধরবেন কি করে ?'

কিন্তু কে শোনে কার কথা ! তীর খাওয়ার ভয়ে পিঠ বাঁকা করে ঘোড়ার পিঠের সাথে মিশে ঝড়ের গতিতে নগর-ফটকের দিকে ছুটলেন তিনি। নিশ্চিন্ত হতে পেরে লিটল জানের চওড়া দু' কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল উইল, চোখ দিয়ে দরদর করে পানি ঝরছে। প্রাণপ্রিয় বন্ধুকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার দু' গালে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল সে, কাঁদছে হাউমাউ করে।

কান্নার সাথে সমানে প্রলাপ বকতে লাগল যুবক। 'তোমরা সত্যিই আমার প্রাণের বন্ধু ! আমি তোমাদেরকে ভালোবাসি, লিটল জন। তোমাদের সবাইকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি আমি। আজ গর্বে আমার বুক ভরে গেছে, জন। ভাবতেই পারিনি এ জনমে তোমাদেরকে আবার কখনও দেখতে পাবো। এ জনমে তোমাদের...'

এত কথার কোন জবাব দিতে পারল না দৈত্যাকার মানুষটা। সে-ও কাঁদছে। রবিনহুড দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে ওদের কাণ্ড দেখে। কিছুক্ষণ পর উইলসহ দলের সবাইকে এক জায়গায় জড় করল ও, তারপর সবাই মিলে দ্রুত বনের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে তিন রাস্তার সংযোগস্থলে পড়ে থাকল শেরিফের দশজন আহত রক্ষী।

ওদিকে রবিনহুডের দুঃসাহস দেখে শেরিফ এবার সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তার বুঝতে একটুও অসুবিধে হলো না যে আজ ইচ্ছে করেই তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে রবিন। চাইলে তার কণ্ঠনালীতে একটা তীর খুব সহজেই ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারতো। ভাগ্যগুণে আজ মরতে মরতে বেঁচে আসতে পেরেছে সে।

সেদিনের সেই ঘটনার পর অনেকদিন আর ঘর থেকে বেরই হলো না শেরিফ। কারণ, যদিও কেউ তার মুখের ওপর কিছু বলেনি, তবু সে খেয়াল করেছে, তাকে দেখলেই লোকের চেহারা কেমন যেন হাসি হাসি হয়ে ওঠে।

শেরউডের ভোজ

হাতে করার মত কিছু না থাকলে মাঝে-মধ্যে খুব খারাপ লাগে রবিনের। শুয়ে-বসে থাকতে গিয়ে মন হাঁপিয়ে ওঠে। অবশ্য কাজ থাকে না মানে একেবারেই কিছু থাকে না, তা নয়। তার মধ্যেও দলের সদস্যদের নিয়মিত ড্রিল, কুস্তি, তলোয়ার ও লাঠি খেলা এবং শূটিং প্র্যাকটিস বাদ নেই–সেসব তদারকির কাজ থাকে। ওটা নিয়মিতই চলে গ্লেডে।

তারপরও মাঝে-মধ্যে করার কিছু থাকে না। তখন নানান চিন্তা আসে মাথায়। কারণ প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে ওদের। যে কোনদিক থেকে তা আসতে পারে। নটিংহ্যামের শেরিফের দিকে থেকে তো বটেই, স্যার গাই অভ গিসবোর্ন এবং এরকম আরও কোন কোন মহলের তরফ থেকেও আসতে পারে। তাই পূর্ণ সতর্ক থাকতে হয় ওদের সবাইকে।

স্নায়ু ছিলার মত টানটান থাকে সব সময়।

তখন আস্তানায় থাকতে ভাল লাগে না ওর। মনে হয় বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলে ভাল হয়–কোথাও কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে কি না, ঘুরেফিরে জানার চেষ্টা করা যায়। এরকম একদিন ঘুরতে বেরিয়েছে রবিনহুড ও লিটল জন। নটিংহ্যামমুখী রাজপথ ধরে হেঁটে চলেছে।

শেরিফকে একটু ভাল মত টাইট দেয়া দরকার, ভাবছে রবিন। আমার বিরুদ্ধে যা খুশি তাই করে চলেছে ব্যাটা। আমি চুপচাপ হজম করে গেলেও থামবে না ব্যাটা, তার নোংরা খেলা সে চালিয়েই যাবে। আচ্ছা, কোনভাবে লোকটাকে পাকড়াও করে ওদের আস্তানায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় ? কথাটা ভাবতেই মনে মনে হেসে উঠল রবিন।

কোন হারামখোর ব্যারন বা জমিদার, আর্ল বা নাইট অথবা বিশপ বা অ্যাবটকে হাতের মুঠোয় পেলে প্রথম চোটেই তাদের টাকা-পয়সা কেড়ে নেয় না ও, নেয় পরে। নিজেদের ডেরায় নিয়ে এসে ঘটা করে তাদেরকে খাওয়ানোর পর। শেরিফকেও একদিন সেরকম খাতির-যত্ন করলে মন্দ হয় না।

সেটা ধরে কিছুদূর এগোতে অল্প বয়সী এক যুবক মাংস বিক্রেতাকে দেখতে পেল রবিন। গাড়ি ভর্তি মাংস নিয়ে নটিংহ্যামের দিকে চলেছে।

'ওই দেখো কে আসছে,' লিটল জন বলল।

'কে ?' রবিন জানতে চাইল।

'ছেলেটা লাঠি খেলায় ভীষণ ওস্তাদ। সপ্তাহের দুই হাটের দিন এই পথ দিয়ে নটিংহ্যামে আসা-যাওয়া করে। কাউকে লাঠিপেটা করতে পারলে মনে হয় সবচে' বেশি খুশি হয় ও।'

'তাই নাকি ?' বলে কিছু ভাবল রবিন। 'সপ্তাহে দু'বার ! অথচ আমাদেরকে কোন খাজনা দেয়নি ?'

লিটল জান ঘুরে তাকাল ও মুখের দিকে। 'না।'

আবার কি যেন ভাবল ও। 'ফ্রায়ার টাক আর তোমার সাথে খেলাচ্ছলে লড়াই করা ছাড়া অনেকদিন হলো লাঠি নিয়ে কারও সাথে লাগতে যাইনি। দেখি, আজ ওর সাথে লড়ব।'

মাথা নাড়ল লিটল জন। 'সেটা ঠিক হবে না বোধহয়। আমি একটা স্বর্ণমুদ্রা বাজি ধরছি, ওর কাছে হেরে যাবে তুমি।'

'ঠিক আছে !' রবিন মৃদু হাসল। পথের পাশের এক ওক গাছ থেকে একটা মজবুত ডাল কেটে নিয়ে ওটাকে দোলাতে দোলাতে কসাইয়ের দিকে এগিয়ে গেল। যুবকের পথ আগলে দাঁড়াল।

'কে তুমি !' আগন্তুককে তার ঘোড়ার ব্রিডলে হাত রেখে দাঁড়াতে দেখে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কসাই। 'কি চাও আমার কাছে ?'

'তুমি অনেকদিন থেকে এই পথে আসা-যাওয়া করছ শুনলাম,' অমায়িক ভাবে বলল রবিন। 'অথচ আমাদের প্রাপ্য খাজনা দাওনি। সত্যি ? খুব খারাপ কথা। আজ সব শোধ করে দাও তাহলে।'

'নিজেকে কি মনে করো তুমি ?' ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত কয়েকবার চোখ বুলিয়ে নিল কসাই। 'বনরক্ষী, নাকি আর কিছু ? আমি নটিংহ্যামের শেরিফের চাকরি করি, জানো ? আমার সাথে এই আচরণের জন্যে সে তোমার চামড়া তুলে নেবে। আমার তোলার পর যদি কিছু বাকি থাকে অবশ্য ! মাথাটাও গুঁড়ো করে দেব।'

'আমিও রবিনহুডের দলের লোক,' বলল ও। 'যদি তুমি সোনার মুদ্রায় দেনা শোধ করতে না পারো, তাহলে গাড়ি থেকে নেমে এসো। লাঠি দিয়ে শোধ করে যাও।'

'ঠিক আছে !' বলেই একলাফে রাস্তায় নেমে পড়ল যুবক। তারপর লাঠিটা মাথার ওপর বন্ বন্ করে ঘোরাতে ঘোরাতে ওর দিকে ছুটে এল। রবিন প্রস্তুত হলো। বেধে গেল দুই ওস্তাদ লাঠিয়ালের দর্শনীয় লড়াই। দূরে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে থাকল লিটল জন। কাঠের সাথে কাঠের ঘনঘন সংঘর্ষের পটাপট্ শব্দ উঠছে—পরস্পরকে ঘিরে দ্রুত চক্কর খাচ্ছে রবিন ও কসাই। তালে তালে নাচছে। সুযোগ বুঝে এগিয়ে এসে মার লাগাচ্ছে।

একবার রবিন পিছায় তো পরেরবার কসাই বাধ্য হয়ে পিছিয়ে যায়। দু'জনের পায়ের তাড়নায় দেখতে দেখতে ধুলোর মেঘে চারদিক ভরে উঠল। তার মধ্যে কে কাকে মারছে বোঝা গেল না। শক্তি কমে আসতে লাঠি চালনার গতিও কমে এল ওদের। লিটল জন দেখল রবিনের এক চোখের নিচে খানিকটা জায়গা কালো হয়ে আছে। কসাইয়ের লাঠির খোঁচা খেয়েছে সম্ভবত।

তবে ওস্তাদের মারটা শেষ পর্যন্ত রবিনই মারল। ওর প্রচণ্ড এক মার ঠেকাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো কসাই, মারের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে।

'সোনার মুদ্রাটা তাহলে তোমার ভাগ্যেই জুটল !' লিটল জন হাসল।

'এই লোক খুব ভাল লাঠি চালাতে জানে,' রবিনহুড বলল। 'ওকে ওয়াইন দাও, লিটল জন। আমি জানি ওর মাথা আমার চেয়েও বেশি ভন্ ভন্ করছে।'

কসাই উঠে বসে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তারপর তাকাল রবিনের দিকে। 'ঠিক বলেছ ! বাপ্‌রে ! তুমি সাঙ্ঘাতিক এক লাঠিয়াল। আমার মনে হয় তুমি রবিনহুড। তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমিই রবিনহুড।

'তাহলে তোমার কাছে মার খাওয়া যায়,' স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল যুবক। 'তাতে লজ্জার কিছু নেই। তুমি এখন যা চাও, আমি তা খুশিমনে দিতে রাজি আছি।'

'না, না !' রবিন দ্রুত মাথা নাড়ল। 'আর কিছু দিতে হবে না। তোমার মাথা ফেটে যে অবস্থা হয়েছে, তাতেই সব দেয়া হয়ে গেছে। এবার আমাদের আস্তানায় চলো। তোমাকে খুশি করার জন্যে কি করা যায় দেখি।'

আস্তানায় নিয়ে কসাই যুবককে পেট ভরে ভাল ভাল খাবার খাওয়ানোর পর রবিন বলল, 'দেখো, বন্ধু ! আজ আমার কসাই হওয়ার বড় সাধ হয়েছে। তুমি কি দশ পাউন্ডে তোমার ঘোড়া, মাংসের গাড়ি আর মাংস বিক্রি করে আমাদের সাথে বনে থেকে যেতে রাজি আছ ?'

'নিশ্চয়ই ! খুশিমনে রাজি আছি।'

কেনাবেচা শেষে রবিনকে কসাইয়ের পোশাক গায়ে চাপাতে দেখে উইল স্কারলেট সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল। 'তুমি বিনা কারণে বিপদের মধ্যে নাক গলাও, রবিন।'

'এবার অন্তত না গলিয়ে উপায় নেই,' রবিন জবাব দিল। 'বনের একঘেয়ে জীবন অসহ্য লাগছে আমার। তাছাড়া বাইরে পৃথিবীতে কি চলছে, তা-ও জানতে হবে। শুনেছি আমাদের রাজা রিচার্ড নাকি ইউরোপের কোন দেশে বন্দি হয়ে আছেন। তাঁকে ছাড়াতে অনেক টাকা মুক্তিপণ লাগবে। কিন্তু যুবরাজ জন টাকা জোগাড় করার কোন চেষ্টা করছেন না। ব্যাপারটা ভাল করে জানতে হবে। ভয় নেই, উইল, আজ শেরিফও আমাকে চিনতে পারবে না।'

বাঁ চোখের ওপর একটা কালো পট্টি বেঁধে প্রস্তুতি শেষ করল রবিনহুড। তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে নটিংহ্যামের দিকে রওনা হয়ে গেল। চাকা ঘোরার সাথে তাল রেখে নানান শব্দ করতে লাগল কাঠের গাড়ি। দুপুরের পর নটিংহ্যাম বাজারে এসে পসরা সাজিয়ে বসল ও।

চেঁচিয়ে খদ্দের ডাকতে লাগল : 'মাংস এসে গেছে, মাংস। তাজা মাংস। নিয়ে যা-ও, এক পেনিতে এক পাউন্ড মাংস। তাজা মাংস।'

মাংস এত সস্তায় বিক্রি হচ্ছে শুনে হাটুরে লোকজন তাজ্জব হয়ে গেল। অন্য কসাইরা ভাবল, ব্যাটা এই পেশার হতে পারে না। হলেও নিশ্চয়ই অনেক দিন ব্যবসা করেনি। কারণ যে দামে বিক্রি করছে, তাতে ওর একারই পেট বাঁচবে না। বউ-বাচ্চার কথা না হয় বাদই থাকল।

শহরের যত গৃহিণী হাটে এসেছিল, এমন লোভনীয় দামে মাংস কেনার সুযোগ পেয়ে রবিনকে মাছির মত ছেঁকে ধরল তারা। খুব দ্রুত বিক্রি হয়ে যেত লাগল মাংস। এমন সময় শেরিফের স্ত্রীও হাটে এল। রবিনের মাংস একদম তাজা এবং অস্বাভাবিক সস্তা দেখে ওকে গাড়িসহ নিজের বাসায় নিয়ে এল সে। বাকি মাংস সবটুকু কিনে নিয়ে রবিনকে তাদের সাথে গলা ভেজাতে আহ্বান জানাল।

তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল রবিন। গলা ভেজানো আর গৃহকর্ত্রীর সাথে গল্পে গল্পে সন্ধে হয়ে আসতে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ও, কিন্তু শেরিফ এসে পড়ায় গৃহকর্ত্রী তার সাথে ডিনার খেয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। খেতে বসে অনেক কিছু জানতে পারল রবিন।

রিচার্ড যে সত্যি সত্যি ইউরোপের কোন জেলখানায় বন্দি আছেন, কথায় কথায় শেরিফ তা নিশ্চিত করে জানাল, যুবরাজ জন নিজে ইংল্যান্ডের রাজা

হওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। ওদিকে ব্লনডেল নামের এক বদমাশ ইউরোপে গেছে রিচার্ড কোথায় আছেন তা খুঁজে বের করতে। লোকটা আবার চারণ কবি। এইসব লোকের সুবিধে হলো, তারা শত্রু দেশে গেলেও নিরাপদে যেখানে খুশি যেতে পারে। মহামারীতে তার মৃত্যু কামনা করল শেরিফ।

'দেশের সব বড় বড় ব্যারন, লর্ড আর নাইটরা যুবরাজকে রাজা বলে মেনে নিতে রাজি আছেন?' রবিন প্রশ্ন করল।

বিষণ্ন মনে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'এ ব্যাপারে এখনও কিছুটা সমস্যা রয়ে গেছে। কেউ কেউ তাঁকে মানতে রাজি নয়। যেমন চেস্টারের আর্ল একজন। লোকটা যুবরাজকে সহ্যই করতে পারে না। তবে আরও অনেকে আছে ...'

ডিনার শেষে শেরিফ রবিনের কাছে জানতে চাইল, সে এত সস্তায় মাংস বিক্রি করে কিভাবে? ওর কাছে বিক্রি করার মত শিংওয়ালা অনেক পশু আছে মনে হয়? থাকলে সে কি বিক্রি করবে? মাংসা না, জ্যন্ত পশু। তাহলে শেরিফ নগদ টাকা দিয়ে কিনে নেবে।

'অবশ্যই আছে, মাস্টার শেরিফ!' রবিন বলল। 'পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আমি দুই-তিনশো পশু আর অনেক একর জমি পেয়েছি। আপনি যদি সেগুলো কিনে নিতে চান, আমি বেচতে রাজি আছি।'

আগ্রহের তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠল শেরিফ। 'কোথায় আছে সেগুলো?'

'এই তো, কাছেই।'

'তাহলে কাল তোমার সাথে ওগুলো দেখতে যাব আমি। পছন্দ হলে পুরো পাল ধরে কিনে নেব।'

***

রাতটা শেরিফের বাড়িতে খুব আরামের ঘুম দিয়ে কাটাল রবিন। তারপর সকালে শেরিফকে শিংওয়ালা পশুর পাল দেখাতে যাত্রা করার আগে পেট পুরে নাস্তা খেয়ে নিল। সাথে দেহরক্ষী হিসেবে মাত্র দু'জন লোক নিল শেরিফ। আরও বেশি নিতে চাইছিল, কিন্তু নিষেধ করে দিল ও। কারণ বেশি মানুষ থাকলে পশুগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে।

প্রথমে কিছু সময় শেরিফের অবস্থা দেখে মনে হলো তার মনোবল তুঙ্গে উঠে আছে। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা। অনবরত ঠাট্টা-মশকরা করছে রবিনের সাথে। কিন্তু যতই রবিন শেরউডের ভেতরের দিকে ঢুকে পড়তে লাগল, ততই নীরব হয়ে যেতে লাগল সে। খানিক পর পর অহেতুক চমকে উঠতে লাগল। আতঙ্কিত চোখে ঘনঘন এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। কথা বলা একদম প্রায় বন্ধই করে দিল সে। কিছু বলা হলে নিচু গলায় 'হ্যাঁ-না,' করে জবাব দেয়, নইলে একদম চুপ।

'আর কতদূরে, ভাই ?' এক সময় কোনমতে বলল সে। 'আমার ভয় করছে। এদিকে রবিনহুড নামে লোক থাকে !'

'বুঝেছি,' অহেতুক হা হা করে হেসে উঠল ও। 'আপনি আউটল রবিনহুডের কথা বলছেন তো ?

'একটু আস্তে কথা বলো, বাপু ! ওর পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে থাকবে না।'

এ কথায় জোরে হেসে উঠল রবিন। বলল, 'আপনি একদম চিন্তা করবেন না, মাস্টার শেরিফ। রবিনহুডকে আমি ভালো করে চিনি। তীর ছোড়ায় আমি ওর চেয়ে কোন অংশে কম নই। শুধু শুধু ভয় পাবেন না। আমারই মতো নিরীহ মানুষ সে।'

চট্ করে যুবককে এক নজর দেখে নিল শেরিফ। 'লোকটা শেরউডের কোথায় থাকে বলতে পারো ?'

'খুব পারি। এমনকি রবিনের গা ঢাকা দিয়ে থাকার সবচে' গোপন জায়গাটা কোথায়, তা-ও বলতে পারি।'

'আমাকে চিনিয়ে দিতে পারো জায়গাটা ?' আগ্রহের আতিশয্যে দম বন্ধ হয়ে এল শেরিফের। 'অনেক টাকা দেব তাহলে।'

'নিশ্চয়ই চিনিয়ে দেব। কিন্তু এখন চুপ করুন, আমার পশুগুলোর চারণক্ষেত্রে পৌঁছে গেছি আমরা। অপেক্ষা করুন, আমি শিঙায় ফুঁ দিয়ে রাখালদেরকে ওগুলোকে নিয়ে আসতে সঙ্কেত দিচ্ছি।'

বলে শিঙা তুলল রবিন। পরপর তিনবার ফুঁ দিল ওটায়। তারপর শেরিফের খানিকটা পিছনে গিয়ে অপেক্ষায় থাকল। বেশি দেরি হলো না, শুকনো পাতা গুঁড়ো হওয়ার ও ছোট ছোট শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ উঠল। তারপরই ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল বিশাল এক পাল লাল হরিণ। খোলা জায়গায় এসে শিং দোলাতে লাগল।

'কেমন লাগছে আমার শিংওয়ালা পশু, মাস্টার শেরিফ ? কি তাজা আর নাদুস-নুদুস দেখেছেন ? পছন্দ হয়েছে ?'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল নর্মান। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি কি ঠাট্টা করার জন্যে এতদূর নিয়ে এসেছ আমাকে ?'

শব্দ করে হেসে উঠল রবিন। এমন সময় অন্য এক ঝোপের আড়াল থেকে লিটল জনকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তার পিছন পিছন এল উইল স্কারলেট, মাচ, রেনল্ড, গোল্ডসবরোর উইলিয়াম এবং আরও কয়েকজন।

'নটিংহ্যাম সফর কেমন ছিল, প্রভু ?' রবিনের উদ্দেশে বিনয়ের অবতারের মত মাথা ঝুঁকিয়ে বলল লিটল জন। 'কসাই হিসেবে ব্যবসা কেমন হলো ?'

'চমৎকার হয়েছে !' বাঁ চোখের কালো পট্টি এবং বাকি ছদ্মবেশ খুলে ফেলল ও। 'তারওপর নটিংহ্যামের শেরিফকেও নিয়ে এসেছি দেখেছ তো ! উনি আজ আমাদের সাথে ডিনারে অংশ নেবেন।'

'তাঁকে স্বাগতম,' বলল দানবীয় আকৃতির লোকটা। 'আমি নিশ্চিত শেরিফ আমাদের ডিনারের উপযুক্ত মূল্য দেবেন !'

'নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই দেবেন,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমার কাছ থেকে তিনশো শিংওয়ালা পশু কেনার জন্যে নগদ টাকা নিয়েই এসেছেন শেরিফ। তাছাড়া এইমাত্র আমাদের গোপন গ্লেডের রাস্তা চিনিয়ে দেয়ার বিনিময়ে আরও অনেক টাকা দেবেন বলেও কথা দিয়েছিলেন।'

ওদের সবাইকে হাসতে দেখে রাগে পিত্তি জ্বলে গেল শেরিফের। রবিনের দিকে আগুনঝরা চোখে তাকিয়ে বলল, 'যদি জানতাম এই অবস্থা হবে, হাজার পাউন্ড দিলেও শেরউডে আসতাম না আমি।'

জবাব না দিয়ে লিটল জনের দিকে ফিরল রবিনহুড। 'এদের সবার চোখ বেঁধে ফেলো। আমাদের মাননীয় শেরিফের জন্যে শানদার ডিনারের ব্যবস্থা করা হোক। তারপর দেখব কি কি নিয়ে এসেছেন প্রিয় শেরিফ। হা, হা !'

শেরিফ এবং তার দুই থর-হরি দেহরক্ষীর হাত বেঁধে ফেলা হলো। শেরিফ একদম পাথরের মূর্তি বনে গেছে। একটা শব্দও বের হচ্ছে না তার মুখ দিয়ে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ঘন ঘন নিজের চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। কি করতে এসেছিল আর কি হয়ে গেল ভেবে দিশেহারা বোধ হচ্ছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

এরপর সবার চোখ বাঁধা হলো। হাত ধরে মূল আস্তানার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু শেরিফ ভাবল আর কিছু। তাদেরকে হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভেবে মন দমে গেল তার। সাথে টাকাকড়ি যা ছিল, তা তো গেছেই। ভাবছে সে, এবার প্রাণটাও নির্ঘাৎ যাবে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ সে নিজে একবার-দু'বার নয়, বহুবার বহু ষড়যন্ত্র করেছে রবিনহুডের বিরুদ্ধে। তাকে খতম করার চেষ্টা করেছে সে।

এখন ওরা তাকে বাগে পেয়েছে। ইচ্ছে করলে অতীতের সমস্ত দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিতেই পারে। মৃত্যুর কথা ভাবতেই হাত-পা অসাড় হয়ে এল শেরিফের।

মূল আস্তানায় নিয়ে এসে চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো তাদের। চোখ পিট পিট করে চারদিকে তাকাল শেরিফ। মাথার ওপরের বিশাল ওক গাছ, তার দু'পাশের দুই বিশাল আগুনের কুণ্ড জ্বেলে রান্নার আয়োজন, গুহা, অগভীর উপত্যকা, সব দেখল অবাক বিস্ময়ে। শেরউডের মধ্যে এতবড় একটা গ্লেড (ফাঁকা জায়গা) আছে, রবিনহুড সেখানে ঘাঁটি গেড়ে থাকে, ভাবতে গিয়ে বিস্ময় ক্রমেই বাড়তে লাগল তার।

তার বিস্ময় মনে মনে উপভোগ করল রবিন। শেরিফের সম্মানে লাঠি খেলার আয়োজন করা হলো। ওদিকে বাতাসে ভর করে ভেসে আসছে আগুনে হরিণ আর খাসি মোরগ রোস্ট করার ও মাংসের পুর দেয়া পিঠে ঝলসানোর অপূর্ব সুবাস। ভয় মুছে গেল মন থেকে। খুশি হয়ে উঠল শেরিফ। লাঠি খেলার চমৎকার কলা-কৌশল দেখে অজান্তেই হাতে তালি দিল সে।

এরপর শুরু হলো তীর-ধনুকের পালা। একের পর এক ওস্তাদ তীরন্দাজ এসে একশো ষাট গজ দূরের লক্ষ্য অনায়াসে ভেদ করতে লাগল।

কিন্তু তাতে খুশি না হয়ে উল্টে মনমরা হয়ে পড়ল শেরিফ। নটিংহ্যামে কিছুদিন আগে হয়ে যাওয়া শূটিং প্রতিযোগিতায় রবিনহুডই যে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে, সেরা পুরস্কারটা নিয়ে এসেছে, তা জানতে পেরে আফসোসের সীমা থাকল না তার। অথচ সে কি না ভাবছিল কাপুরুষ রবিনহুড ভয়ে অংশ নিতেই যায়নি।

এই তাহলে সেই ভিখারি !

পুরস্কার পাওয়া সোনার তীরটার দিকে দেখতে পেল শেরিফ। গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

তারপর গান-বাজনার আয়োজন করা হলো। অল্প সময়ের মধ্যে আসর জমে উঠল। চমৎকার আবহ তৈরি করল সুরের মায়াজাল। রান্না শেষ হতে কয়েকজন এসে কাঠের পায়া বসিয়ে দিয়ে গেল। আরেক দল এসে তার ওপর তক্তা বিছিয়ে টেবিল পাতার কাজ সম্পন্ন করল। লম্বা এক সারিতে পাতা হলো টেবিল। বসার জন্য একই উপায়ে টুল পাতা হলো।

সবাই টেবিলের দু' পাশে লাইন দিয়ে বসে পড়তে চমৎকার মদ পরিবেশন করা হলো প্রথমে। তারপর শুরু হলো আসল পর্ব। সেটা যখন শেষ হলো, তখন সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। ম্লান চাঁদ দেখা দিয়েছে।

শেরিফ বলল, 'তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। তোমাদের সবার আন্তরিক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। এত চমৎকার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করায় অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবার যেতে হয়। সন্ধে হয়ে এলো, আরও দেরি করলে অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলব।'

'যেতে তো হবেই,' বলল রবিন। 'যান তাহলে, বাধা দেব না। কিন্তু কিছু একটা মনে হয় ভুলে যাচ্ছেন আপনি।'

'কিছু ফেলে যাচ্ছি ? কই, না তো ! কিছুই তো ফেলে যাচ্ছি না আমি !' না বোঝার ভান করল শেরিফ। কিন্তু রবিনের মতলব টের পেয়ে ভেতরে ভেতরে মনটা দমে গেল।

'ফেলে যাচ্ছেন বলিনি, স্যার শেরিফ। আমি আসলে বলতে চেয়েছি, ভুলে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের এখানে যে-ই অতিথি হোক, ভোজের খরচটা তার দিয়ে যাওয়ার নিয়ম আছে ?'

'আচ্ছা, এই কথা ?' হেসে উঠল শেরিফ। যদিও নিষ্প্রাণ, শুধু দাঁত দেখানো হাসি হয়ে গেল সেটা। 'সে তুমি বলার আগেই ঠিক করে রেখেছি আমি, যাওয়ার সময় সে জন্যে বিশ পাউন্ড দিয়ে যাব।'

'এ কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না দয়া করে,' রবিনহুড বলল। 'আপনি বিশ পাউন্ড দিলে কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না আমি। কিপ্‌টে মেহমান নিয়ে আসার জন্যে সবাই আমাকে ছি ছি করবে। তাছাড়া আপনি রাজার এতবড়

একজন কর্মকর্তা, এই সামান্য টাকা দেয়া কি আপনার সাজে ? আমার ধারণা এ ক্ষেত্রে শ পাঁচেক পাউন্ড হলে তবু কোনরকম মানায়। তোমরা কি বলো ?'

'নিশ্চই, নিশ্চই !' চেঁচিয়ে সায় দিল সবাই।

আঁতকে উঠল শেরিফ। চোখ কপালে তুলে বলল, 'পাঁচশো পাউন্ড ! তোমার কি মনে হয় এই ফালতু খানার দাম তিন পাউন্ডের চেয়ে এক পেনিও বেশি হতে পারে ?'

গম্ভীর হয়ে গেল রবিনহুড। 'ওভাবে বলবেন না, স্যার শেরিফ। আপনাকে আমার ভালো লাগলেও আমাদের মধ্যে কারও কারও লাগে না। উইল স্কারলেটের কথাই ভাবুন। ওই যে, যাকে ক'দিন আগে ফাঁসিতে ঝোলাতে যাচ্ছিলেন আপনি। এরকম আরও দু'জনের কথা বলা যায়, যারা নটিংহ্যামের যুদ্ধে আহত হয়েছিল। ওদের মধ্যে আপনার জন্যে কোন ভালোবাসা নেই, আছে বরং উল্টোটা। কাজেই ওদেরকে শান্ত করতে যদি কিছু বেশি খরচ করতেই হয়, নিজের ভালর জন্যেই আপনার তা করা উচিত।

লিটল জনের দিকে ফিরল ও। 'শেরিফের কাছে কত টাকা আছে দেখো।'

এগিয়ে এল বিশালদেহী দানব। মাটিতে এক খণ্ড কাপড় বিছিয়ে শেরিফের পকেট-পাউচ হাতড়ে টাকা যা পেল, সব রাখল তার ওপর। গুনে দেখা গেল নগদ প্রায় পাঁচশো পাউন্ড।

সন্তুষ্ট মনে মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'মনে মনে যা চাইছিলাম, তাই আছে দেখছি। টাকাটা আমরা রেখে দিচ্ছি মাস্টার শেরিফ। আপনাদের সুন্দর ঘোড়া তিনটাও রেখে দিচ্ছি, আমাদের কাজে আসবে। মাস্টার শেরিফ তার লোকদের নিয়ে আজ হেঁটে নটিংহ্যামে যাবেন। তাতে রাজার হরিণের মাংস তাড়াতাড়ি হজম হবে। তাছাড়া হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল। শেরিফের স্ত্রীর জন্যে উপহার হিসেবে নিজের তৈরি কোন সূচিকর্ম দিয়ে দাও, মেইড মেরিয়ান। মহিলা যথেষ্ট যত্ন করেছেন আমার।'

এবার আরেকবার তাদের হাত আর চোখ বাঁধা হলো। নটিংহ্যামমুখী রাস্তায় পৌঁছে দেয়া হলো ধরে ধরে। রবিনহুড সেখানে বিদায় জানাল শেরিফকে।

'তুমি বেশিদিন আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে থাকতে পারবে না, রবিনহুড !' আঙুল তুলে ওকে শাসাল লোকটা। রাগে কাঁপছে। ঘন ঘন মুঠো পাকাচ্ছে আর খুলছে। 'তোমাকে শায়েস্তা না করে ছাড়ব না আমি। এবার অনেক বড় সৈন্য বাহিনী নিয়ে শেরউডে আসব মনে রেখো। তোমাদের সবাইকে ধরে এই রাস্তার পাশের গাছগুলোতে লাইন দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাব। আর তোমার মাথা কেটে নটিংহ্যামের গেটের ওপর শুকাতে দেয়া হবে।'

রবিন শান্ত গলায় জবাব দিল, 'পরেরবার যখন এখানে আসবেন, শেরিফ, মনে রাখবেন, এবারের মত এত সহজে ফিরে যেতে পারবেন না। যখন খুশি আসতে পারেন আপনি। আমরা প্রস্তুত থাকব।'

শেরিফ চলে যেতে গোপন গ্লেডে ফিরে এল রবিনহুড। কসাই যুবক অপেক্ষা করছে সেখানে। তার নাম গিলবার্ট-অভ-দ্য-হোয়াইট-হ্যান্ড। তাকে তার ঘোড়া ও গাড়ি ফিরিয়ে দিল রবিন। 'এই নাও তোমার জিনিস। হাটের দিনটা ভালই ব্যবসা করলাম। কিন্তু এসব বারবার করা ঠিক হবে না।'

মাথা নাড়ল যুবক। 'আমি আর মাংস বিক্রি করব না। তোমার দলের একজন হয়ে গ্রিনউডেই থেকে যাব। এখন তীর ছুড়তে পারি না আমি। বউ-বাচ্চা ক্ষুধার্ত ছিল বলে একবার একটা হরিণ শিকার করেছিলাম, তার শাস্তি হিসেবে আমার ডান হাত পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এই দেখো, সাদা হয়ে আছে হাত। তখন থেকেই আমার নাম হয়েছে গিলবার্ট-অভ-দ্য-হোয়াইট-হ্যান্ড। সে যা হোক, আমি লাঠিতে কেমন, সে তো তুমি নিজেই দেখেছ।'

'দেখেছি,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তোমাকে দলে স্বাগত জানাতে পেরে আমি খুব আনন্দিত, গিলবার্ট।'

দুঃখী নাইট

একে একে দিন যায়। রূপালি বৃষ্টি, ঝলমলে রোদ, সবুজ বন, মাঠ-প্রান্তর আর সুন্দর সুন্দর ফুলের সমাহার নিয়ে বসন্ত আসে শেরউডে, চলে যায়। তারপর গ্রীষ্ম আসে গা জ্বালানো হলদেটে রোদ, ভ্যাপসা গরম, দীর্ঘ গোধূলি ও পাহাড়ি পরিদের কোমল রাত নিয়ে–চলে যায়। তারপর আসে শরৎ–ফসল ওঠে, সবার মনে খুশি খুশি ভাব। চলতে থাকে আসন্ন শীতের প্রস্তুতি।

বনের সবুজ পাতা বিবর্ণ হয়ে ক্রমে খয়েরি হয়ে উঠতে থাকে, তারপর উত্তর থেকে শীত নিয়ে আসে হিমেল হাওয়া। তার সাথে আসে তুষার, বাক্স থেকে বের করা হয় স্মৃতি জড়ানো গরম জামা-কাপড়, ঘরের কোণের চুলায় আগুন গন-গন করে দিন-রাত। কালের পরিক্রমা এভাবেই চলতে থাকে। প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে শীত বসন্ত গ্রীষ্ম ও শরৎ–অতীতে যেমন এসেছে, এখনও তেমনি আসে, আগামীতেও তেমনি আসবে।

কিন্তু মানুষ পৃথিবীতে একবারই আসে। আবার যখন যায়, চিরকালের জন্যই যায়। কেউ যায় গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতার মত–কেউ বা কিছু কথা, কিছু স্মৃতি রেখে যায়।

এক সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠে ডান হাত লিটল জনকে ডাকল রবিনহুড। 'আজকের বাতাস কি তাজা খেয়াল করেছো ?' বলল ও। 'চলো, সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি আমরা। তুমি একদল নিয়ে পুবে যাও, আমি আরেক দল নিয়ে পশ্চিমে যাই। দু' দলই যদি ভোজের জন্যে মেহমান নিয়ে আসতে পারি, তাহলে দারুণ হবে।'

খুশি হয়ে উঠল লিটল জন। 'ঠিক বলেছো। এখনই রওনা করছি আমি। মেহমান না নিয়ে আজ ফিরবো না।'

রবিন ও জনের নেতৃত্বে দু'দল দু'দিকে যাত্রা করল। রবিনের সাথে থাকল উইল স্কারলেট, মাচ, ওয়াটসন, অ্যালান-এ-ডেল ও আরও অনেকে। রান্নাবান্নার যাবতীয় আয়োজন করবে ফ্রায়ার টাক। তাকে সাহায্য করতে কুড়িজনের মতো রয়ে গেল আস্তানায়, বাকিদের সবাই হয় রবিনের সাথে গেল, নয়তো লিটল জনের সাথে।

নিজ দলের আগে আগে হাঁটছে রবিন। অন্যরা ওকে অনুসরণ করছে। মাঝে মধ্যে বন ছেড়ে খোলা উপত্যকায় এসে পড়েছে রাস্তা, ফসলের খেত আর লোকালয়ের পাশ কাটিয়ে আবার ফিরে গেছে বনে। হাঁটতে হাঁটতে ম্যান্সফিল্ড শহর ছেড়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে গেল।

বন ছেড়ে উন্মুক্ত জায়গায় পড়ল ওরা। তবু থামল না রবিনহুড, হাঁটতে হাঁটতে ডার্বিশায়ারের অ্যালবার্টন ছাড়িয়ে আরও খনিকদূর পর্যন্ত গিয়ে অবশেষে একটা গির্জা দেখে সেটার সামনে থামল। দু'দিক থেকে দু'টো রাস্তা এসে মিশেছে সেখানটায়। রাস্তার দু'দিকে ঘন ঝোপঝাড়। দেখেশুনে সেখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে ঠিক করল রবিন। তাতে লাভ হবে ঝোপের আড়ালে বসে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেয়া যাবে, আবার একসাথে দু'টো রাস্তার ওপর নজরও রাখা যাবে।

অনেক পথ হেঁটে আসায় সবারই খিদে পেয়েছে, কাজেই যে যার খাবারের সৎকার শুরু করে দিল। দু'টো রাস্তার একটা গেছে কাছের এক পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কয়েকটা বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে সেদিকে। একটা উইন্ডমিলের চাকার অর্ধেকটাও দেখা যাচ্ছে, বাতাসের চাপে ধীর গতিতে ঘুরছে।

খাওয়া শেষ করে ওখানেই অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিল সবাই, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল নরম ঘাসের বিছানায়। অপেক্ষা করছে, রাস্তার ওপর কড়া নজর। কিন্তু কারও দেখা পাওয়া গেল না। অপেক্ষা করতে করতে চরম বিরক্ত হয়ে উঠল রবিনহুড, উঠেই পড়তে যাচ্ছিল। এমন সময় একটা মাথা দেখা দিল পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে আসছে কেউ। লাফিয়ে উঠল রবিন। 'নাইট আসছে একজন ! নাইট !'

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল নাইট। বেশ খানিকটা কাছে আসতে দেখা গেল, পোশাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট দামি হলেও তার চেহারাটা যেন কেমন কেমন লাগছে। মুখ শুকিয়ে আছে, চেহারায় রাজ্যের বিষাদ। আরও একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তাঁর সাথে কোন সোনার চেইন বা মণিমুক্তোর অলঙ্কার ধরনের কোন কিছুই নেই।

বেশ বয়স্ক লোক নাইট। মাথা বুকের কাছে ঝুলে আছে, দু'হাত শিথিল ভঙ্গিতে দেহের পাশে ঝুলছে। চেহারায় চরম হতাশা, শামুকের মতো গতি। যেন সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত তিনি। মুখের চামড়ায় গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে আছে। ঘোড়াটার মুখের রাশ ঢিলা হয়ে আছে। মাথা নত করে হাঁটছে ওটা–যেন মনিবের জন্য সে-ও ব্যথিত।

'নাহ্, আজ আমাদের বরাতই মন্দ,' বলে উঠল রবিনহুড। 'সারাদিন পর যা-ও বা একজন নাইটের দেখা পেলাম, কিন্তু তার অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে দুঃখের ভার সইতে না পেরে এখনই রাস্তায় শুয়ে পড়বে। অবশ্য কাপড়চোপড়ের

অবস্থা দেখে অতোটা খারাপ মনে হচ্ছে না। যাই, দেখি কিছু মালপানি পাওয়া যায় কি না।'

উঠে পড়ল রবিন। সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বলল, 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো। আমি কথা বলে আসি লোকটার সাথে।'

গির্জার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও, নাইট কাছাকাছি আসতেই এগিয়ে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলল। 'দাঁড়ান, স্যার নাইট। কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

মুখ তুললেন নাইট। 'তুমি কে, ভাই ? রাজপথের ওপর এভাবে পথিককে চলতে বাধা দিচ্ছো ... কে তুমি ?

'আমি কে ! আমার নাম রবিনহুড।'

'আচ্ছা ! তুমিই তাহলে সেই লোক ?' নাইটের চেহারায় কিছুটা বিস্ময়ের সাথে মৃদু হাসির আভাসও ফুটল মনে হলো। চোখ কুঁচকে তাকালেন তিনি। 'তোমার ব্যাপারে লোকমুখে অনেক কিছু শুনেছি আমি। তার মধ্যে বেশিরভাগই ভালো কথা হলেও খারাপ কথাও কিছু কিছু শুনেছি। তবে সেসব ক্ষেত্রে একটু বুদ্ধি খরচ করে বুঝে নিয়েছি, বক্তা কেন তোমাকে খারাপ বলছে। যাকগে, এ থেকে হয়তো অনুমান করে নিতে পারবে তোমাকে আমি কোন চোখে দেখি ! এবার বলো, আমাকে থামালে কেন তুমি ?'

'আপনার অত্যন্ত মার্জিত কথাবার্তা আমার খুব ভালো লেগেছে, স্যার নাইট। আপনার এই সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে আমাদের শেরউডের আস্তানায় আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। আজ ওখানে আমাদের ভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে আপনাকে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' বললেন নাইট। চেহারা আরও বিষণ্ন হয়ে উঠল। 'কিন্তু আমার মতো এক নিঃস্ব অতিথির সঙ্গ তোমাদের ভালো লাগবে না। আমি ওখানে গেলে বরং তোমাদের ভোজের আনন্দই মাটি হয়ে যাবে। তারচে' রাস্তা ছাড়ো, আমাকে যেতে দাও।'

'আপনাকে আমরা এভাবে যেতে দিতে পারি না, স্যার নাইট। কারণ এই ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের। শেরউডে আমরা একটা সরাইখানা মতো খুলেছি। কিন্তু ওই গভীর বনে কেউ সহজে যেতে চায় না বলে আমাদেরকে প্রায়ই মেহমানের খোঁজে বের হতে হয়। পথে-ঘাটে উপযুক্ত যাকে পাওয়া যায়, তাকেই মেহমান বানিয়ে শেরউডে নিয়ে যাই আমরা। তাকে খাইয়ে খরচা বাবদ কিছু পাবো, এই আশায়।'

'বুঝতে পেরেছি,' গম্ভীর হয়ে গেলেন বুড়ো নাইট। 'কিন্তু আজ ভুল লোককে ধরেছ তুমি, রবিন। আমার কাছে কোন টাকা-পয়সা নেই।'

'তাই নাকি !' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাল রবিন। 'মনে হচ্ছে আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিছু মনে করবেন না, স্যার নাইট। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও নাকেমুখে মিথ্যে কথা বলতে শুনেছি আমি। তাই আপনার কথা সত্যি না মিথ্যে, তা যাচাই করে দেখতে চাই।'

কথা শেষ করে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল রবিন, সাথে সাথে হুড়মুড় করে ছুটে এল সবুজ পোশাকধারী ভয়ঙ্কর চেহারার একদল তাগড়া জোয়ান। তাদেরকে দেখে নিয়ে গর্বের সাথে বলল রবিন, 'এরা আমার একান্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী। আনন্দ-বেদনা বা লাভ-লোকসান যা-ই জোটে, আমরা সবাই মিলে সমান ভাগাভাগি করে নিই। এবার ঠিক করে বলুন, স্যার নাইট, আসলে কতো টাকা আছে আপনার কাছে ?'

প্রথমে কিছু সময় কথা বলতে পারল না বৃদ্ধ। দু' গাল ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠল তাঁর, মাথা নিচের দিকে নুয়ে পড়তে চাইছে। হঠাৎ মাথা ঝাড়া দিয়ে কিছু একটা তাড়াতে চাইলেন তিনি। সরাসরি রবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শুধু শুধু কেন লজ্জা পাচ্ছি আমি ? ঠিক আছে, শোনো। আমার থলিতে মাত্র দশটা শিলিং আছে। চেশায়ারের স্যার রিচার্ড অভ লে-র (খবমষ) এছাড়া দুনিয়ার কোথাও আর কিছু অবশিষ্ট নেই আজ।'

রবিন ও তার সঙ্গীরা কথাটা শুনে বেশ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার মুখ খুলল রবিন। বলল, 'আপনার কাছে আর কিছুই নেই ? শপথ করে বলছেন ?'

মাথা ঝাঁকাল স্যার রিচার্ড। 'বলছি। এই দশ শিলিংই শেষ সম্বল, আর কিছুই নেই। শুধু এই থলিতে কেন, আর কোথাও কিছু নেই আমার। এই নাও, নিজেই পরখ করে দেখো আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি।' থলিটা রবিনের দিকে এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ নাইট।

'থাক, স্যার নাইট। রেখে দিন। আপনার মতো একজন ভদ্র নাইটের কথা আমি অবিশ্বাস করতে চাই না। অত্যাচারী, অহঙ্কারী আর নিষ্ঠুর ধনীদের মাথা আমি নত করিয়ে ছাড়ি ঠিকই, কিন্তু বিনয়ী, দুঃখী মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টাও করি। আসুন, স্যার রিচার্ড। টাকা নেই তো কি হয়েছে ? তবু আপনি আমন্ত্রিত। আজ আমাদের সম্মানিত মেহমান আপনি। আমাদের ক্ষমতা খুব সীমিত, কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমাদের সাহায্যই হয়তো আপনার অনেক কাজে আসবে !'

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ,' স্যার রিচার্ড বললেন। 'আমার দুঃখ দূর হওয়ার কোন আশা নেই, তবু তোমার নিমন্ত্রণ আমি খুশি মনেই গ্রহণ করলাম।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে দিলেন নাইট। রবিনহুড আর উইল স্কারলেট দু' পাশে থাকল, অন্যরা পিছন পিছন অনুসরণ করে চলল তাঁকে। কিছুদূর গিয়ে জানতে চাইল

রবিন, 'জিজ্ঞেস করা হয়তো ঠিক হচ্ছে না, স্যার নাইট। তাতে হয়তো পুরনো ঘা খুঁচিয়ে আপনাকে কষ্টই দেয়া হবে, তবু জিজ্ঞেস না করেও পারছি না–আজ আপনার এই দুর্দশার কারণ কি ? মনের কথা বলে ফেললে হয়তো কষ্ট কিছুটা কমবে আপনার !'

'ঠিকই বলেছ, রবিন। তাতে মনের ভার কিছুটা হালকা হবে। তাছাড়া সবাই যখন জানে ব্যাপারটা, তখন তুমি জানলে আর ক্ষতি কি ? কথাটা হচ্ছে, আমি আজ নিঃস্ব, পথের ফকির হয়ে গেছি। চরম বিপদে পড়ে সেইন্ট মেরি অ্যাবির অ্যাবটের কাছ থেকে আমার দুর্গ আর জমিদারি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়েছিলাম। আগামীকালকের পরের দিন সে টাকা ফেরত দেয়ার কথা। যদি তার মধ্যে টাকা শোধ করতে না পারি, লোকটা আমার সবকিছুর মালিক হয়ে যাবে। আর একবার যদি সে মালিক হয়ে যায়, তাহলে কোনমতেই আর ওগুলো পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না।'

'আপনাদের মতো অভিজাত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেদের হাতে পড়লে টাকা-পয়সারও সেই দশা কেন হয়, বুঝি না,' আফসোসের সুরে রবিন বলল।'

'তুমি আমার ওপর অবিচার করছ, রবিনহুড,' বললেন স্যার রিচার্ড। 'তুমি মনে করেছ আমি উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে গিয়ে সমস্ত টাকা-পয়সা নষ্ট করে ফেলেছি ? না। সবটা শুনলে বুঝতে পারবে। শোনো, আমার ছেলে ইউরোপে বন্দি আছে। অস্ট্রিয়ায়। তাকে ছাড়াতে মুক্তপণ দিতে হবে বলে নিরুপায় হয়ে ধার করতে হয়েছে আমাকে। আমার চরম বিপদ দেখে সেইন্ট মেরির অ্যাবট আমার সবকিছু দলিল করে বন্ধক রাখতে বাধ্য করে তবে টাকা দিল। যা হোক, ছেলের কথা ভেবে সব মেনে নিয়েছি আমি। সম্পত্তি হারাতে হচ্ছে বলে আমার নিজের কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এই অসম্মানজনক পরিস্থিতিকে আমার স্ত্রী কিভাবে নেবে, সে কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বার বার।'

'আপনার ছেলে ইউরোপের কোন দেশে আছে ?'

'রাজা রিচার্ডের সাথে যুদ্ধ করতে প্যালেস্টাইনে গিয়েছিল। অস্ট্রিয়ার আর্চ বিশপের হাত বন্দি হয়েছে।'

'সত্যি !' মৃদু কণ্ঠে বলল রবিনহুড। 'অনেক বড় দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন আপনি, স্যার রিচার্ড। কত টাকা ধার করেছিলেন ?'

'চারশো পাউন্ড।'

রেগে উঠল রবিন। 'মাত্র ! কি জঘন্য রক্তচোষা মানুষ ! মাত্র চারশো পাউন্ড ধার দিয়ে ঘর-বাড়ি দুর্গসহ পুরো জমিদারি দখল করতে চায় ব্যাটা ? নিঃস্ব হয়ে কি করবেন ঠিক করেছিলেন আপনি ?'

'নিজের জন্যে কিছু চিন্তা করিনি,' নাইট বলল। 'করেছি কেবল স্ত্রীর জন্যে। বাকি জীবন কোন আত্মীয়ের বাসায় থেকে তাদের দয়ার দানের উপর নির্ভর করে

বেঁচে থাকতে হবে বেচারীকে। মন ভেঙে যাবে, কিন্তু নিয়তিকে মেনে নেবে ও, আমি জানি। সে জন্যেই এত খারাপ লাগছে।'

এতক্ষণ মন দিয়ে নাইটের দুঃখের কাহিনী শুনছিল উইল স্কারলেট, হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার এই চরম বিপদের সময় বন্ধু-বান্ধবরা কেউ এগিয়ে এলো না ? কেউ কোন সাহায্য করলো না ?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল স্যার রিচার্ড। 'যখন আমার অনেক টাকা-পয়সা ছিলো, তখন তাদের মধ্যে আমাকে ভালোবাসার প্রতিযোগিতা লেগে থাকত। সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করত, সে-ই সবচে' বেশি ভালোবাসে আমাকে। এখন তাদের কেউ নেই। কারণ ওরা জানে, আমি কেবল গরিবই হয়ে যাইনি, আমার শত্রুও প্রবল পরাক্রান্ত।' বিষাদের হাসি ফুটল স্যার রিচার্ডের মুখে। 'ওরা জানে, আর কোনদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না আমি।'

'এই বিপদে একেবারে কেউই আপনার পাশে দাঁড়াবে না, এমন কথা ভাববেন না, স্যার রিচার্ড,' রবিন বলল। 'আপনি বিপদে পড়ার আগে যে সমস্ত দুর্বল মনের, পরনির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজন আপনাকে ঘিরে ছিলো, তারা সরে গেছে। আমি গর্ব করছি না। তবে আমি দুর্বলও নই, পরনির্ভরশীলও নই। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন, স্যার রিচার্ড। আমি হয়তো আপনার এ বিপদে কোন সাহায্য করতে পারব।'

ম্লান হেসে মাথা নাড়ল নাইট। 'আশ্বাসের জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাহায্য তো দূরের কথা, গত এক বছর এটুকুও আমি কারও কাছে পাইনি। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করছি, রবিন। তোমাদের সহানুভূতি পেয়ে মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।'

ওরা যখন গ্রিনউড পৌঁছল, বিকেল তখন শেষ হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখা গেল লিটল জন তার দলবল নিয়ে আগে থেকেই সেখানে হাজির। ওরাও অতিথি নিয়ে ফিরেছে–রাস্তা থেকে হেরিফোর্ডে অ্যাবির বিশপকে পাকড়াও করে এনেছে। চোখমুখ ভীষণভাবে কুঁচকে আছে তাঁর। রেগে টং। গাছের নিচে মুরগির খাঁচায় আটকে পড়া খেঁকশিয়ালের মত পায়চারি করে বেড়াচ্ছে লোকটা। তার পিছনে তিনজন কালো পোশাক পরা যাজক ভীত-সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের সাথে ছয়টা ঘোড়া বাঁধা।

বোঝা যাচ্ছে, ওর একটা ঘোড়া বিশপের। বাকি পাঁচটার পিঠে মালপত্র। সেসবের মধ্যে একটা মাঝারি আকারের বাক্স দেখে খুশি হয়ে উঠল রবিনহুড। লোহার পাত দিয়ে মজবুত করে জড়িয়ে বাঁধা হয়েছে। রবিনকে দেখেই ভারিক্কি চালে এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল বিশপ, কিন্তু রবিনের অনুচরদের একজন বাধা দিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভুরুজোড়া আরও বিচ্ছিরিভাবে কুঁচকে উঠল। মুখ দিয়ে অনবরত কঠিন কঠিন সব শব্দ বের হতে লাগল।

'দাঁড়ান, লর্ড বিশপ !' দূর থেকে বলল রবিন। 'আপনি কেন কষ্ট করে আমার কাছে আসবেন ? আমিই আপনার কাছে আসছি। আপনাকে এখানে দেখে কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার !'

রবিন কাছে এসে দাঁড়াতেই তীব্র ভাষায় নালিশ জানাতে লাগল লোকটা। 'আমি জানতে চাই, একজন লর্ড বিশপের সাথে তোমাদের এ কোন ধরনের আচরণ। কারও সাথে কোনরকম ঝগড়া-ফ্যাসাদ নেই আমার। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনজন যাজক, পাঁচটা মালটানা ঘোড়া আর দশজন পাহারাদার নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় তালগাছের মতো লম্বা, দৈত্যের মতো এক লোক তিন-চার কুড়ি গুণ্ডা নিয়ে পিছন থেকে আমাকে থামতে বলল ! আমাকে, হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপকে ! পিছনে তাকিয়ে দেখি, আমার সব ক'টা পাহারাদার ভয়ের চোটে পালিয়ে গেছে। জাহান্নামে যাক ব্যাটারা ! শোনো, দৈত্যের মতো লোকটা আমাকে কি সব বলে হুমকি দিয়েছে জানো ? বলেছে, আমি বাড়াবাড়ি করলে নাকি রবিনহুড এসে আমার কাপড়চোপড় খুলে ন্যাংটা করে ছেড়ে দেবে। শুধু তাই নয়, মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি করেছে আমাকে। হোঁৎকা পুরুত, মানুষখেকো বিশপ–অর্থলোভী, রক্তচোষা, সুদখোর ... আরও অনেক কিছু বলেছে লোকটা ! তারপর, আমি এখানে আসার পর কোত্থেকে মোটা, এক ভুয়া ফ্রায়ার এসে আমার ঘাড়ে চাপড় মেরে আলাপ জমাতে চেয়েছিল, যেন আমি ও ব্যাটার কতোকালের পরানের বন্ধু !'

'কি বললে !' এক লাফে বিশপের সামনে এসে দাঁড়াল ফ্রায়ার টাক। তাঁর নাকের গোড়ায় এতো জোরে তুড়ি বাজাল যে চমকে উঠে পিছিয়ে গেল লোকটা। 'আমি ভুয়া ফ্রায়ার ? প্রমাণ করতে পারবে তোমার চেয়ে কোনদিক দিয়ে কম আমি ? জ্ঞানে, বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে ? জানো, পুরো বাইবেল আমার মুখস্থ ? আমার জন্ম হয়েছিল কুঁড়েঘরে, নইলে তোমার চেয়ে অনেক বড় মাপের বিশপ হতে পারতাম। ভুয়া বোলো না, পরীক্ষায় নামলে কিন্তু হেরে যাবে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করছি একটা দিকে তোমার চেয়ে কম আছি। তোমার মতো অমন ভয়ঙ্কর মোটা এখনও হতে পারিনি।'

ঝগড়াটে বিড়ালের মতো ফুঁসে উঠল বিশপ। এমনভাবে চোখ গরম করে তাকাল যেন দৃষ্টি দিয়েই পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে ফ্রায়ারকে। জবাবে টাক এমনভাবে চোখমুখ পাকিয়ে তাকাল যে স্যার রিচার্ডসহ অন্যরা সবাই শব্দ করে হেসে উঠল। কিন্তু রবিন হাসল না।

গম্ভীর চেহারায় বলল, 'সরে যান, ফাদার টাক। সরুন, মাননীয় লর্ড বিশপকে এভাবে সবার সামনে হেয় করা ঠিক হচ্ছে না। মাননীয় লর্ড বিশপ, আপনার সাথে আমার লোকেরা খারাপ আচরণ করেছে শুনে আমি খুবই দুঃখিত। লিটল জন, সামনে এসো !'

অপরাধী ভঙ্গিতে এক পা দু' পা করে সামনে এসে দাঁড়াল লিটল জন। রবিন বিশপের দিকে তাকাল। 'এই লোক আপনার সাথে বাজে ব্যবহার করেছে ?'

'হ্যাঁ, এই লোকই। খুব বাজে লোক, সন্দেহ নেই।'

'লিটল জন, তুমি মাননীয় লর্ডকে হোঁৎকা পুরুত বলেছো ?' তিরস্কারের সুরে বলল রবিন।

'বলেছি।'

'মানুষখেকো বিশপ বলেছো ?'

'বলেছি,' যেন আসামি তার অপরাধ স্বীকার করছে, এমনভাবে বলল সে।

'অর্থলোলুপ, রক্তচোষা সুদখোরও বলেছো ?'

'বলেছি,' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল লিটল জন।

'ছি ছি ছি !' বলল রবিন। মাথা নাড়ল ডানে-বাঁয়ে। 'একসাথে এতোকিছু ? ভাবতেও পারি না আমি।' বিশপের দিকে ফিরল। 'লর্ড বিশপ, বড় দুঃখের ব্যাপার যে ওর একটা কথাও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। কারণ আর যা-ই করুক, মিথ্যে কথা বলে না লিটল জন।'

সবার সম্মিলিত হা হা হাসিতে গোটা শেরউড কেঁপে উঠল। চিবুক থেকে শুরু করে টাক পর্যন্ত টকটকে লাল হয়ে গেল বিশপের। বার দুয়েক কিছু বলার জন্য মুখ খুললেন তিনি, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না।

আবার বলে উঠল রবিন, 'কিছু মনে করবেন না, লর্ড বিশপ। আমরা কিছুটা রসকষহীন মানুষ ঠিকই, কিন্তু আপনি যতোটা ভাবছেন ততোটা খারাপ নই। এখানে এমন কেউ নেই যার আপনার মাথার একটা চুল স্পর্শ করার সাহস আছে,' বলেই দ্রুত সংশোধন করল ও। 'চুল অবশ্য নেই আপনার মাথায়, কিন্তু থাকলেও করতো না। আমি বুঝতে পারছি, আমাদের এইসব রসিকতা আপনার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এখানে সবাই সমান, বিশ্বাস করুন। আমাদের এখানে কোন বিশপ নেই, ব্যারন নেই, আর্ল নেই। কারও ওপর খবরদারি করার কেউ নেই।

'আপনি যদি আমাদের সাথে প্রাণ খুলে মিশতে পারেন, অন্তত এটুকু কথা দিতে পারি, ভালোই লাগবে আপনার।' চারদিকে তাকাল ও। 'কই, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন কতোদূর ? তোমাদের যার যা যন্ত্রপাতি আছে, নিয়ে এসো। খেতে বসার আগে খেলা দেখাবে না মেহমানদের ?'

অনুচরেরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়তে স্যার রিচার্ডকে ডেকে বিশপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রবিনহুড। 'আপনি জেনে খুশি হবেন, মাননীয় লর্ড বিশপ, আমাদের আজকের ভোজ অনুষ্ঠানে আরেক বিশিষ্টজন, লে-র স্যার রিচার্ডও যোগ দিচ্ছেন। আপনারা দু'জনই আজ আমাদের মেহমান।'

নাইটের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন বিশপ। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'স্যার রিচার্ড, আমরা দু'জন সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ, কিন্তু এখানে আমরা দু'জনই অপমানিত হচ্ছি এইসব ... ' গুণ্ডা-বদমাশ বলতে গিয়ে চট্ করে মুখ বুজে ফেললেন তিনি, রবিনের দিকে তাকালেন।

'যা বলতে যাচ্ছিলেন বলে ফেলুন, লর্ড বিশপ,' হাসল ও। 'এখানে আমরা কেউ রেখে-ঢেকে কথা বলি না। আপনি বোধহয় বলতে চাইছিলেন, "এইসব গুণ্ডা-বদমাশ," তাই তো ?'

'ওরকমই কিছু একটা বলতে চেয়েছিলাম হয়তো,' বলে স্যার রিচার্ডের দিকে ফিরল বিশপ। 'স্যার রিচার্ড, আপনাকে একটা কথা না বলে থাকতে পারলাম না। একটু আগে এদের নোংরা রসিকতায় আপনাকে হাসতে দেখেছি আমি। এদেরকে ওভাবে লাই না দিয়ে বরং নিরুৎসাহিত করা উচিত ছিল আপনার। তা না করে আপনি ...'

'আমি আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে হাসিনি,' নাইট বললেন। 'রসিকতা রসিকতাই। ওই রসিকতাটা যদি আমাকে নিয়ে করা হতো, তবুও আমি হাসতাম, লর্ড বিশপ।'

অতিথিদের বসার জন্য গ্রিনউডের নিচে টেবিল পাতা হলো। খুব সম্মানের সাথে তাঁদেরকে সেখানে বসতে দিল রবিন, নিজেও বসল। লিটল জন, উইল স্কারলেট, মাচ আর অ্যালান-এ-ডেলসহ দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন তাদের আশপাশেই থাকল। ফাঁকা জায়গাটার একেবারে শেষ মাথায় গাছের ডালে একটা মালা ঝুলিয়ে একজন একজন করে তীর ছুড়তে শুরু করল। তাদের হাতের টিপ দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন নাইট ও বিশপ।

একশো চল্লিশ গজ দূরে গাছের ডালে ঝোলানো নয় ইঞ্চি ব্যাসের একটা মালা—তার মাঝখানের বৃত্ত সই করে তিনটা করে তীর ছুড়ল ওরা সবাই। অথচ মাত্র দুটো তীর বিঁধল মালার বাইরে, আর সব ক'টাই লক্ষ্যভেদ করল। এরমধ্যে গল্প-গুজব আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে দুই মেহমানের বেদনা ও বিরক্তি সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে রবিনহুড।

'আশ্চর্য !' হেরিফোর্ডের বিশপ বলল অবাক হয়ে। 'জীবনে এমন শূটিং আর দেখিনি। কিন্তু আমি শুনেছি, এ ক্ষেত্রে নাকি রবিনের তুলনা হয় না।'

স্যার রিচার্ড ওর দিকে ফিরল। 'রবিন, দেখাবে নাকি ?'

'আঁধার হয়ে আসছে,' বলল ও। 'সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসেছে। তবু দেখি চেষ্টা করে কি করা যায়।'

উঠে কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল রবিনহুড, হেজেল গাছের ছোট একটা ডাল কেটে এনে সেটার ছাল ছাড়াতে লাগল। বুড়ো আঙুলের চেয়ে সামান্য মোটা হবে ডালটা। ছাল ছাড়ানো হলে ওটা নিয়ে মাপা পায়ে আশি গজ দূরে চলে

গেল ও, সেখানে ছড়িটা মাটিতে পুঁতে রেখে ফিরে এল আবার। অ্যালান-এ-ডেল এগিয়ে এসে ইউ কাঠের তৈরি রবিনের বিশাল ধনুকটা বাড়িয়ে দিল। ওটা নিল রবিন। তূণের সবক'টা তীর মাটিতে ফেলে তার থেকে একটা বাছাই করে নিয়ে ধনুকে জুড়ল, তারপর বাঁ পা-টা সামান্য আগে বাড়িয়ে একটু পাশ ফিরে দাঁড়াল।

সময় উপস্থিত বুঝতে পেরে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই, নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকল। টুঁ শব্দটিও নেই, গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়লেও যেন তার আওয়াজ শোনা যাবে। ধনুক ধরা বাঁ হাত সটান সোজা রেখে কাঁধ বরাবর তুলল রবিন, তারপর ডান হাতে ধনুকের ছিলার সাথে জোড়া তীরের পালক পরানো গোড়া ধরে কাছে টানতে শুরু করল। একবার শ্বাস নিতে যেটুকু সময় লাগে, তার মধ্যে লক্ষ্যস্থির করে নিল ও।

পরমুহূর্তে 'টোয়াং-ং-ং !' শব্দের সাথে উড়াল দিল তীর। এতই দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ গেল না।

তীরের পিছন পিছন ছুটল উইল স্কারলেট, হেজেলের ডালটা তুলে নিয়ে এল মাটি থেকে। প্রত্যেকে অবাক বিস্ময়ে দেখল, কাঠের গায়ে বিঁধে আছে রবিনের ছোড়া তীরটা। আনন্দে হই-হই করে উঠল দর্শকরা। যারা রান্নায় ব্যস্ত ছিল, তারাও ছুটে এলো শোরগোল শুনে। যোগ্য দলনেতার উপযুক্ত লক্ষ্যভেদের জাদু দেখে মোহিত হলো সবাই, গর্বে বুক ফুলে উঠল। কাউকে সরাসরি প্রশংসা জানাবার সুযোগ না দিয়ে বসে পড়ল রবিনহুড, তার নির্দেশে কয়েকজন অনুচর লাঠি খেলা শুরু করে দিল।

হেরিফোর্ডের বিশপ ভীষণ খুশি হলেন লাঠিয়ালদের চমৎকার লাঠি খেলা দেখে, সবকিছু ভুলে তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করতে লাগলেন তিনি। এভাবে ক্রমে সন্ধে পেরিয়ে গেল, শেরউডের গভীর বনে ঘনিয়ে এলো আশ্চর্য সুন্দর এক রাত। এবার হার্প নিয়ে গান ধরার জন্য প্রস্তুত হলো অ্যালান-এ-ডেল। তার অপূর্ব মোহনীয় গলার গান শুনে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো শ্রোতাদের। পর পর কয়েকটা গান গাইল সে।

প্রেমের গান, যুদ্ধের গান, দুঃখের এবং মহিমার গান। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল সবাই। এতো সুন্দর গান কার গলা দিয়ে বের হয়, দেখার জন্য বিশাল থালার মতো রূপালি চাঁদও উঁকি দিল আকাশে। গাছের পাতা চিক চিক করে উঠল তার আলোয়।

হার্পের মিষ্টি বাদন, গানের ভাবগম্ভীর আবেশ, রূপালি চাঁদের চারদিক ভাসানো স্নিগ্ধ আলোর বন্যা আর মৃদু বাতাসে বিশাল একেকটা ওক গাছের মাথা দুলুনি, সব মিলিয়ে এমন অদ্ভুত এক সম্মোহনী পরিবেশের সৃষ্টি হলো শেরউডে, যা বর্ণনাতীত।

অবশেষে দু'জন খবর দিয়ে গেল, খানা প্রস্তুত। দুই অতিথিকে নিয়ে এগিয়ে গেল রবিনহুড। টেবিল বিছিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, কয়েকটা মশাল জ্বেলে

দেয়ায় বেশ আলো হয়ে উঠেছে জায়গাটা। মজাদার খাবারের সুগন্ধে জিভে পানি এসে গেল সবার। খাওয়া শেষ হতে এলো এল ভর্তি পাত্র। এমন সময় সবাইকে চুপ করার নির্দেশ দিল রবিন।

'আজ একটা গল্প শোনাতে চাই সবাইকে,' বলল ও। তারপর বেশি বাড়তি কথায় না গিয়ে স্যার রিচার্ডের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে গেল।

সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল ঘটনা শুনে। সামান্য কয়েকশো পাউন্ডের জন্য নাইট স্যার রিচার্ডের বিশাল সহায়-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে শুনে রবিনের অনুচরদের সবার চেহারা ক্রমে কঠোর হয়ে উঠল। ওদিকে বিশপের চেহারা ক্রমে বিবর্ণ হয়ে উঠল। মদের পাত্রে চুমুক দিতেও ভুলে গেছে সে। রবিনের এ কাহিনী তার জন্য কোন বিপদ হয়ে দেখা দেয় কি না, সেই ভয়ে আছে। ভয়টাই সত্যি হলো, গল্প শেষ হতে তার দিকে ফিরল রবিন।

'লর্ড বিশপ, আপনার কি মনে হয় এমন এক অন্যায় ঘটতে দেয়া উচিত ? সমাজের এত উঁচুতে আপনাদের অবস্থান, সেখান থেকে একজনকে নেমে গিয়ে অন্যের দয়ার দানের ওপর নির্ভর করে বাকি জীবন কাটাতে হবে, পথের ভিখারি হতে হবে ! লর্ড বিশপ, এ ব্যাপারে একজন ধার্মিক খ্রিস্টান হিসেবে আপনার কি বক্তব্য ?'

বিশপের মুখে কোন কথা জোগাল না। মাথা নিচু করে অনড় বসে থাকল সে। বুক ধড়ফড় করছে।

'সারা ইংল্যান্ডে আপনিই সবচেয়ে ধনী বিশপ,' আবার বলল রবিন। 'আপনি কি পারেন না এ সময়ে এই বিপদগ্রস্ত নাইটকে সাহায্য করতে ?'

বিশপ নিরুত্তর।

লিটল জনের দিকে ফিরল রবিন। 'তুমি আর উইল স্কারলেট লর্ড বিশপের মালটানা ঘোড়াগুলো নিয়ে এসো।'

যেখানে আলো সবচেয়ে বেশি, সেখান থেকে টেবিল সরিয়ে জায়গা করে দেয়া হলে ঘোড়াগুলোকে সেখানে নিয়ে এলো ওরা। 'ওগুলোর পিঠে যেসব মালপত্র আছে, তার তালিকা কার কাছে ?'

কালো পোশাকের যে তিনজন যাজক ছিল বিশপের দলে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্কজন ভয়ে ভয়ে বলল, 'ওটা আমার কাছে আছে। দয়া করে আমাকে মারবেন না।'

'না, ফাদার। ভয় নেই,' রবিন বলল। 'নিরীহ মানুষের কোন ক্ষতি আমরা করি না। তালিকাটা দিন।' কাগজটা নিয়ে উইল স্কারলেটের দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন। 'পড়ো দেখি, কি কি আছে !'

'তিন বেল সিল্ক,' শুরু করল উইল।

'ওগুলো ছোঁবো না আমরা,' রবিন বলল। একপাশে সরিয়ে রাখা হলো সিল্কের বেলগুলো।

'বিউমন্টের অ্যাবির জন্যে এক বেল সিল্কের ভেলভেট।'

'সিল্কের ভেলভেট দিয়ে ফাদাররা কি করবে ?' নিজেকে প্রশ্ন করার মতো করে বলল রবিন। উত্তরটাও নিজেই দিল। 'ঠিক আছে, এসব যদিও ওদের কাজে লাগার কথা নয়, তবু সবটা আমরা নেবো না। ওগুলোকে তিন ভাগ করা হোক। এক ভাগ বিক্রি করে টাকাটা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, একভাগ আমাদের জন্যে রাখো। বাকি ভাগটা নিয়ে বিউমন্ট অ্যাবির ফাদাররা কি করবে, সেটা তাদের ব্যাপার।'

ওর নির্দেশমত সমান তিন ভাগে ভাগ করা হলো কাপড়। একভাগ নিজেদের জন্য রেখে বাকি দু'ভাগ সিল্কের বেলের পাশে রাখা হলো।

'দু' কুড়ি মোমবাতি। সেইন্ট টমাসের প্রার্থনা ঘরের জন্যে।'

'ওগুলো ওদেরই লাগবে। রেখে দাও সিল্কের বেলের পাশে।'

একদিকে একের পর এক নাম পড়ে যেতে লাগল উইল, অন্যদিকে রবিনহুডের নির্দেশ অনুযায়ী একটার পর একটা ভাগ করা হতে লাগল। কোন কিছু ছুঁয়ে দেখল না রবিন। বেশিরভাগ জিনিসই বস্তা খুলে তিন ভাগ করা হলো : দান করার জন্য একভাগ, নিজেদের জন্য একভাগ এবং মালিকের জন্য একভাগ। ভেলভেট আর সিল্ক ছাড়াও সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কাপড়, দামি মদসহ আরও অনেক কিছুতে খালি করা জায়গাটা প্রায় ভরে উঠল।

তারপর তালিকার শেষের জিনিসটার নাম ঘোষণা করল উইল স্কারলেট। 'হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের একটা বাক্স।'

ঘোষণা শুনে বিশপের আত্মা কেঁপে উঠল। প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে বাক্সটার দিকে না তাকাতে, কিন্তু বেয়াড়া চোখ ওটার ওপর থেকে সরছেই না।

'ওটায় কি আছে, লর্ড বিশপ ?' জানতে চাইল রবিন।

'খেয়াল নেই,' ভুরু কুঁচকে জবাব দিল সে।

মুখ টিপে হাসল ও। 'এর চাবিটা আপনার কাছে ?'

মাথা নাড়ল বিশপ—নেই। আশা ছিল, না বললে হয়তো খোলার সমস্যার কথা চিন্তা করে ক্ষ্যান্ত দেবে রবিন। কিন্তু ওর নতুন নির্দেশ শুনে মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে উঠল তার চেহারা।

'উইল স্কারলেট ! দেখি তো, তলোয়ারের এক কোপে বাক্সটার ঢাকনা দু' টুকরো করতে পারো কি না !'

একটু পর বিরাট একটা তলোয়ার এনে ওটার ডালায় গায়ের জোরে কোপ মারল উইল, কিন্তু লোহার পাত দিয়ে মোড়া বলে কাজ হলো না। তিনটা কোপের দরকার হলো ওটা খুলতে। ডালা খুলে যেতেই ভেতর থেকে উপচে পড়ল একগাদা সোনার মোহর, মশালের লালচে আলোয় চিকচিক করে উঠল সেগুলো। বিস্ময়ের চাপা গুঞ্জন উঠল চারদিকে। কিন্তু কেউ নড়ল না জায়গা ছেড়ে। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানেই থাকল।

'অ্যালান-এ-ডেল, উইল স্কারলেট আর লিটল জন, তোমরা গুণে দেখো কতোগুলো মোহর আছে এখানে।

বেশ সময় লাগল কাজটা সারতে। উইল স্কারলেট গোনা শেষ হতে ঘোষণা করল, মোট পনেরশো সোনার গিনি আছে বাক্সে। টাকা গোনার সময় ভেতরে এক টুকরো কাগজ পেয়েছে উইল–কিছু লেখা। কি লেখা, তা জোরে জোরে পড়ে শোনাল সবাইকে। সবাই জানলো, টাকাগুলো আয় হয়েছে হেরিফোর্ড অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লর্ড বিশপের আদায় করা খাজনা, জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে।

তার দিকে ফিরল রবিন। বলল, 'মাননীয় লর্ড বিশপ, বাক্সের মধ্যে কি আছে তা যখন আপনার মনেই ছিল না, তখন ইচ্ছে করলে আমিও তা মনে না করিয়ে দিলেই পারতাম। আপনার সামনে ওটা না খুললেও পারতাম। তবে আমি অতোটা হৃদয়হীন নই বলে তেমন কিছু করলাম না। আপনাকে এতোবড় কষ্ট দেয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। যা হোক, ওই বাক্সে যা আছে, তার তিনভাগের একভাগ আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারবেন। বাকি দু'ভাগের একভাগ আপনার এবং আপনার লোকজনের আমোদ-প্রমোদ আর ভুরিভোজের খরচ হিসেবে আমাদের পক্ষ থেকে রেখে দেয়া হবে। অবশিষ্ট এক ভাগ গরিব-দুঃখী মানুষদের মধ্যে দান করে দেয়া হবে। শুনেছি আপনি নাকি জীবনে একটা পয়সাও কাউকে দান করেননি। তাই এই সুযোগে আমরা আপনার হয়ে চেষ্টা করবো আপনাকে কিছু পুণ্য কামাই করে দিতে।'

একটা কথাও বলল না বিশপ, আগের মতো মাথা হেঁট করে বসেই থাকল। তিন ভাগের এক ভাগ মোহর অন্তত ফেরত পাচ্ছে জেনে ইষ্টদেবকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছে সম্ভবত।

এবার স্যার রিচার্ডের দিকে ফিরল রবিনহুড। 'স্যার রিচার্ড, এক রক্তচোষা ধর্ম ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে সবকিছু হারাতে যাচ্ছিলেন আপনি। এদিকে তাদেরই আরেকজনের উপচে পড়া টাকা দিয়ে সেইন্ট মেরি অ্যাবির সেই লোভী অ্যাবটটাকে ঠেকানো যায়, তাহলে আমার মনে হয় বিচারটা ন্যায্যই হবে। কি বলেন আপনি ? এখান থেকেই আপনাকে চারশো পাউন্ড দিচ্ছি। যান, আজই দেনা শোধ করে নিজের সম্পত্তি ছাড়িয়ে নিন গিয়ে।'

হাঁ করে অনেকক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ নাইট, যেন বুঝে উঠতে পারছেন না রবিন কি বলল। যখন বুঝলেন, ধীরে ধীরে ঝাপ্‌সা হয়ে আসতে লাগল দৃষ্টি। 'তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো, বুঝতে পারছি না আমি, রবিন। তোমার মহৎ অন্তরের কথা যে লোকে শুধু শুধু বলে না, সে কথা জানতে পেরে ভীষণ কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিন্তু তুমি কিছু মনে কোরো না, ভাই। আমি তোমার এই দান নিতে পারবো না।'

'এ কথা কেন বলছেন, স্যার নাইট ?' ভীষণ অবাক হলো রবিনহুড। 'কেন নিতে পারবেন না ?'

'স্ত্রীকে পরের দয়া-দাক্ষিণ্য গ্রহণের অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে আরেকজনের দান আমি নিতে পারবো না। সে দান ভালোবাসার হলেও না। তবে ধার হিসেবে দিলে নিতে পারি। ঠিক এক বছর একদিনের দিন টাকাটা শোধ করবো আমি। হয় তোমাকে ফেরত দেবো, নয়তো হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপকে।'

'বেশ,' বলল রবিনহুড। 'তাহলে ধার হিসেবেই নেবেন না হয়। কিন্তু বিশপকে এ টাকা ফেরত দেয়ার প্রশ্নই আসে না। আমাকে দেবেন, আমি টাকাটা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেবো।'

একটা চামড়ার থলিতে করে চারশো পাউন্ড দেয়া হলো স্যার রিচার্ডকে। থলিটা নিয়ে উঠে পড়লেন তিনি। 'এবার আমাকে যেতে হয়, রবিন। বেশি দেরি দেখলে আমার স্ত্রী দুশ্চিন্তা করবেন।'

সবাই উঠে দাঁড়াল বৃদ্ধ নাইটের সম্মানে। 'কিন্তু আপনাকে এভাবে একা তো ছেড়ে দেয়া যায় না, স্যার রিচার্ড,' বলল রবিন। 'একা গেলে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলবেন।'

লিটল জন এগিয়ে এলো। 'অনুমতি পেলে যুদ্ধের সাজ পরা জনাবিশেক লোক নিয়ে এঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি আমি।'

'ঠিক বলেছ তুমি,' রবিনহুড মাথা দোলাল। 'যাও তাহলে, যুদ্ধের সাজ পরে নিতে বলো বিশজনকে। স্যার রিচার্ডকে সম্মানের সাথে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

উইল স্কারলেট এগিয়ে এল। 'গলায় সোনার চেইন আর পায়ে সোনার স্পার ছাড়া ঠিক মানাচ্ছে না স্যার রিচার্ডকে। ওগুলো হলে ঠিক একজন নাইটের মতোই দেখাতো।'

'ঠিক কথা, উইল স্কারলেট,' আবারও মাথা দোলাল রবিন। 'ওগুলো দিয়ে সাজিয়ে দাও স্যার নাইটকে।'

উইল স্কারলেট একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'রবিনহুড এবং তার প্রিয় সহচরদের তরফ থেকে যদি স্যার রিচার্ডের স্ত্রীর জন্যে ভেলভেট কাপড়ের বেল আর সোনার কারুকাজ করা কাপড়গুলো উপহার হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়, কেমন হয় তাহলে ?'

প্রস্তাবটা শুনে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল সবাই। রবিন বলল, 'খুব ভালো হয়। তাই করো গিয়ে।'

সবার এরকম প্রাণঢালা ভালোবাসা পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন স্যার রিচার্ড। বোকার মতো আশপাশের সবার মুখের তাকাতে লাগলেন তিনি। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বন্ধুরা, তোমাদের আজকের এই হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার কথা আমি কোনদিন ভুলবো না। তোমাদের জন্যে আজ

থেকে লী-র স্যার রিচার্ডের দুর্গ তোরণ সব সময় খোলা থাকবে। যদি কখনও কোন প্রয়োজন পড়ে, বা কোন বিপদ-আপদ দেখা দেয়, নির্দ্বিধায় আমার কাছে চলে এসো তোমরা। আমি বা আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতে, দুর্গের প্রতিটা দেয়াল গুঁড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত কেউ তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। আমাকে তোমরা ... আমি ...'

অতি আবেগে কথা আটকে গেল নাইটের। বক্তব্য শেষ করতে না পেরে মুখটা তাড়াতাড়ি আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিলেন তিনি।

একটু পর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এলো বিশজন অনুচর। লিটল জনের পিছনে এসে লাইন ধরে দাঁড়াল। রবিনহুড একটা সোনার চেইন পরিয়ে দিল স্যার রিচার্ডের গলায়। এরমধ্যে তাঁর পায়ে সোনর স্পার পরিয়ে দিয়েছে উইল স্কারলেট। লিটল জন তাঁর ঘোড়া নিয়ে আসতে সেটার পিঠে চড়ে বসলেন বৃদ্ধ নাইট। কিছুক্ষণ রবিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ঝুঁকে ওর গালে চুমো খেলেন। রওনা হয়ে গেল দলটা।

'আমাকেও উঠতে হয় এবার,' লর্ড বিশপ বসা থেকে উঠে পড়লেন। 'রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে।'

তাঁর বাহুতে একটা হাত রাখল রবিন। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'বেশি ব্যস্ত হবেন না, লর্ড বিশপ। স্যার রিচার্ড তাঁর বন্ধকি সম্পত্তির কাগজপত্র ছাড়িয়ে না নেয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা যেতে দিতে পারি না। স্যার রিচার্ড আপনার তরফ থেকে

কোন ঝামেলায় পড়ুন, আমি তা চাই না। তাই আপনাকে আগামী তিনদিন আমাদের সাথে থাকতে হবে। আমি শুনেছি শিকারের খুব শখ আপনার। দেখবেন, শিকার করতে করতে এই তিনটা দিন চোখের পলকে কেটে যাবে। আরও দেখবেন, তিনদিন পর হয়ে যাওয়ার সময় খারাপই লাগবে আপনার।'

ওর কথাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। তিনদিন পর শেরউডের বাধাহীন মজার জীবন ছেড়ে আবার কাজেকর্মে ফিরে যেতে হচ্ছে বলে মন খারাপ হয়ে গেল বিশপের। অবশ্য সেটা সাময়িক। নির্দিষ্ট দিনে বাকি মালপত্র নিয়ে নিজের পথে যাত্রা করল সে। তার সাথেও একদল সশস্ত্র অনুচর দিল রবিন, যাতে আর কোন ডাকাতের পাল্লায় পড়ে কিছু খোয়াতে না হয় তাঁকে।

যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করল বিশপ–একদিন না একদিন সুযোগ ঠিকই পাব আমি, রবিনহুড। সেদিন কড়ায়-গণ্ডায় তোমার এই আচরণের শোধ তুলে নেব। আমাকে এখনও চিনতে পারোনি তুমি।

পরদিন। সেইন্ট মেরি অ্যাবিতে রাজাধিরাজের মত হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে মোটা অ্যাবট। তাকে ঘিরে রেখেছে অ্যাবির একদল মঙ্ক। সময় ক্রমে দুপুরে দিকে গড়াচ্ছে। প্রায়র বাইরে থেকে কোন একটা কাজ সেরে ভেতরে ঢুকতে তার দিকে তাকিয়ে মতলবি হাসি দিল অ্যাবট।

তার মনের কথা টের পেয়ে প্রায়র বলল, 'মাই লর্ড অ্যাবট, আজ স্যার রিচার্ড অভ লে-র পাওনা টাকা শোধ করার দিন। চারশো পাউন্ড ধার নিয়েছিলেন স্যার রিচার্ড। আজ টাকা শোধ না করলে তাঁর চেশায়ারের সমস্ত জমি, দুর্গ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।'

শব্দ করে দু'হাতের তালু ডলল অ্যাবট। 'সব উর্বর জমি। একরের পর একর। আর চমৎকার লে হল। সব আমাদের ! সব আমাদের !'

'কিন্তু মাই লর্ড, দুপুর হতে এখনও আধ ঘণ্টা বাকি আছে,' বিচারক বলল পাশ থেকে।

'থাকুক। তা নিয়ে ভাবি না। কারণ স্যার রিচার্ড টাকা দিতে পারবেন না। যাতে না পারেন, সে জন্যে আমার অনুরোধে গত মাসে ট্যাক্স আদায়কারীদের তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন যুবরাজ জন। আমি জানি, স্যার রিচার্ডের দেনা শোধ করার কোন উপায়ই নেই।'

'তবু আমাদেরকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে,' বলল প্রায়র।

মাথা দোলাল মোটা অ্যাবট। 'অপেক্ষা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি অপেক্ষা ...' এক মঙ্ককে দ্রুত পায়ে হেঁটে আসতে দেখে থেমে গেল লোকটা। ভুরু কুঁচকে উঠল। 'কি ... !'

'স্যার রিচার্ড এসেছেন, ফাদার !' নিচু গলায় বলল লোকটা। 'তবে চেহারা করুণ। আমার মনে হয় না আপনার চিন্তা করার কিছু আছে।'

আসলেই তাই। বৃদ্ধ নাইট ভেতরে ঢুকতে তাঁর দিকে এক পলক তাকিয়েই অ্যাবট বুঝে ফেলল মঙ্ক ঠিকই বলেছে। তার সামনে এসে সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন তিনি। বিষণ্ন চেহারা। হতদরিদ্র। গায়ের আলখাল্লাটা বহু ব্যবহারে মলিন। অ্যাবট, প্রায়র এবং বিচারক যে টেবিলে বসা, সেটার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, মাই লর্ড অ্যাবট। আমি সময়মতই এসেছি।'

'ধারের টাকা নিয়ে এসেছেন ?' কোনমত বলল অ্যাবট।

'না, মাই লর্ড,' হতাশায় দু' কাঁধ ঝুলে পড়ল তার। 'এক পেনিও জোগাড় করতে পারিনি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে নড়েচড়ে বসল অ্যাবট। 'সত্যি বড় দুঃখের কথা !' সঙ্গীদের দিকে ফিরে মাথা দোলাল সে। পরক্ষণেই কি মনে হতে দ্রুত আবার নাইটের দিকে ফিরল। 'তাহলে এসেছেন কেন ? টাকা জোগাড় করতে না পারলে আর এসে কি লাভ হলো ?'

'আপনার কাছে ধার শোধ করার সময় আরও কিছুদিন বাড়ানোর আবেদন জানাতে, মাই লর্ড অ্যাবট,' বিনয়ের সাথে বললেন স্যার রিচার্ড অভ লে। আপনি জানেন আমার ছেলে অন্য দেশের কারাগারে বন্দি আছে। রাজার সাথে হোলি চার্চের পক্ষে লড়তে গিয়ে বন্দি হয়েছে। তাই আমি আশা করছি, হোলি চার্চ আমার জন্যে আরও ছয় মাস সময় বাড়িয়ে দেবে।'

'না, না !' বিচারক বলল। 'সময় বাড়ানো যাবে না। হয় টাকা দিন, নইলে সম্পত্তির মায়া ছাড়ুন।'

'তাহলে বাজেয়াপ্ত না করে আমি টাকা দিতে না পারা পর্যন্ত ততদিন আপনি আমার সম্পত্তি ভোগদখল করুন।'

'না, না !' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাবট। 'আমার তরফ থেকে আর কোন সহযোগিতা পাবেন না আপনি। আপনার মত অহঙ্কারী, ভুয়া নাইটকে হোলি চার্চকে প্রতারণা করার আর কোন সুযোগ দেব না আমি। হয় টাকা দিন, নয়তো বেরিয়ে যান। না গেলে আমার লোকদের দিয়ে চাবুক মেরে বের করে দিতে বাধ্য হবো আমি।'

'আমি কোন ভুয়া নাইট নই !' চেঁচিয়ে উঠলেন স্যার রিচার্ড। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'বরং আপনি ভুয়া। আপনি ঈশ্বরের সেবক হয়ে একজন নাইটকে আপনার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করছেন। লজ্জা, লজ্জা !'

রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল অ্যাবট। 'বেরিয়ে যান ! আপনার সবকিছু এখন থেকে আমার ! ওই শুনুন, বারোটার ঘণ্টা পড়ছে ঘড়িতে।'

আখাল্লার ভেতর থেকে চারটা টাকার ব্যাগ বের করে তার সামনে টেবিলে রাখলেন নাইট। 'এই নিন, আপনার টাকাও শোধ হয়ে গেছে !'

তাঁর মলিন আলখাল্লার নিচে ঝলমলে, দামি কাপড়ের নতুন পোশাক দেখে অবাক হলো অ্যাবট। চেহারা রং খুব দ্রুত গায়েব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ব্যাগগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বিচারকে দিকে ফিরল সে। 'টাকাগুলো গুনে দেখুন,' কাঁপা গলায় বলল।

'আমি চললাম,' দরজার দিকে পিছন ফিরলেন নাইট। 'আমার সম্পত্তি এখন থেকে আবার আমার হয়ে গেল।' দৃঢ় পায়ে অ্যাবি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। পিছনে অ্যাবট অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগল। অভিশাপ দিতে লাগল।

ঋণ শোধ

চারশো পাউন্ড ধার নিয়ে যাওয়ার এক বছর একদিনের দিন শেরউডের উদ্দেশে যাত্রা করলেন স্যার রিচার্ড অভ লে। চেহারায় একটা হাসি-খুশি ভাব তাঁর। এই চেহারার সাথে এক বছর আগের দুঃখের ভারে পর্যুদস্ত, বিষাদে মলিন স্যার রিচার্ডের কোন মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চমৎকার স্বাস্থ্যবান একটা ঘোড়ায় চেপে আগে আগে চলেছেন তিনি। পিছনে রয়েছে কয়েকটা মালবাহী ঘোড়া–সেগুলোর পিছনে একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী। সেইন্ট মেরির অ্যাবটের কাছ থেকে সম্পত্তি ছাড়িয়ে নিয়ে গত এক বছর প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন বৃদ্ধ নাইট, আগের চেয়েও অনেক ভাল অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। প্রচুর টাকাকড়ি আয় হয়েছে তাঁর, জীবনে অঢেল প্রাচুর্য এসেছে। রাজমহলে প্রভাব-প্রতিপত্তি আর মান-সম্মানও অনেক বেড়ে গেছে।

এ সবের মূলে যে মানুষটি রয়েছে, সময় মত যার সাহায্য না পেলে আজ তিনি পথের ভিখারি থাকতেন, সেই রবিনহুডের কথা এরমধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি তিনি। সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতার সাথে মনে রেখেছেন। আজ তার সেই ঋণ পরিশোধের দিন, তাই খুশিমনে শেরউডে চলেছেন তিনি। চলতে চলতে এক নদীর কাছে পৌঁছলেন স্যার রিচার্ড। ওটার তীরের বিশাল এক মাঠে মেলা ধরনের কিছু একটা চলছে দেখে সেতু অতিক্রম করতে গিয়েও কি মনে করে থেমে পড়লেন।

সেখানে অজস্র পদের মালামাল দিয়ে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। সারা মাঠ জুড়ে পিঁপড়ের মতো গিজগিজ করছে মানুষ। একদিকে গানের আসর বসেছে, অন্যদিকে চলছে জাদুর খেলা আর কুস্তি। সবচেয়ে বেশি ভিড় জমেছে কুস্তির মঞ্চ ঘিরে। বিজয়ীর জন্য লোভনীয় পুরস্কার আছে বলে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে কুস্তিগিররা এসেছে।

প্রথম পুরস্কার সোনার কারুকাজ করা স্যাডল ও লাগাম পরানো একটা ঘোড়া; দ্বিতীয় পুরস্কার একটা সাদা ষাঁড় ; তৃতীয় পুরস্কার চমৎকার নকশা তোলা একজোড়া দস্তানা; চতুর্থ পুরস্কার একটা সোনার আংটি ; এবং পঞ্চম পুরস্কার এক পিপে মদ। হাতে তখনও যথেষ্ট সময় আছে দেখে স্যার রিচার্ড ঠিক করলেন, কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখে শেরউডে যাবেন।

মঞ্চে দৈত্যাকার এক কুস্তিগিরের কৌশল দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। কোন কুস্তিগিরই তার সামনে দুই-এক মিনিটের বেশি দাঁড়াতে পারছে না। এই গ্রামের চ্যাম্পিয়ন, ওই এলাকার চ্যাম্পিয়ন, অমুক পালোয়ান এক এক করে মঞ্চে উঠছে আর কুপোকাৎ হচ্ছে। লোকটা কাউকে দাঁড়াতেই দিচ্ছে না, ধরেই মাথার ওপর তুলে নিয়ে এমন আছাড় মারছে যে তাতেই কম্ম কাবার। লোকটা কে হতে পারে, দর্শকরা তাই নিয়ে গবেষণা করছে।

প্রতিযোগীরা এক এক করে আসছে আর তার কাছে হার মানছে দেখে প্রথমদিকে দর্শক হই-হই করে বাহবা দিচ্ছিল তাকে, কিন্তু হঠাৎ তার মধ্যে কিছু কিছু কঠোর, বাঁকা মন্তব্যও শোনা যেতে লাগল। দর্শকদের মধ্যে একদল বনরক্ষী আছে, তাদের মধ্যে থেকে আসছে এসব বিরূপ মন্তব্য। অচেনা এই কুস্তিগিরের ওপর খুব রাগ তাদের, কেননা হিউবার্ট নামে নিজেদের এক সতীর্থের ওপর অনেক টাকা বাজি ধরেছে তারা।

এর কাছে সে হেরে গেলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে তাদের। তাই খানিক পর পর লোকটার প্রতি খোঁচা মারা মন্তব্য করছে তারা, 'যতো পারো বাহাদুরি দেখিয়ে নাও। পরে আর সুযোগ পাবে না। হিউবার্ট এসে তোমাকে হাড়ে হাড়ে শিখিয়ে দেবে কুস্তি কাকে বলে। একটা হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকবে না তোমার।'

এমন সব মন্তব্যে সাধারণ দর্শক বরং খুশিই হলো হিউবার্ট মঞ্চে উঠলে একটা ভাল প্রতিযোগিতা দেখা যাবে আশা করে। কিন্তু লোকটা পুরোপুরি হতাশ করল। প্রথমদিকে কিছুক্ষণ ধাপুর-ধুপুর করলেও দৈত্যাকার কুস্তিগিরের সাথে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারল না সে। হিউবার্টকে অনায়াসে মাথার ওপর তুলে নিল অচেনা কুস্তিগির, তারপর দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। চার হাত-পায়ে উইন্ডমিলের পাখার মতো দুই চক্কোর খেয়েই আছড়ে পড়ল হিউবার্ট। পড়েই থাকল।

'ফাউল, ফাউল !' চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানাল রক্ষীরা। 'ফাউল ক্যাচ ! ফাউল থ্রো ! নো থ্রো !' প্রভৃতি বলে মাঠ মাথায় তুলল।

স্যার রিচার্ড তার পাল্টা প্রতিবাদ জানালেন। 'না, না ! কোন ফাউল হয়নি, ঠিকই আছে ! নিয়মের বাইরে কিছু হয়নি এখানে।'

বনরক্ষীরাও সে কথা খুব ভাল করেই জানে, তবু তাদের চেঁচামেচি থামল না। কোনমতে একটা গোলযোগ বাধিয়ে নিজেদের চ্যাম্পিয়নের মান-ইজ্জত রক্ষা করতে চাইছে তারা। তাছাড়া নিজেদের বাজির টাকা যাতে না দিতে হয়, সেটাও একটা কারণ। মঞ্চের চারদিকে হই-চই বাধিয়ে দিল দর্শকরা–কেউ দীর্ঘদেহী পালোয়ানের পক্ষ নিয়ে, কেউ হিউবার্টের পক্ষ নিয়ে।

মানুষ পরেরজনকেই বেশি সমর্থন করছে, কেননা নামি-দামি কুস্তিগিরদের এক এক করে হারিয়ে দিয়ে অনেকেরই বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন লোকটা। তাদের সমর্থকদেরকে ভীষণ অসন্তুষ্ট করে তুলেছে। তার মধ্যেও যারা

আগন্তুক লোকটার পক্ষে মন্তব্য করছে, তারা করছে সে কেবলই 'ভালো খেলোয়াড়' বলে।

লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি ! দীর্ঘদেহী কুস্তিগিরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললেন নাইট। নিশ্চই কোথাও দেখেছি, কিন্তু কোথায় ? কোথায় ? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মনে পড়ে গেছে–ওকে রবিনহুডের আস্তানায় দেখেছিলেন তিনি। এই লোকই হেরিফোর্ডের বিশপকে ধরে নিয়ে এসেছিল। এ-ই রবিনহুডের নির্দেশে গুনে গুনে চারশো পাউন্ড থলিতে ভরে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল।

স্যার রিচার্ডের ধারণাই ঠিক। এই দৈত্যাকার পালোয়ান আসলে লিটল জন। একটা কাজে বেরিয়েছিল সে, কাজ সেরে আস্তানায় ফিরে যাওয়ার পথে মেলার এবং কুস্তির খবর শুনে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে চলে এসেছে। নিজেকে উইল পরিচয় দিয়ে মঞ্চে উঠে পড়েছে।

'মঞ্চ থেকে নামিয়ে দাও ওকে !' ক্রমাগত চিৎকার করছে বনরক্ষীরা। 'প্রথম থেকেই ফাউলের পর ফাউল করে আসছে ব্যাটা। ওকে নামিয়ে দিয়ে নতুন করে খেলা শুরু করা হোক।'

অনেকেই এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানাল, কেননা তাদের কুস্তিগিররা তাহলে আবার লড়ার সুযোগ পাবে। কিন্তু যারা কারও পক্ষের নয়, তারা জোরাল আপত্তি তুলল। তাদের মতে লম্বা কুস্তিগির অনিয়ম কিছু করেনি। এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ করে চরম রূপ নিল গোলযোগ, কয়েকজন বনরক্ষী খোলা তলোয়ার নিয়ে মঞ্চে উঠে পড়ল। লিটল জনকে হুমকি দিতে লাগল, এখনই নেমে না গেলে খুন করে ফেলবে তাকে।

কিন্তু ভুল লোককে ভয় দেখাতে গিয়েছিল তারা। কারণ ভয় কাকে বলে, সেটাই জানা নেই লিটল জনের। রক্ষীদের হুমকি গায়ে না মেখে তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেল সে। স্যার রিচার্ড দেখলেন, লোকটা মৃত্যুর মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাগ্যগুণে যদি না-ও মরে, অন্তত মারাত্মক জখম যে হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই তাড়াতাড়ি নিজের দেহরক্ষীদের নিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে গেলেন।

'থামো !' হুঙ্কার ছাড়লেন নাইট। 'কেউ ওকে আঘাত করবে না।'

শেরিফের লোকজন এ ধমকে কান দিত না, কিন্তু নাইটের সাথে সশস্ত্র দেহরক্ষী রয়েছে, তার ওপর নিরপেক্ষ দর্শকরাও লোকটার পক্ষ নিয়ে মহা হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছে দেখে মানে মানে পিছিয়ে এল।

দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকে স্যার রিচার্ডের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনাকে আমরা চিনি, স্যার ! নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করা যায় আপনার ওপর। আপনি বিচারক হয়ে এর একটা মীমাংসা করে দিন।'

জনতার সমর্থন পেয়ে এগিয়ে গেলেন বৃদ্ধ নাইট। চেঁচিয়ে বললেন, 'দুনিয়ার সবখানে, সবাই জানে ইংরেজরা কখনও অন্যায় করে না। আপনারাই বলুন, এই কি তার উদাহরণ ? ব্যক্তিগত স্বার্থ আর রাগের কাছে আমাদের খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব হেরে যাবে ? এই লোকের প্রতিপক্ষকে ধরার কায়দা, প্যাঁচ বা আছাড় মারার কায়দা আমি নিজে দেখেছি। তার মধ্যে কোন অনিয়ম ছিল না। এ কথা আপনারাও জানেন। প্রতিযোগিতায় যাকে হারাতে পারবো না, তাকে গায়ের জোরে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেবো ? এটাই কি নিষ্পাপ খেলাধুলার নিয়ম ?'

এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই দেখে বিপক্ষের লোকজন চুপ হয়ে গেল। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু বনরক্ষী গজগজ করতে লাগল। তাদের হাবভাবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দেহরক্ষীসহ নাইট স্যার রিচার্ড এসে না পড়লে আজ অনেক দুঃখ ছিল লিটল জনের কপালে।

বিচারকের রায়ে জনই সন্দেহাতীতভাবে বিজয়ী হলো। বাদবাকি পুরস্কারের জন্য নতুন করে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। অনুষ্ঠান শেষ হতে যে পঞ্চম পুরস্কার, অর্থাৎ মদের পিপে পেয়েছে, তার কাছ থেকে পাঁচ মার্ক দিয়ে পিপেটা কিনে নিলেন স্যার রিচার্ড। ঢাকনা খুলে ঘোষণা করে দিলেন, যে যত খুশি মদ খেতে পারে পিপে থেকে।

সাধারণ দর্শকরা তাতে খুশি হলেও বনরক্ষীরা হতে পারল না। চেহারা হাঁড়ির তলার মতো কালো করে বাজির টাকা ঠিকই শোধ করল তারা, কিন্তু বারবার কঠোর দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল লিটল জনের দিকে। পারলে যেন কাঁচা চিবিয়ে খায়। ওদিকে পুরস্কার পাওয়া ঘোড়াটা খুব পছন্দ হওয়ায় সেটা পরখ করে দেখছে জন, এমন সময় দর্শকদের মধ্যে কিভাবে যেন গুজব ছড়িয়ে পড়ল ও রবিনহুডের অনুচর। এই নিয়ে চারদিকে চাপা কানাকানি শুরু হয়ে গেল। স্যার রিচার্ড ছাড়া আরও কেউ নিশ্চয়ই চিনে ফেলেছিল জনকে। ছদ্মবেশ নিয়ে চেহারা আড়াল করতে পারলেও দেহের গঠন আর বিশাল কাঁধ কি করে লুকাবে সে ?

বনরক্ষীরা এ কথা শুনেই খুশিতে লাফিয়ে উঠল। কথাটা সত্যি না মিথ্যে, তা জানার দরকার নেই তাদের। কোন এক বাহানায় ব্যাটাকে বন্দি করতে পারলে ধরে নিয়ে ... সবাই একসাথে চেঁচাতে শুরু করল, 'ডাকাত ! ডাকাত ! ধরো ব্যাটাকে ! রবিনহুডের দলের ডাকাত ও ! ধরো, ধরো !' তলোয়ার বের করে তার দিকে ছুটে গেল।

চিৎকার কানে যেতেই সচকিত হয়ে তাদের দিকে ফিরল জন। মুহূর্তে বুঝে নিল এইবার আসল বিপদে পড়তে যাচ্ছে সে–ধরা একবার পড়লে আর রক্ষে নেই। সাথে সাথে তড়াক করে এক লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসল সে, দু' পায়ের গোড়ালি দিয়ে ওটার পেটে জোরে গুঁতো মেরে তীরবেগে ছুটিয়ে দিল ওটাকে। চারণ কবিদের গানে রবিনহুড এবং তার দলের জনপ্রিয়তার কথা শোনা ছিল জনের, কিন্তু সেদিন হাতে-নাতে প্রমাণ পেল সাধারণ মানুষ তাদেরকে কত গভীরভাবে ভালোবাসে।

ওকে ছুটে আসতে দেখেই চট্ করে ভিড় ফাঁক হয়ে গেল, লোকজন দ্রুত দু' পাশে সরে গিয়ে ওর যাওয়ার পথ করে দিল। তারপর আবার আগের মতো দ্রুত ফাঁকটা বুজে দিতে লাগল যাতে রক্ষীরা অনুসরণ করতে না পারে। হই-হুল্লোড় করে দশ গজের বেশি এগোতে পারল না রক্ষীরা, তার আগেই তুফান বেগে সেতু পেরিয়ে ওপারে চলে গেল জন। তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।

'যাক, বাঁচা গেল,' কোন বিপদ ঘটেনি দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন স্যার রিচার্ড। দেহরক্ষীদের নিয়ে নিজেও ধীরে-সুস্থে শেরউডের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। ওদিকে লিটল জন কোথাও না থেমে এক দৌড়ে আস্তানায় এসে হাজির হলো। রবিনহুড তখন গ্রিনউডের নিচে দশ-বারোজন অনুচরের সাথে কিছু একটা নিয়ে আলাপ করছিল, এমন সময় সেখানে এসে থামল সে। তার ধপধপে সাদা রঙের তাগড়া ঘোড়াটা দেখে প্রশংসার দৃষ্টিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'সুন্দর ঘোড়া ! কি হে, লিটল জন ? এতো সুন্দর ঘোড়াটা কার মাথায় বাড়ি দিয়ে নিয়ে এলে ?'

'কারও মাথায় বাড়ি দিয়ে আনিনি,' হাসল লিটল জন। 'এটা আমার। কুস্তি প্রতিযোগিতায় জিতে পেয়েছি।' মেলার ঘটনা খুলে জানিয়ে বলল, একজন ভালো মানুষ নাইটের সাহায্য না পেলে বনরক্ষীদের হাত থেকে আজ তার রেহাই ছিল না। সেই নাইটই যে স্বয়ং স্যার রিচার্ড, লিটল জন তা বুঝতেই পারেনি। এতই বদলে গেছেন তিনি।

'আমাদের স্যার রিচার্ডকে দেখেছ পথে ?' রবিন জানতে চাইল। 'সেই যে, এক বছর আগে যাঁকে চারশো পাউন্ড ধার দিয়েছিলাম।'

'না তো ! তাঁর আসার কথা নাকি ?'

'হ্যাঁ। আজ সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই টাকা ফেরত দিয়ে যাওয়ার কথা ছিল স্যার রিচার্ডের।'

'তাহলে ঠিকই এসে পড়বেন,' দৃঢ় স্বরে বলল লিটল জন। 'সূর্যাস্তের এখনও দেরি আছে। তাঁকে একজন সৎ লোক বলেই মনে হয়েছে আমার।'

'দেখা যাক,' বলল রবিন। 'এবার কাজের কথা শোনো। আজ আমি ঠিক করেছি মেহমান ছাড়া খাবো না। উইল স্কারলেট আর মাচকে নিয়ে যাও। পথে যাকেই পাবে ধরে নিয়ে আসবে। সে ধনী হলে তার পকেট কিঞ্চিত হালকা করবো আমরা, আর গরিব হলে করবো উল্টোটা। তার পকেট ভারি করে দেবো।'

তীর-ধনুকে সজ্জিত হয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল ওরা। টহল দিতে লাগল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু কারও দেখা নেই। বেশ কিছুক্ষণ পর বার্নসডেল যাওয়ার রাস্তায় এসে দাঁড়াল ওরা। তারপর কিছু একটা দেখে তিনজনই চমকে উঠল একসাথে। একদল লোক আসছে।

'হায়, হায় !' লিটল জন বলল। 'এতো মেহমান নিয়ে গেলে তো আজ আমাদের নিজেদের খাবারেই টান পড়ে যাবে। কারা ওরা ? এতো মানুষ, ঘোড়া, কোত্থেকে আসছে ?'

দলটার আগে দুটো দামি ঘোড়ায় বসা আছে কালো আলখাল্লা পরা দুই যাজক, তাদের পিছনে সাতটা মালবাহী ঘোড়া। সবার পিছনে লাইন দিয়ে আসছে বর্শাধারী বাহান্নজন রক্ষী।

'দুই ফাদারের ঠাঁট-বাট দেখছি বিশপদের চেয়েও বেশি,' বলল মাচ। 'এতো রক্ষী দেখে মনে হচ্ছে অনেক টাকা-পয়সা আছে ওদের কাছে। ভালো। রবিন খুব খুশি হবে আজ।'

'তা বুঝলাম,' লিটল জনকে চিন্তিত মনে হলো। 'কিন্তু আমরা মাত্র তিনজন, এতো লোক সামলাবো কি করে ? আরও লোক যে ডেকে আনবো, সে সময়ও তো নেই ! আমি ভাবছি ...'

অন্য দু'জন চুপ করে থাকল। জানে, এখন ভাবছে লিটল জন। এ সময়ে কথা বলা ঠিক হবে না। '... অথচ ওদেরকে রবিনের সামনে হাজির করতেই হবে,' বিড়বিড় করে বলল সে। পরমুহূর্তে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পেয়েছি ! আমরা যে মাত্র তিনজন, ব্যাটারা তা জানবে কিভাবে ? আরও ছয় কুড়ি লোক যে আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে নেই, বুঝবে কিভাবে ? চলো, সামনের ওই মোড় ঘুরে তৈরি হয়ে থাকি আমরা।'

ঠিকই তো ! ভাবল মাচ আর উইল। এক দৌড়ে জায়গামতো চলে গেল সবাই, রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে দলটার পৌঁছার অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পর বাঁক ঘুরতেই কপালে উঠল দুই ফাদারের চোখ। ধনুকে তীর পরিয়ে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর চেহারার তিন ডাকাত !

দলের সামনের অংশ বাঁক ঘুরতেই তীর ছোড়ার ভয় দেখালো লোকগুলো। 'খবরদার ! যে যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ো,' লিটল জন বলল কড়া গলায়। 'আর এক পা এগোলে ওপরে পাঠিয়ে দেব।'

সাথে সাথে ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল দুই যাজক। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে পুরো দলটা। এলোমেলো হয়ে গেছে।

'শুনুন, ফাদার বাবাজিরা !' বিকট হাসি হাসল লিটল জন। 'পৌঁছতে দেরি করে আজ আমাদের নেতাকে খুব রাগিয়ে দিয়েছো তোমরা। কখন থেকে না খেয়ে আছে বেচারা ! এই সামান্য পথ আসতে এতো দেরি হলো কেন ? ঘুমাতে ঘুমাতে পথ চলেছ নাকি ?'

ভয়ে, বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে দুই যাজক। দানবীয় আকৃতির লোকটার দিকে হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। একটু পর তাদের একজন সাহস করে বলল, 'কে তোমাদের নেতা ?'

'রবিনহুড !' গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। 'রবিনহুড হচ্ছে আমাদের নেতা !'

চেহারা কালো হয়ে গেল যাজকের। 'কে ? যে নিরীহ মানুষদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে, সেই ডাকাতটার কথা বলছো ?'

'মিথ্যে কথা বলছো তুমি !' সত্যি সত্যি রেগে উঠল লিটল জন। 'সে কাজটা তোমরা করছো ! তাই রবিনহুড প্রতিজ্ঞা করেছে, তোমাদের জীবনও সে অতিষ্ঠ করে তুলবে। যা হোক, এখন চলো। রবিন ডেকেছে। আমাদের সাথে খানা খেতে হবে তোমাদেরকে।'

সব ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল উইল ও মাচ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে হলো না। রবিনহুডের নামে জাদু আছে। তাই ওর নাম উচ্চারিত হতে প্রথমে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল রক্ষীদের মধ্যে, তারপর যে যেদিকে পারে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। কারণ তারা জানে, এ সময়ে মালের কাছে থাকলে বেশি বিপদ ঘটার আশঙ্কা আছে। কাজেই বুদ্ধিমানের মতো কেটে পড়েছে। মালবাহী ঘোড়াগুলোর পাশে দুই বালক-ভৃত্য ছাড়া আর কেউ নেই দেখে কলজে শুকিয়ে গেল দুই যাজকের।

'চলো !' কড়া গলায় নির্দেশ দিল লিটল জন। ভীত-সন্ত্রস্ত দুই ফাদারকে তীর-ধনুকের মুখে জায়গামতো নিয়ে চলল উইল আর মাচ। লিটল জন মাল বোঝাই ঘোড়া নিয়ে এগোল। আগের জায়গাতেই ছিল রবিনহুড, ওদের দেখে উঠে এলো। মাথার হুড নামিয়ে স্বাগত জানাল দুই যাজককে। কিন্তু তারা কোন জবাব দিল না। বরং বাঁকা, বিরক্ত নজরে তাকাল ওর দিকে। তাই দেখে রেগে উঠল লিটল জন।

'ছোটলোকের দল কোথাকার !' বলল লিটল জন। দু' পা এগিয়ে গেল তাদের দিকে। 'দাঁড়াও ! ভদ্রতা কাকে বলে, আজ তোমাদেরকে আমি ভালমত শিখিয়ে দেব।'

'এই একটা ব্যাপারে কারও ওপর জোর করতে নেই, লিটল জন,' রবিন শান্ত কণ্ঠে বলল। 'আমাদের ওসব সৌজন্য না হলেও চলবে। যেতে দাও। মোট কতজন ছিল এরা ?'

'অনেক ছিল। প্রায় তিন কুড়ি। কিন্তু আসার সময় এই চারজনকে ছাড়া আর কাউকে পেলাম না। তোমার নাম শুনে সব ভেগেছে।'

'শিঙায় ফুঁ দাও, জন,' রবিন বলল। 'সবাই জানুক অতিথি এসেছে।'

লিটল জনের শিঙার শব্দে হুড়মুড় করে হাজির হলো দলের প্রতিটা অনুচর। ভয় পেয়ে কয়েকবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই যাজক, তারপর তাকাল মালবাহী ঘোড়াগুলোর দিকে। তাই দেখে কারও বুঝতে বাকি রইল না ওগুলোর পিঠে কি থাকতে পারে। একটু পর খেতে বসে গেল সবাই। যাজকদের খুব খাতির-যত্ন করে বসতে দেয়া হলো। নানান সুস্বাদু খাবার তুলে দেয়া হলো তাদের পাতে। খেয়েদেয়ে তৃপ্ত হলো দু'জনেই।

'আপনারা কোত্থেকে আসছেন, ফাদার ?' খাওয়া শেষে বিশ্রামের ফাঁকে জানতে চাইল রবিনহুড।

'সেইন্ট মেরি থেকে,' একজন বলল। 'সেখানকার অ্যাবিতে আছি আমরা।'

হেসে উঠল ও। 'আপনি কোন পদে আছেন সেখানে ?'

'তহসিলদার,' ভারিক্কি চালে বলল লোকটা। কথাটা শুনেই ও আবার হাসতে শুরু করেছে দেখে জানতে চাইল, 'এর মধ্যে হাসির কি হলো ?'

'মাফ করবেন, ফাদার। হাসি এসে যাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগছে, ঠিক আজকের দিনেই এমেট অ্যাবির তহসিলদার এসে হাজির হলেন এখানে ?'

'কেন ? আজকের দিনের বিশেষত্ব কি ?' প্রশ্ন করল যাজক।

'না, মানে, ঠিক এক বছর আগের এই দিনটিতে একজনকে চারশো পাউন্ড ধার দিয়েছিলাম আমি,' বলল ও। 'আপনাদের লর্ড বিশপের ধারের টাকা ফেরত দিয়ে তার খপ্পর থেকে নিজের জমিদারির বন্ধকি দলিলপত্র উদ্ধার করে আনার জন্যে। আজ সেই ধারের টাকা শোধ দেয়ার কথা। ভাবছি, আপনাকে সেই ধার শোধ করতেই পাঠানো হলো কি না।'

'আমাকে !' আঁতকে উঠল লোকটা। 'না, না ! আমি কোন টাকা-পয়সা আনিনি। এতো টাকা কাকে ধার দিয়েছো তুমি ?'

'একজন নাইটকে।'

'তাহলে সে-ই তার দেনা শোধ করবে !

'আমি আরও ভাবলাম, আপনাদের লর্ড বিশপ বুঝি টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন,' হেসে বলল রবিন। ইঙ্গিতে মালবাহী ঘোড়াগুলো দেখালো। 'ওগুলোর পিঠে কি, টাকা-পয়সা ?'

'না, না ! আমাদের সাথে টাকা-পয়সা কিছু নেই,' ব্যস্ত হয়ে জবাব দিল তহসিলদার। 'কিছু পুরনো জামা-কাপড় আছে, আর টুকটাক এটা-ওটা।'

'টাকা-পয়সা নেই !' অবাক হলো ও। 'এতো লোকজন নিয়ে চলেছেন, অথচ বলছেন, টাকা-পয়সা নেই ? পথ-খরচও না ?'

'একেবারে কিছুই নেই, তা নয়। কিছু আছে,' তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিল তহসিলদার। 'খুব সামান্য। এই ধরো, বিশ মার্কের মতো। এছাড়া তেমন কিছু নেই। তোমার মালপত্র খুলে দেখার কষ্টটাও পোষাবে না।'

'তা হোক। কিছু না থাকলে নেই, কিন্তু তবু খুলে দেখাটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, ফাদার। কে বলতে পারে, হয়তো আপনার অজান্তেই ঈশ্বরের তরফ থেকে কিছু পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। এমনও তো হতে পারে, সেই নাইটের ধারের টাকাটা তিনি আপনাদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছেন ! খুলে হয়তো দেখা যাবে, আপনার সেই বিশ মার্কই অলৌকিভাবে বেড়ে বহুগুণ হয়ে গেছে।' লিটল জনের দিকে ফিরল রবিন। 'বাক্সগুলো খোলো দেখি, জন !'

ঘাসের ওপর একটা কাপড় বিছিয়ে নিল সে, তারপর ক্যাশ বাক্সের মতো দেখতে দুটো বাক্স নামিয়ে আনলো ঘোড়ার পিঠ থেকে। গায়ের জোর খাটিয়ে খোলা হলো ওগুলো। প্রথমটা থেকে অনেকগুলো সোনার মুদ্রা বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল কাপড়ের ওপর।

'কি আশ্চর্য !' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কি অলৌকিক কারবার দেখেছেন ? ঈশ্বর চাইলে কি না হয় ? বলেছিলাম না, তিনি চাইলে আপনার বিশ মার্ক বেড়ে অনেকগুণ বেশি হয়ে যেতে পারে ?'

একটু পর দ্বিতীয় বাক্সটা খুলল লিটল জন। সেটা থেকেও একরাশ সোনার মুদ্রা ঝরে পড়ল দেখে রীতিমত হা হা করে উঠল ওরা। 'আশ্চর্য, আশ্চর্য ! কি আশ্চর্য !' অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখেছে। কিন্তু তহসিলদারের চেহারা আঁধার। কপাল এমনভাবে কুঁচকে আছে যে দুই ভুরু এক হয়ে গেছে।

'সবগুলো মুদ্রা গুনে ফেলো, লিটল জন।'

'আটশো পাউন্ডের কিছু বেশি আছে এখানে,' গোনা শেষ হলে মুদ্রাগুলো গোছাতে লাগল সে।

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তাহলে ফাদারকে ওখান থেকে তাঁর বিশ মার্ক দিয়ে দাও।' লিটল জন আবার গোনার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে তহসিলদারের দিকে ফিরল। 'আপনারা ঈশ্বরের পথের মানুষ, ফাদার। আপনারা নির্লোভ, সত্যবাদী মহাপুরুষ। তাই আপনাদের একটা পয়সাও রাখবো না আমরা। আপনিই বলেছেন, বিশ মার্কের বেশি একটা ফুটো পয়সাও নেই আপনার কাছে। কিন্তু এখন যা বোঝা যাচ্ছে, এই যে বাড়তি টাকাগুলো, নিশ্চই ঈশ্বর তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে এই বাক্সে ভরে দিয়েছেন। মনে হয় নাইটকে যা ধার দিয়েছিলাম, তা দ্বিগুণ দিয়েছেন তিনি। আমরা তাঁর দান খুশি মনে গ্রহণ করলাম।'

মুহূর্তের মধ্যে নিরীহ, ভালোমানুষি ভাবটা উধাও হয়ে গেল তহসিলদারের চেহারা থেকে। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল সে, মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল সবকিছু ভুলে।

'চোর কোথাকার ! গুণ্ডা ! লর্ড বিশপের সম্পদ ওসব। ভালো চাও তো এখনই ফেরত দাও, নইলে ভয়ঙ্কর অভিশাপ নেমে আসবে তোমাদের ওপর মনে রেখো। ঘণ্টা, পবিত্র বাইবেল আর মোমবাতির সাহায্যে এমন অভিশাপ দেবেন তিনি ইহকাল-পরকাল, কোথাও তোমাদের ঠাঁই হবে না।'

'কলা হবে !' বুড়ো আঙুল দেখাল ও। 'তোমার বিশপের অভিশাপের পরোয়া করি না আমরা। তার চেয়ে বড় টাকার পিশাচ, বড় নিষ্ঠুর আর নিচ লোক সারা ইংল্যান্ডে দ্বিতীয়টি নেই। গরিব মানুষদের রোজগার ধর্মের নামে করে কেড়ে নিতে, অসহায় বিধবার মুখের খাবার কেড়ে নিতে তার বিবেকে একটুও বাধে না। ওরকম লোকের অভিশাপে কিছু হবে না।'

থেমে লিটল জনের দিকে ফিরল রবিনহুড। 'লিটল জন, এদের ঘোড়া দুটো দিয়ে দাও। মালপত্রসহ বাকি ঘোড়াগুলো আমরা দিচ্ছি না।'

এরপর কপালে মারধর আছে ভেবে ভয়ে ভয়ে ছিল দুই যাজক, কিন্তু অক্ষত অবস্থায় চলে যওয়ার সুযোগ পেয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সেখানে। তখনই রওনা হয়ে গেল দুই ভৃত্যকে নিয়ে। তারা চোখের আড়ালে যেতে পারার আগেই আরেক পথে সদলবলে শেরউডে এসে হাজির হলেন স্যার রিচার্ড। ওদের কাছে এসে হাসলেন।

'তোমাদের ওপর স্বর্গের শান্তি নেমে আসুক,' বললেন তিনি। 'রবিন, তুমি কেমন আছো?'

'ভালো, স্যার নাইট। আসুন, গ্রিনউডে স্বাগতম। দেনা শোধের ব্যাপারটা ভালোভাবেই মিটেছিল তো?'

'হ্যাঁ। সেদিন আমি টাকা নিয়ে হাজির হতেই মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল ফাদারের। বেচারীর বড় আশা ছিল আমার সম্পত্তি গিলে খাবে। তোমাকে ধন্যবাদ, রবিন। কারণ সেসব তোমার সাহায্যেই রক্ষা করা গেছে। গত এক বছর প্রচুর পরিশ্রম করে আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে উঠে আসতে পেরেছি আমি। আয় কয়েক গুণ বেড়ে গেছে। তাই ওয়াদা অনুযায়ী আজ তোমার টাকা ফেরত দিতে এলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আমি ভাবলাম, আজ হয়তো আপনি আসছেন না।'

'পথে দেরি হয়ে গেল,' বললেন বৃদ্ধ নাইট। 'আসার সময়ে দেখলাম এক জায়গায় মেলা হচ্ছে। সেখানে কুস্তি প্রতিযোগিতাও হচ্ছে দেখে কিছুক্ষণের জন্যে থামলাম। দেখি, যে সেরা কুস্তিগির হয়েছে, তাকে অন্যায়ভাবে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে কিছু বদ লোক। লোকটা আবার একা ছিল, সঙ্গী-সাথি কেউ নেই। তার ওপর মনে হলো লোকটাকে তোমার এখানে সম্ভবত দেখেছি আমি। তাই ফলাফল কি হয়, দেখার জন্যে থেকে গেলাম। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।'

লিটল জন সামনে এগিয়ে এলো। 'আমিই সেই লোক, স্যার নাইট। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সময়মতো আপনার সাহায্য না পেলে হয়তো বনরক্ষীদের হাতেই আজ আমাকে মরতে হতো। কিন্তু আপনার চেহারা এতো বেশি বদলে গেছে, যার কারণে আমি চিনতেই পারিনি।'

'আমার তরফ থেকেও আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার নাইট,' রবিন বলল। 'আমার লোককে সাহায্য করা আর আমাকে সাহায্য করা একই কথা। লিটল জন আমার ডান হাত। ওকে হারালে আমি পঙ্গু হয়ে যেতাম।'

হাসলেন নাইট। 'তোমাদের কোন কাজে আসতে পেরেছি বলে আমি খুশি। কিন্তু এ তো সামান্য ব্যাপার। তোমরা আমার জন্যে যা করেছো, তার তুলনায়

কিছুই নয়। আমি আর আমার স্ত্রী যতোদিন বেঁচে আছি, মনে রাখবে, ততোদিন স্যার রিচার্ডে দুর্গের দরজা তোমাদের জন্যে সব সময় খোলা থাকবে।' কথা শেষ করে একটা সোনার মোহর ভর্তি থলি বের করলেন বৃদ্ধ। 'এই যে তোমার চারশো পাউন্ড। আর তোমাদের জন্যে আমার স্ত্রী কিছু উপহার পাঠিয়েছেন, সেগুলো ঘোড়ার পিঠে আছে।'

'উপহার নিতে পারি, স্যার রিচার্ড,' হাসল রবিন। 'কিন্তু টাকার আর দরকার নেই। সে ধার শোধ হয়ে গেছে।'

আকাশ থেকে পড়লেন নাইট। 'শোধ হয়ে গেছে মানে ! কি বলছো তুমি, রবিন ? দুনিয়ায় আমার এমন কেউ নেই যে আমার জন্যে এতোগুলো টাকা খরচ করতে যাবে !'

'কিন্তু তারপরও শোধ হয়ে গেছে টাকাটা,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'আপনি শুনে অবাক হবেন, টাকাটা এমেটের ফাদার সুপিরিয়রের কাছ থেকেই এসেছে। আপনাকে যতো ধার দিয়েছিলাম, তার দ্বিগুণ।'

'অ-সম্ভব !' জোর দিয়ে বললেন স্যার রিচার্ড। 'ওই চর্বির ডিপো, দুনিয়ার লোভী আর হাড় কিপ্টে লোকটা শোধ করবে আমার ধারের টাকা ! তা-ও দ্বিগুণ ! আমি বিশ্বাস করি না। স্বেচ্ছায় ... অসম্ভব !'

'ঠিক স্বেচ্ছায় নয় অবশ্য ... ' হাসল রবিন।

ওর মুখ থেকে একটু আগে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনাটা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন নাইট। বললেন, 'ভালোই কায়দা করেছিলে।' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'কিন্তু আমাকে ঋণমুক্ত হতে দেয়ার ব্যাপারে তোমার বাধা দেয়া ঠিক হবে না, রবিন। এই নাও, এতে পুরো চারশো পাউন্ড আছে।'

রবিন বুঝল, এ নিয়ে জোর করতে গেলে তিক্ততাই শুধু বাড়বে। আর কোন লাভ হবে না। তাই আর চাপাচাপি করল না।

বলল, 'বেশ, ধার যখন নিয়েছেন, শোধও নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু এখন থাক। আগে খাওয়া-দাওয়া হোক। এতো পথ আসতে গিয়ে নিশ্চয়ই খিদে লেগে গেছে আপনাদের।'

রবিনহুডের নির্দেশে সেদিন আরেকবার ভুরিভোজের আয়োজন করা হলো স্যার রিচার্ডের সম্মানে। খাওয়া শেষ হতে নিজের লোকদেরকে ঘোড়ার পিঠ থেকে সবকিছু নামিয়ে আনতে বললেন নাইট। তারপর চারশো পাউন্ড ভর্তি থলিটা রবিনের হাতে তুলে দিয়ে সবার উদ্দেশে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন। বললেন, 'বন্ধুগণ, আমার চরম বিপদের দিনে তোমরা আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলে, তাই আমি জীবনের মস্তবড় একটা সঙ্কট, ভয়ঙ্কর একটা বিপদ কাটিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছি। সেদিন তোমাদের সাহায্য না পেলে আমি একেবারেই নিঃস্ব, পথের ফকির হয়ে যেতাম। দুর্দশার সীমা থাকত না আমার।

'কাজেই আমি আর আমার স্ত্রী যে তোমাদের কাছে কতোখানি কৃতজ্ঞ, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। শুধু টাকা ফেরত দিয়েই এ ঋণ শোধ করা যায় না। তাই আমাদের দু'জনের ভালোবাসার নমুনা হিসেবে তোমাদের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি আমি। তোমরা তা গ্রহণ করলে আমি নিজেকে সত্যিই ধন্য মনে করবো।' কথা শেষ করে নিজের লোকদের প্যাকেটগুলো খোলার নির্দেশ দিলেন তিনি।

সেগুলো থেকে যা বের হলো, দেখেই মহা হই-হুল্লোড় বাধিয়ে দিল সবাই। স্প্যানিশ ইউ কাঠের তৈরি দুশো ধনুক নিয়ে এসেছেন স্যার রিচার্ড। বার্নিশ করা, ঝকঝক করছে। তার একদিক চমৎকার নকশা করা রূপার পাত দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে অথচ ধনুকের শক্তি কোনভাবে কমে না যায়।

তারপর বের হলো সোনার কারুকাজ করা দুশো চামড়ার তূণ। সবগুলো তূণে বিশটা করে তীর আছে। সেগুলোর চওড়া ফলা রূপার মতো চকচক করছে। তীরের গোড়ায় রূপার আংটা রয়েছে, আর আছে ময়ূরের পালক। সবার হাতে একটা করে ধনুক ও তীরভর্তি তূণ তুলে দিলেন স্যার রিচার্ড। রবিনকে দিলেন সোনার কারুকাজ করা অপূর্ব সুন্দর, বিশাল এক ধনুক এবং একই রকম কারুকাজ করা তূণ।

এত সুন্দর উপহার পেয়ে সবাই অসম্ভব খুশি হলো। মাথার ওপরে ধনুক তুলে ধরে শপথ নিল–স্যার রিচার্ডের যে কোন বিপদে-আপদে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে তারা। প্রয়োজন হলে মরতেও দ্বিধা করবে না। বিদায়ের সময় মশাল হাতে রবিন ও তার লোকেরা বনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলো নাইটকে। যাওয়ার সময় ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থাতেই ঝুঁকে রবিনের দু' গালে চুমো দিলেন তিনি, তারপর রওনা হয়ে গেলেন নিজ দুর্গের উদ্দেশে।

'এরকম একজন মহৎ লোককে সাহায্য করেও আনন্দ আছে, তাই না ?'

মাথা ঝাঁকাল লিটল জন।

রবিনহুড ও পিটারবরোর বিশপ

সবার সামনে এতবড় অপদস্থ হওয়ার কথা এত সহজে ভোলার মানুষ নয় পিটারবরো গির্জার বিশপ। সে ভাবতে লাগল, কি করে এর উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়া যায়। প্রথমেই নটিংহ্যামের শেরিফের কথা মনে পড়ল, কাজেই তার দুয়ারে ধর্ণা দিতে গেল সে।

'মাস্টার শেরিফ, আমাকে এক কোম্পানি সৈন্য ও তীরন্দাজ দিন। আমি শয়তান রবিনহুডকে পাকড়াও করতে যাব।'

'মাই লর্ড বিশপ,' শেরিফ জবাব দিল। 'আমি অনেকবার অনেকভাবে সে চেষ্টা করেছি। রবিনহুড এবং তার সাগরেদদেরকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলে আমার মত খুশি কেউ হতো না। কিন্তু তা আসলে সম্ভব নয়, কারণ এদিকের লোকজনের সাথে রবিনের কড়া ঐক্য আছে। তারা সবাই ওকে সমর্থন করে।'

'তাহলে আমি নাইট আর ব্যারনদের কাছ যাব,' বিশপ রাগ গলায় বলল। 'তাদের সাথে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকটার কোন ঐক্য নেই ?'

দুঃখিত চেহারায় মাথা নাড়ল শেরিফ। 'তাদের কাছ থেকেও তেমন সাহায্য পাবেন বলে মনে হয় না। নিচু স্তরের নাইটরা রবিনকে আক্রমণ করার সাহসই পাবে না, কারণ তারা লোকটাকে ভয় করে। তাহলে তাদের বাড়ি-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে রবিন। তাদের হাঁস-মুরগি, গবাদি পশুর পাল তাড়িয়ে দিতে পারে।'

'তাহলে ব্যারনদের কাছে যাব !' বিশপ জোর দিয়ে বলল। 'ওইসব চোর-ডাকাত ব্যারনদের সুরক্ষিত দুর্গ তো পুড়িয়ে দিতে পারবে না।'

'আমি যতদূর জানি, রবিনের দলের লোকসংখ্যা এখন তিনশো ছাড়িয়ে গেছে। তবু আমি জানি ব্যারনরা আপনাকে সাহায্য করবেই। সে নিজেদের লোক দিয়েই হোক, বা ভূমিদাসদের দিয়ে হোক, আপনাকে তারা সহায়তা করবেই। কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু তারা সংখ্যায় যতই হোক, তাদের সাহায্য নিয়ে অন্তত রবিনকে ধরতে পারবেন না আপনি। এই অপারগতার জন্যে কাউকে দায়ী করতেও পারবেন না। ওদিকে রবিন ঠিকই সময়মত খবর পেয়ে ব্রানসডেল বা প্লম্পটন, অথবা ডেলামেয়ার বা পেনডেলে সরে পড়বে।'

'তাহলে কি করা যায় ?'

'আচমকা ধরার চেষ্টা করুন ব্যাটাকে,' শেরিফ পরামর্শ দিল। 'কিছু বুঝে ওঠার আগেই। স্যার গাই অভ গিসবোর্নের কাছে গেলে কাজ হতো। কিন্তু এখন সে যুবরাজ জনের হয়ে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত আছে। আপনি আমার বাড়ির সরকার, ওরম্যানকে নিয়ে যান। লোকটা কিছুদিন আগেও রবিনহুডের স্টুয়ার্ড ছিল। সে সাহায্য করবে আপনাকে। কারণ রবিনকে ঘৃণা করে লোকটা। বিশ-ত্রিশজন লোক নিয়ে তার সাথে দেখা করুন গিয়ে। সে নিশ্চয়ই কোন উপায় খুঁজে ... '

***

হরিণ শিকার করার জন্য বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে রবিনহুড, এমন সময় এক তীর্থযাত্রীর সাথে দেখা হয়ে গেল। বুড়ো মানুষ, পোশাক-পরিচ্ছদও ভাল না। ছেঁড়া-ফাটা। কাঁধে ভিখারির মত ব্যাগ নিয়ে ঘুরছে।

রবিনকে দেখে চড়া, ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল লোকটা, 'স্যার, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে বনেই থাকেন। রবিনহুডকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বলতে পারেন ? তাকে খুব জরুরি একটা খবর পৌঁছে দিতে হবে।'

'কিসের এত জরুরি খবর ?' রবিন বলল।

'খুব খারাপ খবর, স্যার,' ক্যাটকেটে গলায় বলল বৃদ্ধ। 'মাস্টার শেরিফের সরকার, মাস্টার ওরম্যান, খুব খারাপ মানুষ। বনের আইন রক্ষার নামে সে বড় ভয়ঙ্কর এক কাজ করতে যাচ্ছে, স্যার। আরও চারজন আছে তার সাথে। উফ্, সে দুঃখের কথা আর কি বলব, স্যার ! কোত্থেকে তিনটা ছেলেকে হরিণ মারার অপরাধে ধরে এনেছে। তাদের দু'টোকে নাকি ফাঁসি দেয়া হবে শুনেছি। বাকি ছেলেটার চোখ উপড়ে নেবে।'

'কোথায় ?' গম্ভীর হয়ে উঠল রবিন।

'এখান থেকে বেশি দূরে না, স্যার ! ছোট নদীর পারে একটা কুটির আছে না ? এক বিধবা বুড়ির ? তার এক ছেলেও আছে সেই তিন হতভাগ্যের মধ্যে, স্যার। আহা, গরিব ...'

'কোথায় ফাঁসি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে ?'

'এখনও দেয়া হয়নি। জল্লাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।'

কিছুটা আশ্বস্ত হলো রবিন। বলল, 'ঠিক আছে। এবার তাড়াতাড়ি করো , বাপু ! তোমার পোশাক কিছু সময়ের জন্য ধার দাও আমাকে। এই নাও চল্লিশ শিলিং। ওগুলোর দাম।'

'কিন্তু আমার গাউন তো ছেঁড়া, স্যার !' আপত্তির সুরে বলল তীর্থযাত্রী। 'তারচেয়ে আপনি ... স্যার ! আপনি এক বুড়ো তীর্থযাত্রীর জিনিসপত্র ডাকাতি করতে যাচ্ছেন না তো ?'

'না !' দ্রুত বলল রবিন। 'আমি রবিনহুড। তোমার মত গরিবের জিনিস কেড়ে নিই না। এই নাও তোমার টাকা। তাড়াতাড়ি গাউন খোলা !'

'রবিনহুড !' চেঁচিয়ে বলল বৃদ্ধ। 'ওহ্, তাহলে কোন চিন্তা নেই।' বলে দ্রুত হাতে পোশাক খুলে ফেলল।

সেটা পরে নিল রবিন। অদ্ভুত গাউন। সারা জায়গায় কালো, নীল আর লাল রঙের তালি মারা। ভেতরদিকে ব্যাগের মত অনেকগুলো পকেট–ওগুলোর মধ্যে খাবার-দাবার থাকে হয়তো। মাথায় তার পুরনো, নোংরা হ্যাট চাপিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ছোট নদীটার দিকে চলল রবিন। সেখানে বুড়ির ভাঙাচোরা কাঠের ঘর ছাড়িয়ে আরও খানিক দূর যেতে কয়েকজন বনরক্ষীর ওপর চোখ পড়ল।

বড় আগুনের কুণ্ড জ্বেলে সেটাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে লোকগুলো। ওরম্যান তার ঘোড়ায় লাগাম ধরে বসা। কাছের এক গাছের ডাল থেকে দড়ির মাথায় ঝুলছে একটা দেহ। এখনও একটু একটু ঝাঁকি খাচ্ছে লোকটা, তবে মরে গেছে সন্দেহ নেই।

'খুব সহজ মৃত্যু,' বলে শব্দ করে হাসল ওরম্যান। 'আমি পায়ের নিচ থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিতেই ঝুপ করে পড়ল আর ঝাঁকির চোটে ঘাড় ভেঙে মরল। একজন সত্যিকারের জল্লাদ পাওয়া গেলে ভাল হতো। আরেকটাকে ঝোলানোর কাজ তাকে দিয়েই করাতাম।'

'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন, মাস্টার ফরেস্টার,' রবিনহুড বলে উঠল। লোকগুলোর অজান্তে কাছে চলে এসেছে ও। 'আপনার একজন সত্যিকারের জল্লাদ দরকার শুনলাম যেন ?'

'তুমি ঠিকই শুনেছ, বুড়ো,' ওরম্যান বলল।

'কাজটা যদি আমি করে দিই, কি দেবেন আপনি ?'

'এক সেট নতুন কাপড়, যা তোমার সবচে' বেশি দরকার। আর একটা স্বর্ণমুদ্রা, যদি তুমি আইন ভঙ্গকারী আরেক ব্যাটার দু' চোখ অন্ধ করে দিতে পরো।'

'দড়ি আর রড নিয়ে আসুন ! রবিন বলল। 'তারপর আমি দেখাচ্ছি এ কাজ কিভাবে করতে হয়।'

'বুড়ো যা চায় দাও,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিল ওরম্যান।

দড়ি ও চোখ ফুটো করার রড হাতে পেয়ে কাছের বিশাল একটা ওক গাছে উঠে পড়ল। তাই দেখে হাসল ওরম্যান। বলল, 'আমার মনে হয় তুমি বুড়ো হলেও এখন পর্যন্ত বেশ চটপটে আছ। তাড়াতাড়ি বাঁধো দড়ি। একটা বিশ্বাসঘাতককে অনেকদিন থেকে ঝোলাতে চাইছি আমি।'

'আমি কখনও কাউকে ফাঁসিতে ঝোলাইনি,' রবিন বলল তীর্থযাত্রীর মত গলা করে। 'এই বয়সে তেমন কিছু করার ইচ্ছেও নেই। ও কাজ যারা করে, তাদের ওপর ঈশ্বরের গজব পড়ুক।'

'এ কথার অর্থ কি ?' বলল চিন্তিত ওরম্যান।

জবাব দিল না রবিন। গাউনের ভেতরের এক পকেটে রাখা শিঙাটা বের করে জোরে ফুঁ দিল।

হেসে উঠল ওরম্যান। 'বাজাও, বাজাও ! চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে না পড়া পর্যন্ত যত খুশি বাজাতে থাকো। তাতে অবশ্য ও দু'টো গরম শিক দিয়ে পোড়াবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবো আমি।'

চোখের কোনা দিয়ে শেরিফের লিভারি পরা কিছু লোককে সতর্ক পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল রবিন–বাঁ দিক থেকে আসছে তারা। ডানদিক থেকে আসছে আরেক দল–পিটারবরোর বিশপ এবং তার কয়েকজন অনুসারী।

ফাঁদ !

এটা ওরম্যানের পাতা ফাঁদ–ভাবল রবিন। না বুঝে তাতে পা দিয়ে ফেলেছে ও। অমনি সব ফেলে প্রাণপণে দৌড় লাগাল। পিছন থেকে ওরম্যান চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরো ওকে ! ওই যায় রবিনহুড ! ধরো, ধরো ! সাবধান, পালাতে পারে না যেন !'

কোনদিক তাকাল না রবিন, ঝড়ের গতিতে দৌড়ে সবার চোখের আড়ালে এসে পড়ল। তারপর দিক বদলে বুড়ির কুটিরের দিকে ছুটল। কুটিরটা একটু উঁচুতে, সিঁড়ির মত চুনা পাথরের চওড়া কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে উঠতে হয়। লাফিয়ে লাফিয়ে ধাপগুলো পেরিয়ে এল ও। কাঠের দরজা খোলাই ছিল, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল বুড়ি।

'ভয় পেয়ো না, মা !' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'ভয় পেয়ো না। আমি রবিনহুড। পিটারবরোর বিশপ আর শেরিফের লোকদের তাড়া খেয়ে তোমার এখানে লুকাতে এসেছি। ওরা টের পেয়ে গেলে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

'তুমি !' মুখে হাত চাপা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকাল বুড়ি। 'কিছু মনে করো না। এই অদ্ভুত পোশাকে তোমাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু ওরা কখনও তোমার নাগাল পাবে না। অসম্ভব ! ওরা তোমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না। আমার অনেক বিপদে তুমি আমাকে সাহায্য করেছ। আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন খেতে দিয়েছ। ওরা ... '

'কথা বলার সময় নেই, মা। ওরা এখনই এসে পড়বে।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি এসো, আমার সাথে পোশাক বদলে নাও। তোমার লিঙ্কন গ্রিন আর গাউন ... '

একটু পর যখন কুটিরের দরজায় প্রথম সৈন্যটি দেখা দিল, এক বুড়িকে পিছন ফিরে চুলার ওপর ঝুঁকে কিছু করতে দেখল সে। চিৎকার করে জানতে চাইল 'কোথায় গেল বিশ্বাসঘাতক রবিনহুড ?'

'রবিনহুড !' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল বুড়ি। 'আমি তার কি জানি ?'

এই সময় ওরম্যান এসে দাঁড়াল দরজায়। নিজের লোকদেরকে নির্দেশ দিল, 'ঘরের মধ্যে খুঁজে দেখো !'

বেশি খুঁজতে হলো না। অল্প সময়ের মধ্যেই রবিনহুডের পোশাক পরা বুড়িকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল তারা। তাকে মুখ নিচু করে রাখতে দেখে আনন্দে ফেটে পড়ল ওরম্যান। সে ভাবছে লজ্জায় মুখ তুলছে না রবিনহুড।

'বিশ্বাসঘাতকটাকে পাওয়া গেছে তাহলে ? নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। অনেকদিন তোমার ভয়ে ভয়ে ছিলাম, রবিনহুড। আজ আমার ভয় গেছে, এখন তোমার পালা। চোখ অন্ধ করার লোহা যতক্ষণ গরম না হচ্ছে, ততক্ষণ তোমাকে ভয়ে ভয়ে কাটাতে হবে। কাজটা আমি নিজের হাতে করব। তবে তার আগে তোমার ডান হাতের প্রথম দুই আঙুলও কাটব, যে দুটো দিয়ে তুমি রাজার হরিণ অবৈধভাবে শিকার করো। ঠিক করেছি, তোমাকে ছিলায় ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়াটাই ঠিক হবে। ন্যায়বিচার ...'

'কে ওটা ?' পিটারবরোর বিশপ বলে উঠল। 'বিশ্বাসঘাতক রবিনহুড নাকি ? ধরা পড়ল তাহলে ?'

'হ্যাঁ, মাই লর্ড। অবশেষে ধরা পড়েছে। ফাঁদ ভালই পাতা হয়েছিল। আমি জানি, ব্যাটাকে কিভাবে পাকড়াও করতে হবে। হা হা হা !'

'আপনার জন্যে অনেক লোভনীয় পুরস্কার অপেক্ষা করছে, মাস্টার ওরম্যান,' বিশপ বলল। 'ওকে ঘোড়ার পিছনদিকে ফিরিয়ে স্যাডলে বসিয়ে দিন। তারপর নটিংহ্যামে দিকে চলুন।'

কাজ সেরে গল্প করতে করতে ফিরে চলল দলটা। রবিনকে ধরতে পারার আনন্দে কোনদিকে খেয়াল নেই বিশপের। হাসছে, কৌতুক করছে। যেখানে একটু আগে একজনকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল, সেখানে পৌঁছল তারা। ঝুলন্ত লাশ দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল বিশপ। 'এই গাছে তো অদ্ভুত ফল ধরে ! মাস্টার ওরম্যান, পুরো ব্যাপারটাই কি সাজানো ? শুধু রবিনকে ধরার জন্যেই আয়োজন করা হয়েছে ?'

'না,' বলল ওরম্যান। 'ও ব্যাটা রাজা জনের তিনটা হরিণ মেরেছিল,' ইঙ্গিতে লাশটা দেখাল।

'রাজা জন ?' হাসি ফুটল বিশপের মুখে।

'হ্যাঁ, রাজা জন। তিনিই এখন রাজা, কারণ এতদিনে রিচার্ড নিশ্চয়ই মরে গেছে। চলুন, চলুন। আরও দু'টোকে ফাঁসি দেয়া বাকি আছে এখনও। রবিনহুডের মত বিপজ্জনক বন্দিকে নিয়ে বেশি সময় বনের মধ্যে থাকা ঠিক হবে না।'

বনরক্ষীদের প্রধানের দিকে ফিরল ওরম্যান। 'আপনার লোকদের দিয়ে লোক দুটোকে ওই গাছে ঝোলাবার ব্যবস্থা করুন। ওদেরকে আমার ঘোড়ার স্যাডলে তুলে গলায় ফাঁস পরান, তারপর আমি সময়মত ঘোড়া সরিয়ে নেব।'

দড়ি বাঁধা হলে ওকের ডালে। বাকি দুই অপরাধীকে নিয়ে আসা হলো সেখানে। দু'জনই অল্প বয়সী। বড়জোর পনেরো-ষোলো বছর বয়স হবে। তাদের

একজনকে স্যাডলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দু'হাত পিছনে বাঁধা হলো। তারপর ফাঁস পরিয়ে দেয়া হলো গলায়। ওরম্যান বলল, 'আমি শিস বাজালে আমার ঘোড়া দৌড় দেবে। ওটা আমার সঙ্কেত ... '

লোকটার কথা শেষ হওয়ার আগেই অনেকটা শিসের মত এক ধরনের শব্দ উঠল, তবে ওরম্যান বাজাচ্ছে না।

এক মুহূর্ত পর শব্দের উৎসটাকে দেখা গেল। একটা তীর-উড়ে এসে চোখের পলকে ফাঁসির দড়িটা কেটে দিয়ে গেল। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা তরুণ ঝপ্ করে বসে পড়ল স্যাডলে, হিল দিয়ে ঘোড়ার পেটে জোরে আঘাত করতেই লাফিয়ে উঠে ছুট লাগল ওরম্যানের ঘোড়া। ছেলেটার হাত দেহের পিছনে বাঁধাই থাকল।

'কে তীর ছুড়ল ?' বলল বিস্মিত বিশপ, পরমুহূর্তে কিছু একটা দেখে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল তার। চোয়াল ঝুলে পড়ল। তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে একদল লিঙ্কন গ্রীন পরা তীরন্দাজ। কোম্পানির পর কোম্পানি ছুটে আসছে তারা, ধনুকে তীর প্রস্তুত।

'ওই যে আসছে রবিনহুড !' তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল ঘোড়ার পিঠে উল্টো করে বসিয়ে রাখা বুড়ি। এতক্ষণে মুখ তুলেছে সে। সবাই চরম বিস্ময়ে তাকে দেখছে খেয়াল করে খনখনে গলায় হা হা করে হেসে উঠল। 'দেখতেই পাচ্ছ আমি রবিনহুড না। রবিনহুড ওই যে আসছে।'

বুড়ির নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে 'কোঁৎ !' করে ঢোঁক গিলল বিশপ। 'রবিনহুড !' ভয়ে ঠক ঠক কাঁপতে লাগল।

ওদিকে ওরম্যানের চেহারা হয়েছে দেখার মত। একদম সবুজ হয়ে গেছে, কাঁপতে কাঁপতে একেবারে পড়ে যাওয়ার দশা হলো তার। তারপরও নিজের লোকদের দিকে ফিরল সে। 'তীর ছোড়ো !' ভাঙা গলায় কোনমতে বলল সে। 'তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো ওদের ... !'

কে শোনে কার কথা ! তীর-ধনুক ফেলে খিঁচে দৌড় লাগাল তারা। লিঙ্কন গ্রিন পরা দলের বৃত্তটা তাদের জন্য রাস্তা করে দিতে একটু ফাঁক হলো, বেরিয়ে যেতে আবার বুজে এল। ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল রবিন। বিশপ ও ওরম্যান যেখানে দাঁড়ানো, সেখানে এসে থামল। আরও দু'জন যাজক আছে তাদের সাথে। তেমন ভীত মনে হলো না তাদের। ধরে নিয়েছে রবিন তাদের কিছু করবে না। তার কোন কারণও নেই।

'এসো,' রবিনকে পাত্তা না দিয়ে বলল বিশপ। 'কিছু করবে না ও। পবিত্র গির্জার অভিশাপ কুড়াবার দুঃসাহস হবে না ওর।'

'দাঁড়ান, বিশপ !' কঠোর গলায় নির্দেশ দিল রবিন। 'যাওয়ার আগে আমার সাথে খেতে হবে আপনাকে। কিন্তু তার আগে কিছু ন্যায়বিচার করতে হবে আমাকে। জন, স্কারলেট, আর্থার, তোমরা ওরম্যানকে বাঁধো !'

রবিনের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল স্টুয়ার্ড ওরম্যান। ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। 'ক্ষমা করুন, প্রভু ! ক্ষমা করে দিন। অনেকদিন আপনার সেবা করেছি ...'

'হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা করার আগ পর্যন্ত,' শীতল কণ্ঠে বলল রবিন। 'তোমার ক্ষমা নেই। তুমি দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করার শপথ নিয়েও করেছ। তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করেই দিয়েছিলাম। প্রতিশোধ নেয়ার কোন ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তুমিই আজ বাধ্য করলে। তুমি হরিণ শিকার করার "অপরাধে" আজ একটা জীবন হাসতে হাসতে কেড়ে নিলে। অথচ মনে করে দেখো, একদিন এই তুমিই শপথ নিয়েছিলে, নর্ম্যানদের নিষ্ঠুর জঙ্গলের আইন থেকে যতজনকে সম্ভব রক্ষা করবে। না, না ! আজ কোন অজুহাতেই আর কাজ হবে না।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল রবিন। 'তোমরা কেউ ডালের ওপর দিয়ে দড়ি ছুড়ে মারো। হ্যাঁ, এবার ওর গলায় ফাঁস পরাও। হয়েছে। এবার ফ্রায়ার টাক, আপনি ছয়জনকে নিয়ে দড়িটার অন্য মাথা ধরে দৌড় শুরু করুন। সময় নষ্ট করবেন না, তাড়াতাড়ি করুন।'

***

ওরম্যানের ফাঁসি কার্যকর করে বিশপের দিকে ফিরল রবিন। 'এবার আমার সাথে ডিনার খেতে চলুন, মাই লর্ড।'

'তারচেয়ে আমি মৃত্যুই বেশি পছন্দ করব,' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

'তাহলে জোর-জবরদস্তি নেই। আপনি চলে যেতে পারেন। কিন্তু উপযুক্ত খাজনা দিয়ে।'

বিশপের পকেট-স্যাডল-ব্যাগ ইত্যাদি সার্চ করে প্রচুর সোনা ও রূপা পাওয়া গেল। মাটিতে একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে সেসব প্রথমে তার ওপর রাখল লিটল জন, তারপর নিজেদের ব্যাগে ভরে নিল।

সবশেষে বিশপ ও তার দুই সঙ্গীকে নটিংহ্যামগামী রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে এল। রবিনহুডও সদলবলে আস্তানার দিকে রওনা হয়ে গেল।

আবার শেরউডে শেরিফ

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর শোনা গেল, শেরিফ আবার শেরউড আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। সে জন্য বিরাট এক বাহিনী গঠন করার কাজও শেষ হয়েছে। 'ব্যাপারটা গুজব না সত্যি, জানতে হবে,' রবিন বলল একদিন। 'ভালো কথা, অনেকদিন হয়ে গেল আমাদের লবের কোন খবর নেই। তাই না ?'

'ঠিক,' মাথা দোলাল লিটল জন। 'বহুদিন ধরে খবর নেই ওর। এক কাজ করা যাক, ছদ্মবেশ নিয়ে আজই নটিংহ্যামে যাই আমি। সব খবর নিয়ে আসি। সকালে বাজারে আর বিকেলে মদের আড্ডায় ঢুঁ মারলেই শহরের হাঁড়ির খবর জানা হয়ে যাবে।'

'কিন্তু সাবধানে যেয়ো, লিটল জন,' সতর্ক করে দিল ও। 'কোনরকম বিপদ ঘটে না যেন। তোমাকে হারাতে চাই না আমি।'

'একটুও চিন্তা কোরো না, ওস্তাদ। নিজের দিকে খেয়াল রাখব আমি।'

সেদিন বিকেলে নটিংহ্যামে এসে হাজির হলো এক দীর্ঘদেহী, পঙ্গু ভিখারি। তার পরনে নোংরা, ছেঁড়া জামা-কাপড়। ভীষণ খুঁড়িয়ে হাঁটছে লোকটা, এক কাঁধের চেয়ে আরেক কাঁধ ছয় ইঞ্চি নিচু। মুখ একদিকে বাঁকা হয়ে আছে। ফটক রক্ষীরা হাসাহাসি করল তাকে নিয়ে। কিন্তু ভিখারি কোনদিকে তাকাল না, বাজার পেরিয়ে এসে একটা গলিতে ঢুকল, তারপর সেটা পেরিয়ে আরও সরু এক গলিতে। ঢুকেই ছোট একটা দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওটা মুচি লবের দোকান। এই সময় ব্যস্ত থাকে লব, কিন্তু আজ যে কারণেই হোক দোকান বন্ধ।

দোকানের পিছনদিকের ছোট, অন্ধকার মতো একটা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল ভিখারি। উঁকি দিয়ে দেখল, ঘরের ভেতরে নোংরা এক বিছানায় শুয়ে আছে লব। 'কি খবর, লব ?' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'কেমন আছ ? শরীর ভালো নেই নাকি ?'

চেনা গলার স্বর শুনে দ্রুত উঠে বসল মুচি। 'লিটল জন ? এক মাস হলো বিছানায় পড়ে আছি। এখন কিছুটা ভাল। তা তোমাদের খবর কি ?'

'ভাল। অনেকদিন থেকে তোমার কোন খবর নেই বলে চিন্তায় পড়ে গেছে রবিনহুড। তাই খবর নিতে এলাম।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, লিটল জন,' লব বলল। 'কিন্তু কাজটা একদম উচিত হয়নি। শুনলাম, ক'দিন আগে নাকি দাওয়াত খাইয়ে শেরিফের কাছ থেকে

পাঁচশো পাউন্ড কেড়ে নিয়েছো তোমরা ? ধরতে পারলে সে তোমাদেরকে আস্ত রাখবে না।'

হাসল লিটল জন। 'আমি এক পঙ্গু, নিঃস্ব ভিখারি, আমাকে ধরতে যাবেই বা কেন সে ? যাকগে, বাদ দাও। আমরা একটা গুজব শুনলাম, শেরিফ নাকি শেরউড আক্রমণ করতে যাচ্ছে আবার। সঠিক খবরটা কোথায় পেতে পারি, বলো দেখি !'

'কি জানি, আমি তো শুনিনি তেমন কিছু ! তবে খোলামেলা কিছু যে করছে না শেরিফ, তা বলতে পারি। যদি কোন গোপন পরিকল্পনা নিয়ে থাকে, তাহলে খবর বের করা সহজ হবে না।'

'ঠিক আছে। এসেই যখন পড়েছি, দেখি চেষ্টা করে কিছু জানতে পারি কি না। আমি শহরে একটা চক্কোর দিয়ে আসি। রাতে থাকবো, তুমি আমার জন্যে বিছানা তৈরি করে রেখো।'

লবের ওখান থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাজারে এসে হাজির হলো লিটল জন, তালি দেয়া নোংরা টুপিটা চিত করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু কেউ একটা ফুটো পয়সাও ফেললো না ওটায়। ভিখারিরও সেদিকে খেয়াল আছে বলে মনে হলো না। তাকে বরং ভিক্ষের চেয়ে মানুষজনের কথা কান পেতে শোনায় বেশি আগ্রহী দেখা গেল।

কিন্তু তাতেও সুবিধে না হওয়ায় ঘণ্টাখানেক পর সরাইখানার দিকে চলল সে। শেরিফের লোকেরা ওখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, লিটল জনের তা জানা আছে। ওখানে গেলে হয়তো কিছু জানা যাবে। কিন্তু ঢোকার মুখেই সরাইখানার মোটকা মালিক তার পথ আগলে দাঁড়াল।

'ভাগো এখান থেকে। আর কোথাও গিয়ে ভিক্ষে করো।'

'আমি ভিক্ষে করতে আসিনি তোমার এখানে,' ভিখারি বলল। 'ভেবেছ এক গ্লাস এল খাওয়ার পয়সাও নেই আমার কাছে ? কি, পয়সা আছে কি না দেখতে চাও ?' কোমরে গোঁজা ছোট্ট একটা থলি থেকে কিছু পেনি বের করে দেখাল লিটল জন। 'এই দেখো।'

'ঠিক আছে,' বলল মালিক। 'ঢুকে পড়ো। কিন্তু মাঝখানের রুমে বিশেষ অতিথিরা বসে, ওটার কাছে যেতে পারবে না। ওই টুলে গিয়ে বোসো। যা খাবে খেয়ে ওখানে থেকেই কেটে পড়ো।'

কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে এলো বিশালদেহী ভিখারি। যে জায়গায় তাকে বসতে বলেছে মালিক, কান পাতলে সেখান থেকে রুমের ভেতরের কথাবার্তা সবই শোনা যায়। নির্দিষ্ট টুলে বসে এলের গ্লাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগল সে। কান খাড়া। সরাইখানায় শেরিফের দুই লোককে দেখা গেল–ঘুরে ঘুরে এর-ওর সাথে কথা বলছে, কিন্তু শেরিফের শেরউড আক্রমণ নিয়ে নয়, পরদিনের

শূটিং প্রতিযেগিতা নিয়ে। প্রতি বছরের অক্টোবরে বিরাট মেলা বসে নটিংহ্যামে, তাতে শূটিং প্রতিযোগিতারও আয়োজন থাকে।

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকে উঠল লিটল জনের। মনে মনে ঠিক করল, একটা ধনুক জোগাড় করা গেলে কাল সে-ও যাবে ওখানে। এই ধরনের বড় জনসমাবেশে প্রচুর লোকের সমাগম হয়, অনেক বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। কাজেই ও যে খবরের জন্য এসেছে, প্রতিযোগিতার মাঠে সে ব্যাপারে কিছু জানা যেতেও পারে।

রাত বাড়ছে দেখে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এলো লিটল জন, আর বসে থাকা ঠিক হবে না। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লবের কুঠুরিতে ফিরে এসে দেখল তার জন্য খড়ের বিছানা করে রেখেছে লোকটা। তাতে পিঠ ছোঁয়ানোমাত্র গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে।

পরদিন দুপুর হতেই বাজারের কাছে লোকজনের ভিড় জমে উঠতে লাগল। ঝলমলে পোশাক পরা তিনজন লোক এক পাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম্পেট বাজাচ্ছে। আপেলের মতো ফুলে আছে তাদের দু'গাল। লোকজন তাড়াতাড়ি কেনাকাটা সেরে নিয়েছে যাতে বিকেলটা সবাই মিলে আনন্দ-ফুর্তি করে কাটানো যায়।

ঘোষক চিৎকার করে শূটিং প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী আর পুরস্কারের কথা জানাতে শুরু করল। চ্যাম্পিয়নকে নতুন রূপার শিঙায় ভরে বিশটা রূপার পেনি পুরস্কার দেয়া হবে শুনে সবাই ধরে নিল তীব্র প্রতিযোগিতা হবে। অনেক ভালো ভালো তীরন্দাজ আসবে অংশ নিতে।

বাজারের ক্রুশটার পাশে কাগজ-কলম আর দোয়াত নিয়ে বসে আছে এক কেরানি। প্রতিযোগীরা লাইন ধরে আসছে তার কাছে। নাম লিখিয়ে নিয়ে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে ঢুকছে। সেই খোঁড়া, বিকট চেহারার ভিখারিরূপী লিটল জনও তাদের মধ্যে। একটা ধনুক ঝুলছে তার কাঁধে, পিঠে এক তূণ তীর–সব লবের এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে আনা।

এরকম চেহারা-সুরতের একজনকে কেরানির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে আশপাশের সবাই হেসে উঠল। পিছনের লোকটা বিরক্ত হয়ে ধাক্কা দিয়ে লাইন থেকে সরিয়ে দিল ওকে। 'অ্যাই, সরো ! এখানে ভিড় করছো কেন ?'

ধাক্কা খেয়ে ঘুরে তাকাল লিটল জন। বন-রক্ষীর পোশাক পরা দীর্ঘদেহী, লালমুখো এক লোককে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকতে দেখলো। 'ধাক্কা দিচ্ছো কেন ? আমিও তো প্রতিযোগিতায় নাম লেখাতে এসেছি।'

'বলে কি !' ঠাট্টার ভঙ্গিতে মুখ বেঁকে গেল রক্ষীর। 'তুমি শূটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এসেছো ? পাগল হলে নাকি ? যাও, ভাগো এখান থেকে।'

এ কথায় হাসির রোল পড়ে গেল উপস্থিতদের মধ্যে। সবার মনে হলো, ছেঁড়াফাটা পোশাক-আশাক পরা এক ভিখারির জন্য জবাবটা একদম উপযুক্তই

হয়েছে। কিন্তু পর মুহূর্তে সেই ছেঁড়াফাটা জামার তলা দিয়েই একটা অত্যন্ত পেশিবহুল, শক্তিশালী হাত বেরিয়ে আসতে দেখে হাসি মুছে গেল তাদের। হাতটা ঘাড় চেপে ধরে শিশুর মতো শূন্যে তুলে ফেলল রক্ষীকে, অনায়াসে এক পাশে সরিয়ে দিল।

'আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই থাকব,' নরম কণ্ঠে বলল লিটল জন। 'তোমার মনে রাখা দরকার, আজকের এই প্রতিযোগিতা যেমন শুধু বনরক্ষীদের জন্যে নয়, তেমনি এতে ভিখারিদের অংশ নিতেও কোন বাধা নেই।'

চেহারা রাগে আরও লাল হয়ে উঠল রক্ষীর। এক লাফে এগিয়ে এলো সে, প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল জনের নাক সই করে। কিন্তু লাগল না। তার আগেই মাথা সরিয়ে নিয়েছে জন। 'ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, হ্যাল !' রক্ষীর বন্ধুরা চেঁচিয়ে উৎসাহ দিল তাকে। 'নাক ফাটিয়ে দাও ব্যাটার।'

ঘুসি মিস হওয়ায় আরও রেগে ঘুরে দাঁড়াল রক্ষী, এমন সময় এক লোক নিচু গলায় সতর্ক করল জনকে। 'পালাও এখান থেকে। জলদি পালাও। নইলে হ্যাল ঘুসি মারতে মারতে তোমার নাকমুখ ভর্তা করে দেবে আজ।'

'পালাতে যাব কেন ?' জন বলল। 'তোমরা গোল হয়ে একটা রিং বানাও। দেখি, কেমন ভর্তা করতে পারে হ্যাল।'

খুশি হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সবাই। 'রিং বানাও, জলদি করে রিং বানাও ! আজ ক্রফটের হ্যালের সাথে এক ভিখারির লড়াই হবে। দেখা যাক, কে জেতে কে হারে !'

অকস্মাৎ ঝগড়াকে কেন্দ্র করে দারুণ এক লড়াই দেখার সুযোগ জুটে গেল শহরবাসীর। খুশি মনে খানিকটা জায়গা গোল করে ঘিরে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেল তারা। ওদিকে হ্যালও খুশি। গায়ের জামা খুলে ধনুকটা এক বন্ধুর হাতে দিল সে, তারপর দুই হাতের তালুতে খানিকটা করে থুতু ছিটিয়ে নিয়ে শক্ত মুঠি পাকালো। ঘাড় ত্যাড়া ভিখারিটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে সে। কে না জানে, ঘুসোঘুসিতে তার সমকক্ষ কেউ নেই নটিংহ্যামে ?

লিটল জন কাপড়চোপড় ছাড়ল না, শুধু ধনুক আর তূণটা এক চাষাগোছের লোকের হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর এমন হাস্যকর ভঙ্গিতে ঢেউ খোলানোর মতো করে রিঙের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হেঁটে গেল যে হেসে খুন হওয়ার দশা হলো দর্শকদের। একটু পর তাদের আকাশ ফাটানো উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল।

ভিখারির নাক-মুখ লক্ষ্য করে একের পর এক ঘুসি চালিয়ে যেতে লাগল হ্যাল, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে একটাও লাগাতে পারল না। কারণ ভিখারি লোকটা একদিকে বিচ্ছিরি কিসিমের খোঁড়া, এক পা এদিক-ওদিক করলে তার মাথা কমপক্ষে এক ফুট ওঠা-নামা করে, অন্যদিকে জায়গা বদল করে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। ফলে নিশানা করার সুযোগই পাচ্ছে না হ্যাল। তারচেয়েও বড় সমস্যা, হ্যাল মিস করলেও সে কিন্তু করছে না।

সুযোগ পেলেই তার পাঁজরে হাতুড়ির ঘায়ের মত ওজনদার একেকটা ঘুসি ঝেড়ে দিচ্ছে। সেসব হজম করতে গিয়ে এর মধ্যেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করেছে হ্যাল। ওদিকে ভিক্ষের ঝোলা আর ঢোলা, ছেঁড়াফাটা জামা-কাপড় পরা ভিখারির লাফ-ঝাঁপ এমনই হাস্যকর যে হাসতে হাসতে দর্শকদের চোখে পানি এসে গেছে। এমন আজব মারপিট জীবনে দেখেনি কেউ। হঠাৎ পরিস্থিতি পাল্টে গেল–ভিখারিকে কৌশলে কোণঠাসা করে ফেলল হ্যাল।

'এইবার !' চেঁচিয়ে উঠল তার বন্ধুরা। 'কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ব্যাটা ! এবার দেখিয়ে দাও, হ্যাল। দেখিয়ে দাও বন-রক্ষীর ঘুসি কাকে বলে !'

সবাই ধরে নিল এবার ঘুসি বিশারদ হ্যাল তার শেষ খেলা দেখাতে যাচ্ছে–কেউ কেউ কষ্টও পেলো দীন-দুঃখী ভিখারির পরিণতির কথা ভেবে। কিন্তু তাদের সমস্ত হিসেব মুহূর্তে পাল্টে গেল হঠাৎ করে লোকটাকে সটান সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেখে। সুস্থ-সবল, ঝাড়া সাত ফুট লম্বা এক দৈত্যে পরিণত হয়েছে পঙ্গু ভিখারি। বিস্ময় কাটার আগেই পাঁজরে তার প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল হ্যাল। হাড় ভাঙার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলো দর্শকরা। পড়ে আর উঠল না লোকটা। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

চরম বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত যে যার জায়গায় জমে থাকল সবাই, তারপর কয়েকজন বনরক্ষী লাঠি উঁচিয়ে এগিয়ে এলো লিটল জনের দিকে। আজ পিটিয়ে ভূত ভাগাবে ওর। কিন্তু দর্শকরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাল। 'অ্যাই, থামো ! কি হচ্ছে এসব ?'

এক সাহসী শহরবাসী লাঠি হাতে এগিয়ে এল সামনে। বলল, 'লোকটা বেআইনি কিছু তো করেনি। হ্যাল যা করতে যাচ্ছিল, ও-ও তাই করেছে। এরমধ্যে অন্যায় কিছু হয়নি।' বলে লাঠিটা মাথার ওপরে তুলে ঘোরাতে লাগল সে। বেশিরভাগ দর্শক সমর্থন জানাল লোকটাকে। এতজনের সম্মিলিত বাধার মুখে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো রক্ষীরা। ব্যাজার মুখে হ্যালের অজ্ঞান দেহ নিয়ে চলে গেল তারা।

এবার লিটল জনের দিকে ফিরল লাঠিধারী। বলল, 'ভিখারি, ঘুসি যেমন মারতে পারো, তীরও সেরকম ছুড়তে পারো ?'

'পারি, স্যার,' হাসল ভিখারি। 'একইরকম পারি।'

'তাহলে চলো মাঠের দিকে যাই আমরা,' অন্যদের উদ্দেশে বলল সে। 'মনে হয় এ থাকলে আজ শূটিংও ভালো জমবে।'

সবাই মিলে কেরানির কাছে নিয়ে গেল লিটল জনকে। খাতায় তার নাম লিখিয়ে প্রতিযোগিতা যেখানে হবে, সেই মাঠে চলে এলো দল বেঁধে। পথে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে থাকল শহরবাসী, যাতে বনরক্ষীরা সুযোগ পেয়ে হামলা করে বসতে না পারে। সময়মত শুরু হয়ে গেল প্রতিযোগিতা। দেখা গেল তীর ছোড়ায়ও অনেক বড় মাপের ওস্তাদ সে।

প্রথম রাউন্ডে টার্গেট লক্ষ্য করে ছোড়া তীরগুলোর মধ্যে তার তীরই টার্গেট কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে বিঁধল। এরপর সেরা তিন তীরন্দাজকে রেখে বাকিদের বিদায় করে দেয়া হলো। চূড়ান্ত রাউন্ডে একটা উইলোর ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দেয়া হলো–নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব থেকে ওটায় তীর লাগাতে হবে। প্রথম দুই প্রতিযোগী ব্যর্থ হলো। তাদের তীর ডালে লাগল না পাশ ঘেঁষে উড়ে গেল। কিন্তু লিটল জনের তীর ডালটাকে মাঝখান থেকে চিরে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিজয়ীর পুরস্কারের সাথে শেরিফের অনেক বাহবাও পেলো সে।

'তোমার নাম কি, ভিখারি ?' হাসিমুখে জানতে চাইল শেরিফ। 'বাড়ি কোথায় তোমার ?'

এক হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে তাকে সম্মান জানাল লিটল জন। 'আমার নাম রেনল্ড গ্রিনলিফ, স্যার। বাড়ি হোল্ডারনেসে।'

'সাঙ্ঘাতিক তীরন্দাজ তুমি, গ্রিনলিফ। জীবনে কাউকে এত চমৎকার তীর ছুড়তে দেখিনি আমি।'

অবশ্যই দেখেছ, মনে মনে বলল লিটল জন। রবিনহুডকে এর চাইতে অনেক ভাল তীর ছুড়তে দেখেছ তুমি। তবে মুখে কিছু বলল না সে। কেবল আরেকবার ঝুঁকে সম্মান জানাল।

খুশিতে গদগদ হয়ে গেল শেরিফ। বলল, 'তুমি এতবড় ওস্তাদ এক তীরন্দাজ। তারপরও তোমার কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি, কেন ?'

'ভিক্ষে না করে উপায় কি, স্যার ? আমি পঙ্গু মানুষ। পঙ্গুদেরকে কেউ চাকরি দেয় না যে !'

'কেউ না দিলেও আমি দেব,' বলল শেরিফ। 'করবে তুমি ? বছরে বিশ মার্ক করে বেতন পাবে। কি বলো, করবে ?'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল লিটল জন। যে খবরের জন্য এখানে আসা, সেটা জানার এরচেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কাজেই সেদিনই শেরিফের চাকরিতে যোগ দিল সে। তার বাড়িতে কিছুদিন আরামেই কাটাল। কোন কাজ করে না, খায়-দায় আর পড়ে পড়ে ঘুমায়। তাকে এমন অলস সময় কাটাতে দেখে গা জ্বলে শেরিফের গোমস্তার। লোকটা সব সময় চেষ্টা করে কোন একটা কাজ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার। কিন্তু লিটল জন মিটমিট করে হেসে মাথা নাড়ে। বলে, 'আমি কেবল তীর চালাতে জানি, আর কিছু জানি না।'

একদিন সকালে বেশ দেরিতে ঘুম ভাঙল লিটল জনের। জেগেই শুনল, শেরউডে শিকার করতে গেছে শেরিফ। মনটা কেমন যেন করে উঠল তার, ইচ্ছে হলো তখনই শেরউডে চলে যায়। ঠিক করল, আজই নিজেদের ডেরায় ফিরে যাবে সে। এখানে আর বসে থেকে লাভ নেই। কারণ বোঝা হয়ে গেছে, শেরউড আক্রমণ করার কোন ইচ্ছে নেই শেরিফের।

যা শোনা গিয়েছিল তা ভুয়া। গুজব। নটিংহ্যামে এসে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছে সে, খবরের আশায় এ দরজায় সে দরজায় কান পেতেছে, দিনের বেলা ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে মানুষের আলাপ-আলোচনা শুনেছে, কিন্তু সেরকম কোন গোপন পরিকল্পনার আভাস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কাজেই এখানে আর পড়ে থাকা অর্থহীন। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল সে। কিন্তু খালি পেটে এতো পথ হাঁটতে মন সায় দিল না বলে রান্নাঘরে এলো খাবারের খোঁজে।

রাঁধুনি লোকটাকে পাওয়া গেল না, বাইরে কোথাও গেছে। তবে তাকের ওপর অনেক পদের রান্না করা খাবার পাওয়া গেল। দেরি না করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিটল জন। হাঁড়ি থেকে যা ইচ্ছে তুলেই টপাটপ্ মুখে পুরতে লাগল। গলায় আটকে গেলে পাশে রাখা পিপে থেকে মদ তুলে ঢক ঢক করে গিলছে।

পেট ভরে গেছে, তবু এতোসব মজাদার খাবারের লোভ সামলাতে না পেরে খেয়েই চলেছে লিটল জন। হঠাৎ পিঠের ওপর ঠাস্ করে লাঠির বাড়ি পড়তেই হুঁশ হলো তার। চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখল রাঁধুনি দাঁড়িয়ে আছে–রেগে আগুন। কাঁপছে থর থর করে। তার এতো কষ্টে রান্না করা খাবারের এরকম তছনছ অবস্থা দেখে মাথা গুলিয়ে গেছে লোকটার। রাগ সামলাতে না পেরে আরেক বাড়ি লাগাল জনের কাঁধে।

হাত তুলে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল জন। 'সরে যাও ! খাবার সময় বিরক্ত কোরো না। আরেক গ্রাস মুখে পুরে চিবাতে চিবাতে বলল, 'এতো রাগছো কেন ? লোকে খাবে বলেই তো রেঁধেছো এসব, তাই না ?'

'তোমার খাবার জন্যে বানিয়েছি ?' রাগে মেঝেতে পা ঠুকল রাঁধুনি। 'দূর হয়ে যাও ! নইলে আজ খুন করে ফেলবো।'

'খুন !' মুখ বাঁকিয়ে হাসল লিটল জন। 'তা ও কাজ তো একা তোমাকে দিয়ে হবে না। পারলে আরও কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'কি বললে ! তোমাকে শায়েস্তা করতে আরও লোক লাগবে আমার ? এসো তাহলে !'

লোকটাকে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করতে দেখে লিটল জনও প্রস্তুত হয়ে নিল, ওখানেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। কিছুক্ষণের মধ্যে লিটল জনের বোঝা হয়ে গেল, তলোয়ার যুদ্ধের সমস্ত কৌশলই লোকটার রপ্ত করা আছে। বেশ অবাক হলো সে। এক ঘণ্টা সমানে লড়ে গেল দু'জনে, তাদের দাপাদাপির কারণে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কিন্তু কেউ কাউকে কাবু করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত হাত তুলে রাঁধুনিকে থামালো জন।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সত্যি, তলোয়ারে দারুণ হাত তো তোমার ! তেমনি সাহস। কিন্তু এখানে কেন পড়ে আছো তুমি ? কেন পড়ে পড়ে নিজেকে অপচয় করছো !'

'নইলে আর কি করবো ?'

'আমাদের শেরউডের জীবন এর চাইতে অনেক আনন্দের, অনেক স্বাধীন। তোমাকে আমি সে জীবনের খোঁজ দিতে পারি। এমন এক নেতার কাছে নিয়ে যেতে পারি, যার সান্নিধ্যে নিজেকে তোমার ধন্য মনে হবে।'

অবাক হলো লোকটা। 'কার কথা বলছো ?'

সামনে ঝুঁকে চাপা কণ্ঠে বলল সে, 'রবিনহুড !'

নামটা কানে যাওয়ামাত্র ভীষণভাবে চমকে উঠল রাঁধুনি। চোখ কপালে তুলে লিটল জনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর তলোয়ারটা খাপে ভরে রেখে বলল, 'ঠিক বলেছো তুমি। আজ থেকে আমিও তোমাদের একজন হয়ে গেলাম।'

'তাহলে এগুলো আর ফেলে রেখে লাভ কি ?' লিটল জন বলল। 'যুদ্ধ করতে গিয়ে আবার খিদে লেগে গেছে। এসো, আগে এগুলোর সৎকার করি।'

দু'জনে গোগ্রাসে খেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত খাবার সাবড় করে দিল। তারপর রাঁধুনি বলল, 'এখান থেকে চলেই যখন যাবো, খালি হাতে যাই কেন ? শেরিফের অনেকগুলো নকশা করা রুপোর ডিনার সেট আছে। গরিবদের জরিমানা করা টাকায় কেনা রুপোর গ্লাস, বাটি, জগ, আরও কতো কি আছে ! ইচ্ছে করলে আমরা সেসব নিয়ে যেতে পারি।'

একটা বস্তায় সেসব ভরে নিল জন, তারপর লোকটাকে সাথে নিয়ে শেরউডের পথে বেরিয়ে পড়ল। আস্তানায় পৌঁছতে রবিনহুড ছুটে এলো জনকে দেখে। 'এতোদিন কোথায় ছিলে তুমি ?' বলল সে। 'আমরা সেই থেকে তোমার চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি ! পিঠে কিসের বোঝা ওটা ? এই লোক কে ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও ! বলছি !' হাসল লিটল জন। নটিংহ্যামে যাওয়া থেকে আসার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব খুলে জানাল। বিস্তারিত শুনে অন্যরা হেসে কুটিকুটি হলেও রবিন কিন্তু হাসল না। বরং গম্ভীর হয়ে গেল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে লিটল জন বলল, 'কোথাও কোন ভুল করে ফিলিনি তো আমি ?'

'করেছো,' বলল রবিন। 'তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসতে পারায় আমি খুব খুশি হয়েছি, লিটল জন। শেরিফের বাবুর্চিকে নিয়ে এসেছো, তাকে আমরা শেরউডে আন্তরিক স্বাগতও জানাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে সাধারণ এক চোরের মতো শেরিফের বাসন-কোসন হাতিয়ে নিয়ে এসেছো, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। শেরিফকে যা শায়েস্তা করার, তা তো আমরা করেইছি। আবার এই নতুন শাস্তি কেন ?'

বকা খেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল লিটল জনের। তবু হেসে ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা করল। 'চুরি ! হায়, হায় ! সে কি কথা ? চুরি কাকে বলছো তুমি ? দাঁড়াও, এক্ষুণি শেরিফকে ডেকে নিয়ে আসছি। সে-ই এসে বলুক, জিনিসগুলো আমাদেরকে সে নিজহাতে দিয়েছে কি না।'

কথা শেষ হতে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। দ্রুত পায়ে শেরিফের খোঁজে চলল। পাঁচ মাইল দূরে শেরিফকে সদলবলে শিকার করতে দেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল লিটল জন।

মাথার টুপি খুলে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'শিকার কিছু পাওয়া গেল, স্যার শেরিফ ?'

'আরে, গ্রিনলিফ যে !' বলল শেরিফ। 'একটু আগেই একটা হরিণ দেখতে পেয়ে তীর ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু আফসোস, লাগালো না। তখন তোমার কথা মনে পড়ছিল।'

'আমিও তো আপনার কথা ভেবেই এসে পড়লাম, স্যার,' লিটল জন বলল। 'কিন্তু আসার পথে এমন একটা জিনিস দেখে এলাম, যার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না !'

'কি ?' আগ্রহী হয়ে উঠল শেরিফ।

'ওটা হরিণের অনেক বড় একটা পাল, স্যার,' বলল সে। 'সাত কুড়ি সবুজ হরিণ !'

'তুমি কি বলছো এসব ?' চোখ কপালে উঠে গেল শেরিফের। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি ?'

'না, স্যার ! নিজের চোখে দেখে এসেছি, মাইল পাঁচেক পিছনে। আপনাকেও দেখাতে পারবো। তবে ওখানে আপনাকে একা যেতে হবে। নইলে একসাথে এতো মানুষ দেখলে ভয়ে পালিয়ে যাবে ওগুলো।'

'চলো তাহলে,' শেরিফ বলল। 'আমি দেখতে চাই।'

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল লিটল জন। শেরিফ ও তার সঙ্গীরা আসছে পিছন পিছন। নিজেদের আস্তানার দিকে সাড়ে চার মাইলের মত এগিয়ে থেমে পড়ল জন, চাপা গলায় বলল, 'প্রায় এসে গেছি, স্যার। এবার ঘোড়া রেখে এগোতে হবে আপনাকে।'

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল শেরিফ, দলের সবাইকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে নীরবে জনকে অনুসরণ করে চলল। বেশ খানিকদূর গিয়ে বাঁক নিতেই দেখা গেল সামনে বিশাল ছাতার মতো একটা ওক গাছের নিচে রবিন ও তার সাত কুড়ি অনুচর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

'ওই দেখুন, স্যার,' ইশারায় তাদেরকে দেখিয়ে বলল লিটল জন। 'ওই যে সেই সবুজ হরিণের পাল।'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল শেরিফ। বলল, 'আগে তোমাকে চেনা চেনা লাগলেও চিনতে পারিনি। কিন্তু এখন পারছি। তুমি ডাকাত লিটল জন। আমার সাথে প্রতারণা করেছো তুমি।'

হা হা করে হেসে উঠল লিটল জন। 'ঠিক বলেছেন, স্যার শেরিফ। আসুন, সবুজ হরিণদের নেতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাকে।'

ওদিকে রবিনহুড দূর থেকে তাদের দু'জনকে দেখে উঠে এসেছিল। কাছে এসে হাসিমুখে বলল সে, 'আরে, আমাদের মাননীয় শেরিফ এসেছেন দেখছি ! আবার ভোজ খেতে নিশ্চই ?'

'না !' আঁতকে উঠে বলল সে। 'আর কোন ভোজ-টোজ দরকার নেই। আজ খিদেই নেই আমার।'

'খিদে নেই, ভালো কথা,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'পিপাসা তো থাকতে পারে। কে আছো, আমাদের প্রিয় শেরিফের জন্যে এক পেয়ালা অক্টোবর এল নিয়ে এসো। গলা শুকিয়ে গেছে ওঁর।'

এল ভর্তি কারুকাজ করা একটা রুপোর পাত্র পিরিচে করে নিয়ে এলো একজন, শেরিফকে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে এগিয়ে ধরল। কিন্তু হাত বাড়াবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না শেরিফের মধ্যে, পাত্রটার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকল সে। বুঝে ফেলেছে, তারই সখের পিরিচ আর পাত্রে করে মদ পরিবেশন করা হয়েছে।'

'কি হলো, মাস্টার শেরিফ ?' রবিন বলল। 'আমাদের পাত্র পছন্দ হচ্ছে না আপনার ? আজ এরকম এক বস্তা ভর্তি বাসন-কোসন, পেয়ালা পেয়েছি আমরা।' লিটল জন আর রাঁধুনির নিয়ে আসা বস্তাটা দেখালো ও।

মনটা খারাপ হয়ে গেল শেরিফের। একটা কথাও না বলে মাটির দিকে চেয়ে থাকল সে। রবিন বলল, 'মাননীয় শেরিফ। আগেরবার আপনি খারাপ মতলব নিয়ে শেরউডে এসেছিলেন, ধনী লোকের নির্বোধ সন্তানকে ঠকিয়ে ফায়দা লোটার ইচ্ছে ছিল আপনার। কিন্তু কপালদোষে নিজেকেই ঠকতে হয়েছিল। কিন্তু এবারের কথা আলাদা। এবার কাউকে ঠকানোর ইচ্ছে নিয়ে আসেননি আপনি। আমি মানুষের টাকা কেড়ে নিই, কিন্তু কাদের টাকা ? অর্থলোভী ধর্মযাজক বা নিষ্ঠুর, ধনী এবং অত্যাচারী ব্যারন-জমিদারদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা। সে টাকা যাদের শোষণ করে আদায় করা হয়, আবার তাদের মধ্যেই বিলিয়ে দিই। কিন্তু আপনার কোন প্রজা আছে বলে জানা নেই আমার। আপনি কারও ওপর অত্যাচার করেছেন বলেও জানা নেই। কাজেই আপনি নিশ্চিন্তে আপনার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারবেন। এগুলো ভুলে চলে এসেছে আমাদের হাতে। চলুন, স্যার শেরিফ, আপনাকে আপনার লোকজনের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ভারি বস্তাটা কাঁধে তুলে নিয়ে আগে আগে হাঁটতে লাগল রবিনহুড। পিছন পিছন চলল হতভম্ব শেরিফ। চরম বিস্ময়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছে লোকটা। তার লোকজনের কাছ থেকে কিছুটা দূরে থামল রবিন। বস্তাটা শেরিফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকের এই ঘটনার জন্যে আমি খুব দুঃখিত, মাননীয় শেরিফ।'

পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে বনের মধ্যে হারিয়ে গেল রবিন, পিছন থেকে তাজ্জব হয়ে বেশ কিছু সময় ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল শেরিফ। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বস্তা কাঁধে নিয়ে পা বাড়াল। দূর থেকে তাকে ওরকম একটা বোঝা নিয়ে আসতে দেখে ভারি অবাক হলো তার লোকজন, কিন্তু সে ব্যাপারে বারবার প্রশ্ন করেও কোন জবাব পেলো না। কোন কথাই বলল না সে। সবার মনে হলো যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটছে শেরিফ।

বোঝাটা নীরবে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে নটিংহ্যামের দিকে ছুটে চলল সে। অন্যরা বোকার মতো তাকে অনুসরণ করে চলল। ওদিকে শেরিফের মাথার মধ্যে ঝড়ের বেগে এলোমেলো চিন্তা চলছে। গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব।

কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে, রবিনহুড লোকটা কেমন ?

রূপার বিউগল ও কালো নাইট

শূটিং প্রতিযোগিতার খবর শুনলে রবিনহুড যে তার শেরউডের আখড়া ছেড়ে বের হবেই, সে কথা সবাই জানে। তাতে যত বিপদের আশঙ্কাই থাকুক। সে কথা মনে রেখে উইল স্কারলেটের মৃত্যুর কিছুদিন পর যুবরাজ জনের কথায় লিস্টারশায়ারের অ্যাশবি-ডি-লা-যাউখে এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল শেরিফ। যা ঘটার তাই ঘটল। খবরটা কানে যেতেই সেদিকে যাত্রা করল রবিনহুড।

ডেলামেয়ারে আগেও শূটিং টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখান থেকে রবিন সেরা তীরন্দাজের পুরস্কার তীর জিতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু যুবরাজ জন তখন ওর জন্য এত বেশি বিপজ্জনক ছিলেন না। এখন যদিও দিনে দিনে তাঁর ক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু দেশের মানুষ তাঁকে দেশের রাজা হিসেবে মেনে নেয়নি।

কেননা তখন সারাদেশে জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে, রাজা রিচার্ড মরেননি। তিনি বেঁচে আছেন–অস্ট্রিয়ান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে গোপনে ইংল্যান্ডে পৌঁছেও গেছেন। জন অবশ্য সেসব বিশ্বাস করতেন না। তিনি চাইছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজাদের যতজনকে সম্ভব সন্তুষ্ট রাখা। তাই প্রতিযোগিতা স্যাক্সন ও নর্ম্যান, উভয়ের জন্যেই খোলা রাখার ব্যবস্থা করেন তিনি। কাজেই রবিন পুরোপুরি নিশ্চিত ছিল যে যত যা-ই ঘটুক না কেন, হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ থেকে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সাহস হবে না যুবরাজের।

তারপরও আসার সময় লিটল জন ও ফ্রায়ার টাক্‌কে সাথে নিয়ে এসেছে ও। আরও নিয়ে এসেছে দলের নামকরা দশজন তীরন্দাজকে। তারা প্রকাশ্যে আসবে না। সবার চোখের আড়ালে থাকবে।

ডেলামেয়ার টুর্নামেন্টের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল নাইটদের লড়াই। প্রথম দিন বর্শা যুদ্ধে অংশ নেন তাঁরা। আপাদমস্তক বর্মে ঢেকে বর্শা বাগিয়ে ধরে ঘোড়া নিয়ে পরস্পরের দিকে পূর্ণ গতিতে ছুটে যাওয়া, একে অন্যকে ঘোড়া থেকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা, এই ছিল লড়াইয়ের ধরন। অজ্ঞাত এক নাইট জয়ী হন তাতে। পরদিন অনুষ্ঠিত 'নকল যুদ্ধে' এক পক্ষের নেতা ছিলেন তিনি। পরের দিকে যদিও সেটা আসল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যত পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল, ততই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছিল 'নকল যুদ্ধ'।

সে যুদ্ধে অন্য পক্ষের নেতৃত্ব দেন স্যার ব্রায়ান ডি বোয়িস গিলবার্ট নামের এক নাইট। তাঁর পক্ষে আরও অনেক নর্ম্যান ব্যারন ছিলেন। নিষ্ঠুর ও উৎপীড়ক বলে যাদের প্রচুর কুখ্যাতি আছে। জনের অন্ধ অনুসারী তারা।

সকাল যত দুপুরের দিকে গড়াতে লাগল, পরিস্থিতি ততই সেই অজ্ঞাত নাইটের আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে লাগল। এক পর্যায়ে দর্শকরা ধরেই নিল হেরে যাচ্ছেন তিনি, এই সময় অযাচিতভাবে তাঁর পক্ষ নিলেন সেই রহস্যময় কালো নাইট। মাত্র ক'দিন আগে যিনি শেরউডে রবিনহুডের দিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছিলেন।

অজ্ঞাত নাইট হেরে যেতে বসেছেন দেখে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন কালো নাইট, প্রায় হেরে যাওয়া খেলা জিতিয়ে দেন তাঁকে। পরে জানা যায়, অজ্ঞাত নাইটের নাম স্যার উাইলফ্রেড অভ আইভানহো–রিচার্ডের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত বন্ধুদের একজন। যদিও স্যাক্সন। প্রথম নাইট ছিলেন স্যার উইলফ্রেড। আহত হয়ে ঠিক পুরস্কার বিতরণের সময়টাতেই জ্ঞান হারান স্যার উইলফ্রেড। ওই অবস্থাতেই অনুষ্ঠানের কুইন অভ দ্য লিস্ট লেডি রোয়েনা তাঁকে বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দেন।

তাঁকে শুশ্রূষার জন্য মাঠ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে জন শূটিং প্রতিযোগিতা শুরু করার ঘোষণা দিলেন। প্রথমে ত্রিশজনেরও বেশি ইয়োমেন তাতে অংশ নিল। কিন্তু একটু পর যখন জানাজানি হয়ে গেল যে তাদের মধ্যে রবিনহুডও আছে, তাদের দুই-তৃতীয়াংশই নাম প্রত্যাহার করে নিল।

মাঠের একদিকে যুবরাজ ও সম্মানিত অতিথিদের বসার জন্য স্টেজে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানে লর্ড-লেডি এবং নাইট-বিশপ ও ব্যারনদের ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে হেরিফোর্ডের বিশপ এবং নটিংহ্যামের শেরিফও আছে। মাঝখানে বসেছেন যুবরাজ জন। তীরন্দাজদের নাম প্রত্যাহারের হিড়িকের আসল কারণ লক্ষ করে বললেন, 'ওই লোকটা কে ?'

'ওকে সবাই লকসলি নামে ডাকে,' জবাব দিল প্রভোস্ট অভ দ্য লিস্ট।

'লকসলি !' ভুরু কুঁচকে তাকালেন জন। ঝুঁকে বসে নিবিষ্ট মনে লোকটাকে দেখলেন সময় নিয়ে। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম !'

এমন সময় রবিনও তাঁর দিকে তাকাল, চোখাচোখি হয়ে গেল দু'জনের। পরক্ষণে জনের তৎপরতা দেখে মনে হলো তিনি বুঝি রবিনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁর এক সহকারী খুব দ্রুত সামাল দিল ব্যাপারটা।

'জাহান্নামে যাও তুমি, লকসলি !' অনেক কষ্টে রাগ সামলে বললেন জন, 'অথবা যা-ই তোমার নাম হোক না কেন !'

রবিন সসম্মানে অভিবাদন করল যুবরাজকে। 'আমার ওপর আপনার কিসের রাগ, ইয়োর হাইনেস ?'

'আমি তোমাকে চিনেছি, রবার্ট ফিযূথ,' তীব্র ঘৃণার সাথে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি।

'ঠিক ধরেছেন, ইয়োর হাইনেস,' শান্ত গলায় বলল রবিন। 'আপনি খুশি হোন আর না-ই হোন, আমার নাম লকস্‌লি।'

'খুশি হওয়ার প্রশ্নই আসে না !' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন জন। 'তবে এখানে তুমি নিরাপদ। আমার ধারণা, সেটা জেনেই এখানে আসতে সাহস পেয়েছ তুমি।'

রবিন এ মন্তব্যের কোন জবাব দিল না। একটু পর শূটিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো। একের পর এক তীরন্দাজ নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে দুটো করে তীর ছুড়ল টার্গেট লক্ষ্য করে। কিন্তু বেশিরভাগ প্রতিযোগীই লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। মাত্র একজন সফল হলো। তার দুটো তীরই টার্গেটের মাঝখানে আঁকা সোনালি বৃত্তের মধ্যে বিঁধল। লোকটা নিডউডের রাজকীয় বনরক্ষী, হিউবার্ট।

তাই দেখে বাঁকা হাসি ফুটল যুবরাজ জনের মুখে। 'এবার, লকসলি ! তুমি কি হিউবার্টের দক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করবে ? নাকি রুপোর বিউগল-হর্নটা তাকে বিনা প্রতিযোগিতায় নিয়ে যেতে দেবে ?'

'টার্গেট একটু দূরে হয়ে গেছে ঠিকই,' বলল ও। 'কিন্তু আমি ভাগ্য পরীক্ষা না করে হাল ছাড়ছি না, ইয়োর হাইনেস। অবশ্য আমার একটা শর্ত আছে। আমি হিউবার্টের তীর লক্ষ্য করে তীর ছুড়ব, বিনিময়ে আমার প্রস্তাব করা একটা লক্ষ্যে ওকেও তীর ছুড়তে হবে।'

'তাতে অন্যায় কিছু নেই,' জন বললেন। 'ঠিক আছে, তাই হবে। হিউবার্ট, এই দাম্ভিক লোকটাকে যদি হারিয়ে দিতে পারো, তোমার রুপোর বিউগল হর্ন আমি রুপোর পেনি দিয়ে ভরে দেব।'

'আমি আমার যথাসাধ্য করব,' বলল লোকটা। 'আমার দাদা হেস্টিংসের যুদ্ধে লং বো নিয়ে লড়েছিল। আমি তাঁর স্মৃতিকে অসম্মান করব না।'

'সেনল্যাক ফিল্ডের যুদ্ধে অনেক নামকরা তীরন্দাজই তীর ছুড়েছে,' যুদ্ধটাকে তার স্যাক্সন পরিচয় দিতে চাইল রবিনহুড। 'কিন্তু এক পক্ষের লোকেরা ছুড়েছিল কেবল আকাশ লক্ষ্য করে। তাদেরই একজনের তীর চোখে বিঁধে মৃত্যু হয় রাজা হ্যারল্ডের। কথাটা আশা করি জানা আছে !'

রাগে ফুঁসে উঠলেন যুবরাজ। দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, 'যদি হিউবার্টকে হারিয়ে আজ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে না পেরেছ, তাহলে পরনের লিঙ্কন গ্রিন খুলে অহঙ্কারী, মিথ্যেবাদী বলে এখান থেকে বের করে দেয়া হবে তোমাকে।'

'এটা তো হুমকি হয়ে গেল, ইয়োর হাইনেস,' বলল ও। 'তবু আমি ঝুঁকিটা নেব। তুমি আগে, বন্ধু !' হিউবার্টের উদ্দেশে মিষ্টি করে হাসল রবিন।

নতুন একটা টার্গেট বসানো হলো ওদের জন্য। হিউবার্ট প্রথম তীর ছুড়ল। মাঝখানের সোনার বৃত্তেই লাগল সেটা, তবে কিছুটা পাশ ঘেঁষে।

রবিন ব্যাপারটা খেয়াল করে মাথা নাড়ল। 'বাতাসের জন্যে তীরটা সামান্য সরে গেছে, হিউবার্ট। নইলে ঠিক মাঝখানেই লাগত !' বলতে বলতে নিজের তীর ছুড়ল ও। ভাব দেখে মনে হলো তেমন গুরুত্ব দিয়ে ছোড়েনি, কিন্তু লাগল গিয়ে একেবারে ঠিক জায়গামতই। সোনালি বৃত্তের মাঝখানের সাদা ফোঁটার একেবারে কাছে।

'বুঝেশুনে মারো !' রাগে, উত্তেজনায় যুবরাজের গলা চড়ে গেল। 'অবহেলার কারণে যদি এই বদমাশটা আজ জিতে যায়, তাহলে তোমাকে ফাঁসিতে চড়াব আমি।'

'ইয়োর হাইনেস, ফাঁসিতে চড়ান আর যা-ই করুন, আমি সাধ্যের বাইরে তো কিছু করতে পারব না। যা হোক, আমার দাদা ভাল তীর চালাতে ...'

'তোমার দাদাকে এরইমধ্যে হারিয়ে দিয়েছে শয়তানটা,' বাধা দিয়ে বললেন জন। 'মারো, হিউবার্ট, মারো ! জীবনের সেরা তীরটা মারো দেখি এবার ! নইলে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে মনে রেখো।'

ছিলায় বাছাই করা নতুন তীর বসাল হিউবার্ট, তারপর বাতাসের গতি ভালমত বুঝে নিয়ে ছুড়ল সেটা। টার্গেটের একদম ঠিক মাঝখানে বিঁধল এবারেরটা।

সমবেত দর্শকের 'হিউবার্ট, হিউবার্ট !' চিৎকারে মুখর হয়ে উঠল অ্যাশবি-ডি-লা-যাউখ। স্থানীয় একজনকে এত ভাল ফল করতে দেখে আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠল তারা, শূন্যে হাত আন্দোলিত করে প্রবল আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল। 'সাবাশ, হিউবার্ট ! একেবারে মাঝখানে লেগেছে ! হিউবার্ট জিতে গেছে !'

রবিনের দিকে ফিরে টিটকারির ভঙ্গিতে হাসলেন জন। 'তুমি এর চেয়ে ভাল আর কি করে দেখাবে, লকসলি !'

'আমিও তাই ভাবছি। আর কি করার আছে ! বড়জোর ওর তীরের খাঁজের মধ্যে আমার তীরটা ঢুকিয়ে দিতে পারি আমি।' এবারেরটা সতর্ক হয়ে ছুড়ল ও। যা বলেছিল, ঠিক তাই ঘটল। হিউবার্টের তীরের গোড়ায় গিয়ে বিঁধল ওরটা, হিউবার্টের তীরের লম্বা দণ্ড চড়চড় শব্দে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

দর্শককুল চরম বিস্ময়ে হাঁ করে টার্গেটের দিকে তাকিয়ে থাকল। যুবরাজ জন অসহায় রাগে ফুঁসতে লাগলেন। ঘন ঘন গোঁফ টেনে মসৃণ করতে লাগলেন।

'ইয়োর হাইনেস,' রবিনহুড বলল। 'আমরা শেরউডে এভাবেই টার্গেট প্র্যাকটিস করে থাকি।'

কাছের একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল ও। বাছাই করে, একদম সোজা দেখে ছয় ফুট দীর্ঘ একটা উইলোর ডাল কেটে আনল। বুড়ো আঙুলের চেয়ে বেশি মোটা হবে না সেটা। ছুরি দিয়ে ডালটার ছাল ছাড়িয়ে নিল রবিন। তারপর সেটাকে জনের মঞ্চ থেকে একশো গজ দূরে মাটিতে পুঁতে রেখে ফিরে এল।

'ইয়োর হাইনেস, যে একশো গজ দূরের ওরকম একটা লক্ষ্যে তীর লাগাতে পারে, শেরউডে আমরা তাকে তীরন্দাজ বলি। আমি দেখতে চাই হিউবার্ট এ কাজ করতে পারে কি না।'

বিরক্তির সাথে মাথা নাড়ল হিউবার্ট। 'আমার দাদা অনেক ভাল তীরন্দাজ ছিলেন। হেস্টিংসের যুদ্ধে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু কখনও এরকম কোন লক্ষ্যভেদ করতে বলা হয়নি তাঁকে। এমন কোন মানুষ নেই যার পক্ষে এ কাজ সম্ভব। এই লোক যদি তা করতে পারে, তাহলে আমি বলব নরক থেকে নেমে আসা খোদ শয়তান সে। আমি তাহলে খুশিমনে পুরস্কারের দাবি ছেড়ে সরে দাঁড়াব, ইয়োর হাইনেস।'

'কাপুরুষ কোথাকার !' রাগে গা জ্বলে গেল যুবরাজের। রবিনের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন। 'বেশ, দেখি তুমি কেমন ওস্তাদ। ওটায় লাগতেই হবে তোমাকে, নয়তো তার পরিণতি কি হবে বুঝতেই পারছ !'

'আমি আমার যথাসাধ্য করব, ইয়োর হাইনেস।' নিজের ধনুক পরীক্ষায় মন দিল রবিন। আগে দুটো তীর ছোড়ার কারণে ওটার আকৃতি সামান্য পাল্টে গেছে মনে হলো। যেমন গোল থাকার কথা, তেমনটা নেই। কাজেই ছিলা পাল্টে নিল রবিন। তারপর অনেক সময় নিয়ে, খুব সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল। শত শত দর্শক রুদ্ধশ্বাসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

টোয়াং ! শব্দে তীর ছুটে গেল রবিনের ধনুক থেকে, পরমুহূর্তে উইলোর ডাল মাঝখান থেকে চড়াৎ করে ফেটে গেল। দর্শকদের উল্লাস আর হাততালির শব্দে আবার মুখর হয়ে উঠল অ্যাশবি-ডি-লা-যাউখ। এমনকি যুবরাজ জন পর্যন্ত রবিনের প্রশংসা না করে পারলেন না।

'লকস্‌লি,' বললেন তিনি, 'তুমি প্রমাণ করে দিয়েছ তুমি মিথ্যে বড়াই করোনি। এই নাও রুপোর বিউগল-হর্ন। আমি স্বীকার করছি, সারা ইংল্যান্ডে তোমার মত তীরন্দাজ আর একজন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এখন তুমি যেতে পারো। কিন্তু মনে রেখো, কারও ওপর বিশেষ কারণে প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করা আছে আমার। এবং আমি তা অবশ্যই রক্ষা করব।'

কোন জবাব দিল না রবিনহুড। যুবরাজকে নীরবে অভিবাদন করে পুরস্কার নিয়ে পিছিয়ে এল, মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে। ওকে চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যেতে দেখে হেরিফোর্ডের বিশপের দিকে ফিরলেন জন। চকচকে দৃষ্টিতে তাঁর দিকেই চাতক পাখির মত তাকিয়ে ছিল মোটকা পুরুত।

'এবার চেষ্টা করে দেখুন পারেন কি না।'

দ্রুত মোটা গর্দান ঝাঁকিয়ে নেমে গেল মঞ্চ থেকে লোকটা।

এক ঘণ্টা পর। বনের মধ্যে দিয়ে শেরউডের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিনহুড, লিটল জন ও ফ্রায়ার টাক। হঠাৎ ফ্রায়ার টাক খেয়াল করল ব্যাপারটা। 'মনে হয় বিপদে পড়তে যাচ্ছি আমরা,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'কিরকম ?' রবিন জানতে চাইল।

'ঝোপের ওপাশে আলোর ঝিলিক দেখলাম এইমাত্র। ধাতব কিছুর ওপরে পড়া রোদের আলো। ওরা আমাদের লোক হলে আড়ালে থাকত না। থাকলেও অন্তত জানান দিত।'

'বুদ্ধিমানের মত কথা ... !' ডানদিকের ঝোপের আড়াল থেকে একযোগে তিনটা তীর ছুটে আসার শব্দে আঁতকে উঠল রবিন। তবে ভাগ্য ভাল যে ওই সময় একটা বিশাল উইলো গাছ পেরোচ্ছিল তারা, ফলে একটা তীরও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছল না।

'পালাও !'

সময় নষ্ট না করে তখনই ঘোড়ার পেটে জোর খোঁচা লাগাল ওরা, বন-বাদাড় ভেঙে হুড়মুড় করে ছুটল সামনের দিকে। তার মধ্যেই নিজের শিঙা বের করে জোরে তিনটা ফুঁ দিল লিটল জন। এমন সময় সেই কালো নাইট একজন সঙ্গীসহ সেখানে এসে পৌঁছলেন। পৌঁছেই বিপদটা টেরে পেলে গেলেন। ডান দিক থেকে কেনডাল গ্রিন পরা ছয়-সাতজনকে বর্শা বাগিয়ে ধরে ছুটে আসতে দেখে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি।

ওদিকে আক্রমণকারীরা এই সময় তাঁর এসে পড়াটা পূর্ব-পরিকল্পিত ভেবে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তিনজন বর্শা দিয়ে আক্রমণ করল তাঁকে, কিন্তু তিনটাই লোহার বর্মে আঘাত খেয়ে ভেঙে গেল, একটাও নাইটের শরীরে বিঁধল না। মনে হলো যেন লোহার দেয়াল তাঁর শরীরটা।

ভাইজরের দেখার সরু ফাঁক দিয়ে নাইটের দু' চোখ মুহূর্তের জন্য ঝল্‌সে উঠতে দেখা গেল। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক ছাড়লেন তিনি, 'কারা তোমরা ? এসবের অর্থ কি ?'

'তুমি মরো, অত্যাচারী !' আক্রমণকারীরা একযোগে জবাব দিল।

'সেইন্ট জর্জের কসম !' গর্জন করে উঠলেন কালো নাইট। 'বিশ্বাসঘাতকের দল ... !' পাল্টা আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একযোগে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। এতজনকে ঠেকাতে গিয়ে খুব দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন নাইট ও তাঁর সঙ্গী। প্রায় হাল ছেড়ে দেয়ার মত অবস্থা।

এমন সময় সূর্যের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল একটা উড়ন্ত তীর, পরক্ষণে মৃদু 'থ্যাপ !' শব্দের সাথে আক্রমণকারীদের একজনের বুকে এসে আমূল বিঁধে গেল সেটা। নিঃশব্দে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। একমুহূর্ত পর রবিনহুড, লিটল জন ও ফ্রেয়ার টাকের পিছন পিছন লিঙ্কন গ্রিন পরা একদল লোক খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল।

লড়াইটা হলো সংক্ষিপ্ত। চমকের ওপর চমকে পুরো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল আক্রমণকারীরা। আপ্রাণ চেষ্টা করল পালাতে, কিন্তু পারল না। তাদের সবার ব্যবস্থা করে তবে থামল লিঙ্কন গ্রিনের দলটা।

'অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, লকসলির রবিন,' কালো নাইটের কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা ফুটল। 'হেরিফোর্ডের বিশপ আর নটিংহ্যামের শেরিফ তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছে জানতে পেরে সতর্ক করতে আসছিলাম। কিন্তু নিজেই ...'

এবার সরে দাঁড়াও। যেতে দাও।'

'কিন্তু আপনি কে, স্যার নাইট,' রবিন জানতে চাইল। 'আপনি কি করে জানলেন ষড়ন্ত্রের কথা ?'

'আজ না। আরেকদিন বলব। তবে ষড়যন্ত্র শেষ হয়নি এখনও। পথে আরও আক্রমণ আসতে পারে,' রবিনের কাঁধে হাত রাখলেন নাইট। 'সাবধানে যেয়ো। এরকম সময় দলবেঁধে না থেকে একা পথ চলাই ভাল। চলি।'

'আমাদের সাথে চলুন, স্যার নাইট,' রবিন আবেদন জানাল। 'আজ আমাদেরকে আপনার মেহমানদারি করার একটা সুযোগ দিন।'

'আজ না, বন্ধু। তবে নিশ্চিত থাকো, খুব শিগগিরই আবার আমাদের দেখা হবে।' ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন কালো নাইট। ধীরগতিতে নিজের পথে চলতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গী চলল পিছন পিছন।

রবিন নাইটের প্রশস্ত পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে।

'আমার কি সন্দেহ হয়, জানো ?' ফ্রেয়ার টাক বলল।

'কি ?' চিন্তিত মনে বলল রবিন।

'যদি কোনদিন শুনি ওই নাইট আমাদের রাজা রিচার্ড, আমি মোটেই অবাক হবো না।'

'আমিও না !' লিটল জন বলল।

***

ওরা যখন যাত্রা করে, তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। দ্রুত পা চালিয়ে সন্ধের দিকে ছোট এক শহরে পৌঁছল ওরা। শহর অতিক্রম করার সময় একটা সরাইখানা দেখে রবিন বলল, 'রাতটা এখানেই কাটানো যায়, কি বলো ? যথেষ্ট দূরে সরে আসা গেছে।'

'ঠিক,' বলল লিটল জন। 'এখানেই কাটিয়ে দেয়া যাক রাতটা।'

কিন্তু ফ্রায়ার টাক মৃদু আপত্তি করল। 'আরও কিছুদূর যেতে পারলে ভাল হয়। এই দূরত্ব যথেষ্ট মনে হচ্ছে না আমার। তবু, তুমি যখন ... '

সরাইখানায় খেতে বসল ওরা। খাওয়া সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে জানাল ওয়ামবা নামের এক লোক দেখা করতে এসেছে। তক্ষুণি উঠে পড়ল রবিন, সরাইখানার মালিক পিছন পিছন আসছে দেখে তাকে নিষেধ করে একাই বেরিয়ে এল বাইরে।

সরাইখানার সামনে চাঁদের আলোয় লোকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিন। দেখেই বুঝল তাকে আজই দুপুরে দেখেছে ওরা–কালো নাইটের সাথে। বেশ অবাক হলো রবিন। বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে কোথাও। 'কোন খারাপ খবর ?'

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা। 'খুব খারাপ খবর আছে। হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপের উল্টোপাল্টা কথায় আপনাদেরকে ধরতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। এই পথে শেরউডের দিকে এক হাজার সৈন্য পাঠানো হচ্ছে। হয় তারা আপনাদের পথে আটকাবে, নয়তো আগে গিয়ে শেরউডে ঢোকার সব রাস্তা বন্ধ করে দেবে। লর্ড বিশপকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন রাজা। ওই লোক সম্পর্কে আপনাকে নতুন করে কিছু বলার নেই। এর মধ্যেই দুটো অশ্বারোহী দল রওনা হয়ে গেছে, এখানে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগবে না। কালো নাইট আমাকে পাঠিয়েছেন খবরটা জানাতে। আমার মতে এখানে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না আপনাদের। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ুন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' বলল রবিন। 'স্যার নাইটকেও ধন্যবাদ জানাবেন আমাদের। আমি বুঝতে পারছি, এ বিপদের হাত থেকে বাঁচতে হলে কৌশল আর বুদ্ধির ওপরেই নির্ভর করতে হবে। ঠিক আছে। স্যার নাইটকে গিয়ে বলবেন, তিনি আমাদের জন্যে যা করেছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ।'

'বিদায়,' ওয়ামবা হাত মেলাল ওর সাথে। 'প্রার্থনা করি যেন নিরাপদে শেরউডে পৌঁছতে পারেন।'

তাড়াতাড়ি সরাইখানায় ফিরে গেল রবিন। সঙ্গীরা উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে। সরাইখানার মালিকও আছে তাদের সাথে। আগন্তুক কে, কেন হঠাৎ করে এখানে হাজির হয়েছে, জানতে ভীষণ আগ্রহী লোকটা।

'এক্ষুণি উঠে পড়ো সবাই,' ব্যস্ত গলায় বলল রবিন। 'রাজার সৈন্য পিছন পিছন আসছে আমাদেরকে ধরতে। সেইন্ট অ্যালাবাস্নে পৌঁছার আগে বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই।'

সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল ওরা। জোর পায়ে, নীরবে শহর ছেড়ে এল। সঙ্গীদেরকে ঘটনা জানিয়ে রবিন বলল, এখান থেকেই দু' দলে ভাগ হয়ে যেতে হবে ওদেরকে। একদলে থাকবে ও একা, পশ্চিমদিকে যাবে সে। অন্য দলে থাকবে বাকি তিনজন। তাদেরকে যেতে হবে পুবদিকে। দ্বিতীয় দলের ভার লিটল জনকে দিল রবিন।

'প্রথম দু'দিন উত্তরের পথ ধরবে না তোমরা। অনেক দূরে সরে গিয়ে ধরতে পারো। তবে রাজপথ যদ্দূর সম্ভব এড়িয়ে চলাই ভালো হবে। জন, ভেবেচিন্তে কাজ করবে। সবাইকে জ্যান্ত অবস্থায় শেরউডে দেখতে চাই আমি।'

বিস্মিত হলো ফ্রায়ার টাক। 'কিন্তু তখন যে বললে সেইন্ট অ্যালবাস্নের দিকে যেতে হবে আমাদেরকে ?'

'ওটা বলেছি সরাইখানার মালিক যাতে কথাটা সেনাবাহিনীকে জানায় এবং তারা ভুল পথে যায়।'

কিছুক্ষণের মধ্যে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা বাড়াল ওরা। তার একটু পরই বিশ-পঁচিশজন অশ্বারোহী সৈন্য এসে ঘিরে ফেলল সরাইখানা। কিন্তু যাদের খোঁজে আসা, তারা এরমধ্যে পগার পার হয়ে গেছে। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে আসায় কোন লাভ হয়নি।

'ওরা যে লোক ভালো নয়, তা আমি দেখেই বুঝেছি,' সৈন্যদলের নেতাকে বলল সরাই মালিক। 'যাওয়ার আগে একজন বলছিল, তারা আজ সারারাত সেইন্ট অ্যালবান্সের পথে হাঁটবে। আমার মনে হয় বেশিদূর যেতে পারেনি ওরা, তাড়াতাড়ি গেলে সহজেই ধরতে পারবে।' লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল সৈন্য দল, তীরের বেগে ছুটল আবার।

টাক আর লিটল জন নীরবে হেঁটে চলেছে তাদের পথে। সারারাত একটানা হাঁটল তারা, তারপরের সারাদিনও হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে এসেক্সের চেমসফোর্ড পৌঁছে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়ে আবার উত্তরের পথে পা বাড়াল। এবার কেমব্রিজ এবং লিঙ্কনশায়ারের মধ্যে দিয়ে কোনাকুনি এগোল শেরউডের দিকে। অবশেষে টানা আটদিন হেঁটে আস্তানায় ফিরতে পেরে স্বস্তির লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল ওরা। কিন্তু রবিন আসেনি জেনে মন খারাপ হয়ে গেল সবার, স্বস্তি উবে গেল।

আরেকদিকে রবিন শহর ছেড়ে এসে পশ্চিমের পথ ধরল। বিভিন্ন জায়গা হয়ে একটানা সাতদিন হেঁটে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ডাডলি পৌঁছল ও। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসা গেছে ভেবে সেখান থেকে পুবে চলল, শেরউডের দিকে। স্ট্যানটনে পৌঁছতে পেরে খুশিতে মন নেচে উঠল ওর। বিপদ কেটে গেছে, ভাবল রবিন। আর কিছুটা গেলেই নাকে বনের গাছ-গাছালির চেনা গন্ধ পাবে।

সামনে যে কতবড় বিপদ অপেক্ষা করছে, সে ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।

অন্যদিকে রাজার সৈন্যরা সেইন্ট অ্যালবান্সে গিয়ে বোকা হয়ে গেল। রবিন বা তার সঙ্গীদের হদিস পথে কোথাও পায়নি তারা, সেখানেও পেল না। দলে দলে অশ্বারোহী সেনাবাহিনী আসছে শহরে, চাঁদের আলোয় আলো হয়ে থাকা রাস্তা ভরে গেছে তাদের উপস্থিতিতে। কিন্তু যাদের খোঁজে আসা, সেই ডাকাতদের কোন খবর নেই দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল তারা। ভোর রাতের দিকে আরেক দল সৈন্য এল, তাদের সাথে এল বিশপ।

সেখানকার পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে তখনই দল-বল নিয়ে উত্তরে ছুটল সে। একজনকে রেখে গেল আরও যে সব সৈন্যদল আসছে, তাদেরকে তাঁর পথ অনুসরণ করতে বলার জন্য। চতুর্থ দিনের দিন নটিংহ্যাম পৌঁছল বিশপ। পৌঁছেই সৈন্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেলল, শেরউডে ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিল। শেরিফ এমন চমৎকার একটা সুযোগ কাজে লাগাতে

ছাড়ল না। রবিনহুডকে ধ্বংস করার এমন মোক্ষম মওকা আর কখনও পাওয়া যাবে না।

বনরক্ষী আর কনস্টেবলদের নিয়ে বড় একটা বাহিনী গঠন করে রাজার সৈন্যদের সাহায্যে পাঠিয়ে দিল সে। ফ্রায়ার টাক আর লিটল জন যেদিন শেরউডে ঢুকল, তার পরদিনই সমস্ত পথঘাট বন্ধ হয়ে গেল। এ ব্যাপারে কোন ধারণাই ছিল না রবিনের, তাই স্ট্যানটন ছাড়িয়ে এসে শিস দিতে দিতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলল ও।

পথে একটা ছোট ঝরনা দেখে পানি খাওয়ার ইচ্ছে জাগাতে সেটার কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল, আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে মুখে দিতে লাগল। পথের দু' ধারে ছোট ছোট গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ে ছাওয়া বন। পাখিদের অনবরত কিচির-মিচির শুনে শেরউডের কথা মনে পড়ে গেল–যেন কতকাল প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারেনি ও। শেরউডের নানান পরিচিত গন্ধে ভরা বাতাসে শ্বাস নিতে না পারলে প্রাণ ভরে না।

সামনে ঝুঁকে পানি খাচ্ছে রবিন, এমন সময় কানের পাশ দিয়ে কি যেন সাঁ করে উড়ে গিয়ে টুপ্ করে পানিতে তলিয়ে গেল। মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই লম্বা এক লাফে ঝরনা পেরিয়ে ওপারের একটা ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেল রবিন। একবারও পিছনে তাকায়নি, কারণ ও বুঝতে পেরেছে কানের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া জিনিসটা কি ছিল–এখন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলে যে মৃত্যু ঘটবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ও ঠিকমত আড়ালে পৌঁছতে পারার আগেই আরও ছয়টা তীর এসে বিঁধল আশপাশে। তার মধ্যে একটা সরাসরি ওর বুকের খাঁচায় এসে বিঁধল। চেইন আর্মারের বাধা না থাকলে ওই তীরটাই রবিনের মৃত্যুর কারণ হতে পারত। ওকে পালাতে দেখে কয়েকজন সৈন্য ঘোড়া থেকে নেমে ধাওয়া করল। কিন্তু বনের মধ্যে ওকে ধরা কঠিন ব্যাপার। কখনও ঝুঁকে, কখনও হামা দিয়ে, কখনও বা দৌড়ে ধাওয়াকারীদের অনেক পিছনে ফেলে দিল ও। কিছুক্ষণ দূর থেকে ভেসে আসা তাদের হাঁক-ডাক শুনল। তারপর আবার দে দৌড়।

আধ মাইলের মত পেরিয়ে একটা পাহাড়ের মাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। দেখল নিচে একদল সৈন্য রাস্তার পাশে ঘাপটি মেরে বসে আছে, এখন সামনে এগোলেই বিপদ। যে পথে এসেছে, সেই পথে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার দেখল না রবিন। কাজেই চট্ করে কয়েক পা পিছিয়ে এল।

ঘুরে আগের পথ ধরে নামতে শুরু করল ও। সিকি মাইলখানেক আসতে নিচের লোকগুলো দেখে ফেলল ওকে। সাথে সাথে মহা হই-চই লাগিয়ে দিল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না অবশ্য। কিছুদূর পর্যন্ত দৌড়ে এসে লোকগুলো যখন বুঝল ওকে ধরা সম্ভব নয়, তখন থেমে পড়ল।

কান ঘেঁষে যাওয়া তীরটার কথা ভেবে শিউরে উঠল রবিনহুড। মনে মনে বলল, বাঁচলাম ! আরেকটু হলেই কম্ম সারা হয়ে যেত। কিন্তু পেটের কি ব্যবস্থা করা যায় ? এত দৌড়ঝাঁপের কারণে খিদে আর পিপাসায় যে জান বেরিয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে ! হে সেইন্ট ডানস্টান, জলদি কিছু মাংস আর বিয়ার পাঠাও। নইলে যে প্রাণ বাঁচে না।

সাথে সাথে ইচ্ছে পূরণ হলো। ডার্বির এক মুচিকে আসতে দেখল রবিন। লোকটার নাম কুইন্স। কার্ক ল্যাংলির এক গৃহস্থের জন্য তৈরি করা জুতো দিয়ে আসতে গিয়েছিল লোকটা, সেখান থেকে ফিরছে এখন। জুতো পছন্দ হওয়ায় গৃহস্থ খুশি হয়ে মজুরি হিসেবে তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিয়েছে তাকে। তার সাথে পথে খাওয়ার জন্য বোনাস হিসেবে দিয়েছে একটা রোস্ট করা মোরগ ও এক বোতল বিয়ার।

কুইন্স সৎ মানুষ, তবে তার বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশ মোটা। ভাঙা রেকর্ডের মত গৃহস্থের একটা কথাই বার বার তার কানে বাজছে, 'কুইন্স, তোমার জুতো জোড়া সুন্দর হয়েছে, তাই তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিলাম। ... তাই তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ ... !' এ ছাড়া আর কোন চিন্তা মাথায় ঢোকার পথ পাচ্ছে না।

'এই যে, ভাই,' গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত রবিন ডাকল লোকটাকে। 'এত খুশি মনে কোথায় যাচ্ছ ?'

থেমে দাঁড়াল মুচি। নীল পোশাক পরা সুন্দর চেহারার এক যুবক তাকে সম্মান করে কথা বলছে দেখে খুশি হলো। 'ডার্বি শহরে যাব আমি, স্যার,' বলল সে। 'কার্ক ল্যাংলি থেকে আসছি। একজনের জন্যে যা একজোড়া জুতো বানিয়েছিলাম না ! দারুণ হয়েছে জুতোজোড়া ! লোকটা সে জন্যে খুব খুশি হয়ে আমাকে তিন শিলিং ছয় পেন্স আধ পেনি দিয়েছে ... ঈশ্বরের দোহাই বলছি। সৎভাবে পরিশ্রম করেছি বলেই না টাকাটা পেয়েছি, কি বলেন ? সেই জন্যেই এতো খুশি দেখাচ্ছে আমাকে, স্যার। কিন্তু, আপনি ... এতো সুন্দর পোশাক পরে ঝোপের নিচে কি করছেন, স্যার ?'

'আমি এখানে সোনার পাখি ধরব বলে বসে আছি।'

'তাই নাকি !' চোখ কপালে উঠল মুচি কুইন্সের। 'সত্যি ? সোনার পাখি কোনদিন দেখিনি আমি। এই ঝোপের নিচে আসে ওরা ? ঠিক আছে, তাহলে আমিও একদিন সোনার পাখি ধরতে আসবো।'

'তা এসো,' মাথা দোলাল ও। 'তোমার কাঁধের ঝোলায় কি ভাই ?'

সোনার পাখি নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে ঝোলাটার কথা একদম ভুলেই গিয়েছিল কুইন্স। রবিনের প্রশ্ন শুনে সেটার দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে মনে পড়ল কি আছে ওতে। বোকার মত হাসল সে। 'ওহ্, কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই ঝোলার মধ্যে একটা রোস্ট করা খাসি-মোরগ আর এক বোতল বিয়ার আছে। যার জন্যে জুতো বানিয়ে নিয়ে নিয়েছিলাম, সে খুশি হয়ে দিয়েছে। খুব মজা করে খাব আমি !'

'আমার কাছে বেচবে ওগুলো ?' খাবারের কথা শুনেই জিভে পানি এসে গেছে রবিনের। 'তাহলে এই নীল পোশাকটা তোমাকে দিয়ে দেবো আমি। আর তোমার জামা-কাপড়, চামড়ার অ্যাপ্রন, এসবের জন্যে দেবো আরও দশ শিলিং। কি, রাজি আছো বেচতে ?'

'আপনি নিশ্চই ঠাট্টা করছেন, স্যার !,' কুইন্স বলল। 'আমার এই মোটা কাপড়ের নোংরা ... '

'আমি কখনও কারও সাথে ঠাট্টা করি না,' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'এসো, এখনই পোশাক বদলে ফেলি আমরা। তুমি বললে তোমার পোশাক নাকি ভালো না। কিন্তু আমার কাছে তো দারুণ লাগছে। এসো, কাপড়চোপড় বদলে একসাথে বসে খেয়ে নেয়া যাক।'

নিজের পোশাক খুলতে শুরু করল রবিন। ওর দেখাদেখি কুইন্সও তাই করল। পোশাক বদল করা হয়ে যেতে লোকটার হাতে দশ শিলিং গুঁজে দিল ও। তারপর রোস্ট আর বিয়ার পেট ভরে খেয়ে হাত-পা মেলে আরাম করে বসল।

পেট ভরে খাওয়ার কারণে আবেশে চোখ প্রায় বুজে এসেছিল, এমন সময় হুড়মুড় করে ছয়জন অশ্বারোহী সৈন্য এসে হাজির হতে চমকে উঠল ওরা। লোকগুলো দ্রুত ঘোড়া থেকে নেমেই নীল পোশাক পরা কুইন্সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা।

'ধরা তাহলে পড়তেই হলো, অ্যাঁ ?' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সৈন্যদলের নেতা। 'অনেক ভুগিয়েছে ব্যাটা ! দেখো, শয়তানের ধাড়ির চেহারাটা দেখো একবার। যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতেও জানে না। ওসব চালাকিতে কাজ হবে না, বাপ্। ওঠো। তোমাকে ভালো করেই চিনেছি আমি।'

এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কুইন্স এতই বেকুব হয়ে গেছে যে চেষ্টা করেও মুখে কথা ফোটাতে পারছে না। বিস্ফারিত চোখ মেলে হাবার মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল বেচারা। দেখে মনে হয় বোধশক্তি যেটুকুও বা ছিল, এই এক ধাক্কায় খতম হয়ে গেছে।

ওদিকে রবিনও অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'এসব কি বলছেন ? কি ঘটছে এসব ? আমি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি ? এরকম এক সৎ লোককে আপনারা ... নিশ্চই কোন ভুল হয়েছে আপনাদের। ভুল করে আর কাউকে ... '

'থামো, মিয়া !' কড়া দাবড়ি লাগাল দলনেতা। 'এ কে, জানো ?' রবিনকে ডানে-বাঁয়ে 'না' সূচক মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'এ হচ্ছে এক ভয়ঙ্কর ডাকাত, রবিনহুড।'

নামটা শুনে কুইন্সের চোখ কপালে উঠল। মাথার মধ্যে আরও এলোমেলো হয়ে গেছে তার। এতই এলোমেলো হয়ে গেছে যে নিজের নাম-পরিচয়ই গুলিয়ে

ফেলেছে। দ্বিধার চোখে একবার রবিনের দিকে, আরেকবার নিজের পোশাকের দিকে তাকাল লোকটা। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের খেলা চলছে–সত্যিই কি সে ডার্বির কুইন্স নামের কোন মুচি ? নাকি এদের কথামত সেই ডাকাত !

নিচু কণ্ঠে বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'আমিই কি সেই লোক ? ... কিন্তু আমার তো মনে হয় ... না, আমি মুচি হবো কিভাবে ? মুচি তো আসলে ওই লোক। তাহলে মনে হয় আমিই রবিনহুড। ... কিন্তু ... '

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবিনহুড। 'ইশশ, কি দশা হয়েছে বেচারার ! আপনার ধমক খেয়ে এমন অবস্থাই হয়েছে, নিজের পরিচয়টাও গুলিয়ে ফেলেছে বেচারা। মুচি কুইন্স তো আমি। আমি ডার্বি শহরের কুইন্স মুচি।'

'তাই নাকি ?' এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো কুইন্সের কাছে। 'তাহলে আর কোন সন্দেহ রইল না, আমিই রবিনহুড। শোনো, ধরা পড়েছি ঠিকই, কিন্তু মনে রাখবে আমি হচ্ছি শেরউড জঙ্গলের রাজা। আমার মতো ডাকাত আর কোথাও খুঁজে পাবে না তোমরা।'

'পাগলামির ভান করছ ?' খেঁকিয়ে উঠল দলপতি। 'দাঁড়াও, বের করছি তোমার ভান। ব্যাটার দু' হাত পিছমোড়া করে বাঁধো দেখি ! বিশপের সামনে নিয়ে কায়দামতো মশলা দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চল্, ব্যাটা !'

হাত বেঁধে কুইন্সকে নিয়ে রওনা করল ওরা। একটা বাঁক ঘুরে সৈন্যদল চোখের আড়ালে চলে যেতেই হাসিতে ফেটে পড়ল রবিন। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল ওর। আসল পরিচয় প্রকাশ হলে সৈন্যরা কুইন্সের কোন ক্ষতি করবে না, কিন্তু তাকে রবিনহুড বলে বিশপের সামনে হাজির করা হলে তার চেহারা কেমন হবে, তাই ভেবে হাসি ঠেকাতে পারছে না ও। কিছুক্ষণ পর আবার পুবদিকে যাত্রা করল রবিন। সম্ভব হলে সৈন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে আজই শেরউডে ঢুকে পড়বে।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। এই কয়দিনে বাধ্য হয়ে একশো চল্লিশ মাইলেরও বেশি হাঁটতে হয়েছে ওকে, কাজেই শেষ সময়ে দেহের ভার সহ্য করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল পা দুটো। মাইল দশেক চলার পর শক্তি একদম নিঃশেষ হয়ে গেল রবিনের। মনে হলো, আর এক পা এগোলেই রাস্তার ওপর আছড়ে পড়বে। কিছু সময় এক জায়গায় বসে জিরিয়ে নিল রবিন, তারপর শেষ চেষ্টা হিসেবে অনেক কষ্টে আরও দু' মাইল এগোল। তারপর পা দুটো থর থর করে কাঁপতে শুরু করল।

নিরুপায় হয়ে কাছের একটা সরাইখানায় উঠল ও। একটা রুম ভাড়া নিল। সরাইখানায় তিনটা রুমের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বাজে, সেটাই একজন মুচির উপযুক্ত হবে ভেবে ওকে দেয়া হলো। কামরাটা খুব অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাল না রবিন। শরীরের যে অবস্থা, তাতে এখন মাথা গোঁজার একটা জায়গা আর ঘুমানোর বিছানা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবছে না ও।

বালিশে মাথা ঠেকানোমাত্র হুঁশ হারিয়ে ফেলল। ওদিকে রবিন ঘুমিয়ে পড়ামাত্র কালো মেঘ জমল আকাশে, তার কিছু সময় পর শুরু হলো প্রবল ঝড়। এই আবহাওয়ার মধ্যে নটিংহ্যামের চারজন ধনী লোক এসে হাজির হলো সেখানে। নিজেদের শহরে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় ঝড়ের কবলে পড়ে নিরুপায় হয়ে এখানেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঘোড়া আস্তাবলে রেখে খেয়েদেয়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল তারা। বাকি দু' রুমে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে হলো। কিন্তু বিছানাগুলো ছোট, এক বিছানায় দু'জনকে ঘুমাতে হবে দেখে কিছুক্ষণ গজগজ করল লোকগুলো।

তারপর নিরুপায় হয়ে শুয়ে পড়ল। এরমধ্যে বাতাসের তেজ আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে, দড়াম দড়াম করে বাড়ি খাচ্ছে সরাইখানার দরজা-জানালা। ধুলোয় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সবকিছু। খানিক পর বৃষ্টি নামল। প্রায় একই সাথে সরাইখানায় ঢুকল সেইন্ট মেরি অ্যাবির এক ফাদার। উঁচু পদের ফাদার, খুব দামি কাপড়ের আলখাল্লা পরা। লোকটার হম্বি-তম্বি দেখে তটস্থ হয়ে উঠল সরাইখানার মালিক, ভাল ভাল খাবার এনে খাওয়াল তাকে। এতে মেজাজ কিছুটা শান্ত হলেও পরে যখন শুনল থাকার রুম নেই, এক মুচির সাথে ঘুমাতে হবে, অমনি আবার টং হয়ে গেল মর্জি।

কিন্তু না ঘুমিয়েই বা যায় কোথায় ? শেষ পর্যন্ত মোমবাতি হাতে সেই রুমেই ঢুকে পড়ল ফাদার। মৃদু আলোয় ঘুমন্ত রবিনহুডের চেহারা দেখে মনের মধ্যে যে ঘৃণার ভাবটা ছিল, তার অনেকটাই দূর হয়ে গেল। সে যেমন কদাকার, নোংরা এক মুচির দেখা পাবে ভেবেছিল, এ সেরকম নয়। এর চেহারা যেমন সুন্দর, কাপড়চোপড়ও সেই তুলনায় যথেষ্ট ভালো। কাজেই পোশাক বদলে রবিনের পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল ফাদার।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল রবিনের। চোখ মেলে পাশেই এক ন্যাড়া মাথার ফাদারকে ঘুমাতে দেখে চমকে উঠল ও। টেরই পায়নি লোকটা কখন এসে ঘুমিয়েছে। বিছানা থেকে আস্তে করে নেমে পড়ল রবিন, ফাদারের পোশাকগুলোর ওপর চোখ পড়তে মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

মনে মনে বলল, কিছু মনে করবেন না, হোলি ফাদার। আপনি যেমন আমার অনুমতি না নিয়েই আমার বিছানায় ঘুমিয়েছেন, তেমনি আমাকেও বিশেষ দরকারে আপনার অনুমতি ছাড়া আপনার পোশাকগুলো ধার নিতে হলো। এই বলে মুচির পোশাক খুলে রেখে ফাদারেরগুলো পরে নিল রবিন, সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল খুশি মনে।

ওদিকে ঘুম ভাঙতে ফাদার একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। মুচিটা নেই, রাতে খুলে রাখা তার দামি পোশাকগুলোও নেই। রুমের এক কোনায় মুচিটার পুরনো কাপড়চোপড় পড়ে আছে কেবল। চেঁচামেচি আর গালাগাল করে

সরাইখানার মালিকের ভূত ভাগিয়ে ছাড়ল ফাদার, কিন্তু তাতে কাজ কিছুই হলো না। মুচিটা কখন কোনদিক দিয়ে সরাইখানা ছেড়ে চলে গেছে, কেউ দেখেনি। এদিকে ফাদারের আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। এখনই যেতে হবে তাকে। সে মুচির কাপড় পড়েই হোক, অথবা ন্যাংটা হয়েই হোক। উপায় নেই দেখে প্রথম পথটাই বেছে নিল ফাদার।

মুচিদের চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে করতে সেই পোশাক গায়ে চড়িয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে চলল সে। কিন্তু বরাত মন্দ, কিছুদূর যেতে না যেতে একদল সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে গেল সে। লোকগুলো তাকে টেনে-হিঁচড়ে হেরিফোর্ডের বিশপের কাছে ধরে নিয়ে চলল। তার কোন কথা বিশ্বাস তো করলই না, বরং রবিনহুডকে মাথা কামিয়ে যাজক সাজার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে হেসে খুন হয়ে গেল সবাই।

'আর ফাঁকি দিতে পারবে না তুমি !' দলনেতা বলল। 'নীল পোশাক পরা মুচিকে ধরে নিয়ে অনেক ধমক খেয়েছি বিশপের। অনেক ভুগিয়েছো। আর না।'

ওদিকে খুশি মনে শেরউডের দিকে এগিয়ে চলেছে রবিনহুড। পাহারারত দুটো সেনাদলের নাকের ডগার ওপর দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারায় খুশি। শেষ পর্যন্ত শেরউডে ফিরতে পারবে বুঝে মন আনন্দে নাচছে। আর মাত্র কয়েক মাইল যেতে পারলেই হয়। আসল ফাদারের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানলে এত খুশি হতে পারত না রবিন। মুচির পোশাক পরা সেই ফাদারকে সামনে ধরে আনা হতেই হায় হায় করে উঠল বিশপ।

বুঝতে অসুবিধে হলো না, আবারও ছদ্মবেশ নিয়ে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে বদমাশটা। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই শেরউডের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। মাথা মোটা সেপাইদের ভরসায় থাকতে আর ভরসা হলো না বিশপের, নিজেই ঘোড়া নিয়ে তীরবেগে ছুটল। পিছন পিছন ছুটল একদল সৈন্য। যে করে হোক, রবিনকে পথেই পাকড়াও করতে হবে। নইলে একবার যদি ও বনের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পিছনে ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দ শুনেও ঘাবড়াল না রবিনহুড। কারণ জানে, রাজার সৈন্যরা যাজকদের কিছু বলবে না। কিন্তু তবু কি মনে হতে একবার পিছনে তাকাল ও, কলজেটা ছাঁৎ করে উঠল সাথে সাথে। বারো-চোদ্দটা ঘোড়া তুমুল গতিতে ছুটে আসছে ওর দিকে, সবচেয়ে আগের ঘোড়ার পিঠে বসা হেরিফোর্ডের চর্বির ডিপো বিশপ।

দূর থেকে যাজকের পোশাক পরা রবিনকে দেখতে পেয়েই চিৎকার করে উঠল সে। 'ধরো, ধরো ! ওই যে পালাচ্ছে রবিনহুড !'

বিশপকে দেখামাত্রই বনের দিকে খিঁচে দৌড় লাগাল রবিন। দেখতে দেখতে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে চলে গেল।

'ঘিরে ফেলো জঙ্গল !' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল বিশপ। 'বেশি বড় না ওটা, এখনই ভালমত ঘেরাও করে ফেলো। পালিয়ে যাবে কোথায় শয়তানটা ! চারদিক থেকে ঘেরাও করে এগিয়ে গেলে ধরা পড়তেই হবে !'

কাজটা সারতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না সৈন্যদের। তার মধ্যে সরে পড়ার কোন উপায় ছিল না রবিনের, ঘেরাওর মধ্যে আটকা পড়ে গেল ও। এবার ধীরে ধীরে, অনেক সাবধানে সামনে এগোল সৈন্যরা। কারণ এখানে রবিনের আরও লোকজন আছে কি না জানা নেই তাদের। যদি থাকে ! যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাদের ওপর ! শেরউডের আধ মাইলের মধ্যে এসে এমন বিপদে পড়তে হবে, রবিনহুড তা কল্পনাই করেনি।

অবশ্য তাই বলে সাহস হারায়নি ও, বুদ্ধিও গুলিয়ে ফেলেনি। এক দৌড়ে বনটার ঠিক মাঝখানে পৌঁছে গেল রবিন। ও জানে, ছোট ছোট দু' কামরার একটা কুটির আছে সেখানটায়। এক বিধবা বুড়ি থাকে সেই কুটিরে। খুব কষ্টে দিন কাটে তার। প্রায়ই তাকে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে রবিন। বুড়ি বাড়িতে থাকলে হয় এখন। আছে ! বৃদ্ধাকে ঘরে বসে চরকা কাটায় ব্যস্ত দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ও।

এক ফাদারকে হাঁপাতে হাঁপাতে তার ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। 'আমি রবিন, বুড়ি মা !' ঘরে পা রেখেই বলল ও। 'হেরিফোর্ডের লর্ড বিশপ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাকে তাড়া করেছে, বুড়ি মা। ধরতে পারলে নির্ঘাৎ ফাঁসি দেবে আমাকে।'

'তাই নাকি ? কিচ্ছু ভেবো না তুমি,' বুড়ি বলল। 'আমি বেঁচে থাকতে সেটা কোনদিনও হবে না। তোমাকে ফাঁসি দেবে ? তাহলে বিপদে-আপদে আমাকে সাহায্য করবে কে, ওই বিশপ ? যাও, পাশের ঘরে আমার কিছু ছেঁড়া কাপড় আছে, সেগুলো তাড়াতাড়ি পরে নাও গিয়ে। টুপিটাও মাথায় দিতে ভুলো না। নিজের কাপড়গুলো ওখানেই রেখে দিয়ো।'

বুড়ির প্ল্যান বুঝতে পেরে হাসি ফুটল রবিনহুডের মুখে–কিছুদিন আগে এই একই উপায়ে নিজেকে পিটারবরোর বিশপের হাত থেকে রক্ষা করেছে ও। বুড়ির দু' গালে চুমু খেয়ে দৌড়ে পাশের রুমে গিয়ে ঢুকল। দু' মিনিট পরই কুটির থেকে বেরিয়ে এল আবার, লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো বুড়ির মত ঝুঁকে পড়ে ঠুক ঠুক করে হাঁটছে। পরনে শতচ্ছিন্ন, মলিন পোশাক।

মাথায় কিনারা ভাঙা বিরাট এক টুপি। হাতে কিছু সুতো আর একটা চরকাও আছে। কিছুদূর যেতেই লোকজনের আওয়াজ পেল রবিন, কয়েকটা ঘোড়ার ছুটে আসার শব্দও পেল। আরও একটু ঝুঁকল ও, মুঠোয় ধরা লাঠিটা হাঁটার ছন্দে থর থর করে কাঁপছে। পিছন থেকে হঠাৎ একটা চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে শুনল ও।

'অ্যাই, কে যায় ?' হেঁড়ে কণ্ঠে বলল লর্ড বিশপ। 'ও, বুড়ি ! ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো !'

সাথে সাথে বিশপের নির্দেশ পালিত হলো, বুড়িকে প্রায় তুলে নিয়ে আসা হলো তাঁর সামনে। নিজের চারদিকে সৈন্য দেখে কাঁপুনি বহুগুণ বেড়ে গেল বুড়ির।

'অ্যাই, বুড়ি ! তুমি কোত্থেকে আসছো ?' প্রশ্ন করল বিশপ।

'আ-আ-মার ঘ-অ-র থে-এ-কে, ফা-আ-দার,' কাঁপা গলায় বলল বুড়ি। 'ব-অ-নের ম-ধ্যে ... '

এত কথা শোনার ধৈর্য নেই বলে তাকে থামিয়ে দিল বিশপ। বুড়ি চওড়া কিনারাওয়ালা টুপি পরে মুখ আড়াল করে কথা বলছে দেখেও কোন সন্দেহ হলো না তার। ভাবল, তাকে সম্মান দেখাতে মাথা নিচু করে রেখেছে। 'এদিক দিয়ে কোন লোককে যেতে দেখেছো ?'

'এ-এ-ক হোলি ফা-আ-দারকে দে-খে-ছি ... '

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল বিশপ। 'বলো কি ! কোথায়, কোথায় ? কোনদিকে গেছে লোকটা ?'

'আ-আ মার ঘ-অ-রে। বি-ই-স-শ্রাম নি-তে গে-ছে হো-লি ফা আ ... '

'ফাদার না কচু !' খেঁকিয়ে উঠলেন বিশপ। 'থামো, আর বক বক করতে হবে না ! অ্যাই, তোমরা সবাই বুড়ির বাড়ি ঘেরাও করে ফেলো। ব্যাটাকে টেনে বের করে নিয়ে এসো ভেতর থেকে। এতদিনে হাতের মুঠোয় পেয়েছি ওকে !'

সৈন্যরা পড়িমরি করে সেদিকে ছুটতে কুঁজো বুড়ি লাঠি ঠুকে ঠুকে তার নিজের পথ ধরল। কিন্তু একটা ঝোপের আড়ালে যেতেই আশ্চর্য পরিবর্তন এল তার মধ্যে, সোজা হয়েই ঝড়ের বেগে সামনে ছুটল সে। বনের মধ্যে দিয়ে প্রাণপণে ছোটে, আবার ফাঁকা জায়গায় পড়লে আগের মত বুড়ি হয়ে যায়, এইভাবে ছুটতে ছুটতে নিজের আস্তানার কাছে চলে এল রবিনহুড।

সেখানে পৌঁছে আরেক বিপদে পড়তে যাচ্ছিল ও। দূর থেকে এক বুড়িকে তীরের বেগে আস্তানার দিকে ছুটে আসতে দেখে চোখ কপালে উঠল লিটল জনের।

'কি ব্যাপার !' বলল সে। 'বুড়ি যে একেবারে উড়ে আসছে ! নিশ্চই ডাইনি হবে বুড়ি !' বলতে বলতে ছিলায় তীর বসিয়ে ফেলল।

'অ্যাই, থামো থামো !' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিনহুড। 'আমি রবিন !'

ওর গলা চিনতে পেরে ভারি অবাক হলো দৈত্যাকার লোকটা। 'তাই তো !' অস্ফুটে বলল। 'এ কি অবস্থা হয়েছে তোমার ? বুড়ির কাপড় পরেছো কেন ?'

'পরে শুনো সেসব,' রবিন বলল হাঁপাতে হাঁপাতে। 'আগে জলদি করে শিঙায় ফুঁ দাও। এই মুহূর্তে সবাইকে দরকার আমার।'

এক মুহূর্তও দেরি না করে ফুঁ দিল লিটল জন, অমনি চারদিক থেকে হুড়মুড় করে এসে হাজির হলো রবিনের সাত কুড়ি সশস্ত্র, দুর্ধর্ষ অনুচর। রবিনের পিছন পিছন বুড়ির বাড়ির দিকে ছুটল তারা।

ওদিকে বিশপ বুড়ির বাড়িতে পৌঁছে সৈন্যদের চারজনকে ভেতরে পাঠাল রবিনকে ধরে আনতে। একটু পরই যাজকের পোশাক পরা বুড়িকে ধরে নিয়ে এল তারা। বুড়ির মুখ টুপিতে ঢাকা রয়েছে বলে চিনতে পারল না বিশপ, সে চেষ্টাও অবশ্য করল না সে।

'ওর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ওই সাদা ঘোড়ায় তুলে দাও,' নির্দেশ দিল। 'শয়তানটাকে নটিংহ্যামে নিয়ে জেলে না ঢোকাতে পারা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কালই ফাঁসি দেয়া হবে ওকে।'

বুড়ি কোন কথা বলছে না। সবাই ভাবল ধরা পড়ে বোকা বনে গেছে হয়তো রবিনহুড, তাই কথা সরছে না মুখ দিয়ে। লোকটা রবিনহুড না আর কেউ, তা পরীক্ষা করে দেখার কথাও কারও মাথায় এল না। সবাই যেন এখান থেকে সরে পড়তে পারলেই বাঁচে এখন। কে জানে, রবিনের বন্দি হওয়ার খবর শুনে তার দলবল যদি হঠাৎ আক্রমণ করে বসে তাদের ওপর ! কাজেই তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে গেল সৈন্যদল।

বিশপ তো আনন্দে আত্মহারা। রবিনহুডকে কিভাবে পাকড়াও করা হলো, পথ চলতে চলতে সেই গল্প সাজাচ্ছে। নটিংহ্যামে গিয়ে সবাইকে বলতে হবে তো সে কাহিনী ! গল্প সাজাচ্ছে, তার ওপর নিজের কাল্পনিক বাহাদুরির রংও চড়াচ্ছে।

হাসি পাচ্ছে তার। খুব হাসি পাচ্ছে। চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। কিন্তু খানিক পর একটা বাঁক ঘুরতেই আপনাআপনি থেমে গেল হাসি, সামনে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেল বিশপ। লিঙ্কন গ্রিন পরা সাত কুড়ি সশস্ত্র জোয়ান সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ধনুকের সাথে তীর জুড়ে নিয়ে প্রস্তুত। সেই বুড়িটা রয়েছে তাদের সবার আগে।

'আরে ! ওরা কারা !' বলল বিস্মিত বিশপ। জবাবটাও নিজে নিজেই বের করে নিল। কারণ সে খুব ভাল করেই জানে লিঙ্কন গ্রিন কারা পরে ! লিটল জনকেও তাদের মাঝে দেখতে পেল সে। 'ওদের সামনের ওই বুড়িটা ... কে ও ?'

জবাবে তার পাশের অশ্বারোহী বুড়ি বলে উঠল, 'মনে হয় ওই লোকটাই রবিনহুড।'

ঝট্ করে তার দিকে ফিরল লর্ড বিশপ। অমনি বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'তাহলে তুমি কে ?'

খিক খিক করে হাসতে শুরু করল বুড়ি। কিছুক্ষণ পর হাসি সামলে মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলল। দেখা গেল চামড়া কোঁচকানো, দাঁতহীন এক বুড়ি মাড়ি বের করে হাসছে।

'সে কি, চিনতে পারছো না ?' বলল সে। 'রবিনহুডকে বন্দি করে ফাঁসিতে ঝোলাবে বলে নিয়ে যাচ্ছিলে না তুমি ? কেমন লাগছে এখন ?' প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল বুড়ি।

ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল বিশপের। বুঝতে আর বাকি নেই, রবিনহুডের হাতে খোদ নিজেই ধরা পড়ে গেছে সে। সামনে থেকে এক ঝাঁক তীর ছুটে আসছে দেখে বিশপকে ফেলে ঝেড়ে দৌড় লাগাল তার অশ্বারোহী সৈন্যদল। ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি অবস্থা হলো সবার। বিশপও মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কে যেন তার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল।

এবার তার দিকে এগিয়ে এলো রবিনহুড। ঘোড়াটাকে গাছের সাথে বাঁধার নির্দেশ দিয়ে লর্ড বিশপকে নেমে আসতে বলল। ভয়ে ভয়ে নামল লোকটা। সারা শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। মুচকে হাসল রবিন।

'তারপর, লর্ড বিশপ ? আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছুই তো করলেন। এবার আমি কিছু একটা করি ?'

দুই হাঁটু পরস্পরের সাথে ঠকাঠক বাড়ি খাচ্ছে তাঁর, মুখ দিয়ে কোন শব্দই বের হচ্ছে না। প্রাণভয়ে জিভ, গলা-বুক শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। হাসল রবিন। 'আপনার মতো জঘন্য, নিচ মানুষের গায়ে হাত দিতেও আমার ঘৃণা হয়, তাই বেঁচে গেলেন এবার। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বভাব না বদলালে আগামীতে আর ছেড়ে দেয়া হবে না। লিটল জন, এঁর থলিতে কি আছে দেখো।'

থলিতে কছু টাকা-পয়সা পাওয়া গেল, সব নিয়ে নিল লিটল জন। রবিনের নির্দেশে তার অর্ধেক বুড়িকে দিয়ে দেয়া হলো।

'এবার যেতে দাও,' রবিন বলল। 'আজ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবো না আমরা।'

বিশপকে ছেড়ে দিল লিটল জন, তবে ঘোড়ার পিঠে উল্টো করে বসিয়ে। বাঁধাছাদা আরোহী নিয়ে টগবগ করে নটিংহ্যামের দিকে ছুটল ঘোড়াটা।

স্যার গাইয়ের সমাপ্তি

বসন্তের চমৎকার এক সকাল। গাছে গাছে নতুন ধরা কচি পাতারা মৃদুমন্দ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। সব গাছে আর সব ঝোপে পাখিরা আনন্দের গান গাইছে।

সেগুলোর মধ্যে একটা শরালি পাখির গলা সবচেয়ে চড়া। রবিন যে গুহায় ঘুমিয়ে আছে, সেটার ঠিক মুখের কাছের এক কাঁটা ঝোপের ডালে বসে গাইছে পাখিটা। ওটার গানেই ঘুম ভাঙল রবিন হুডের। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। তাকিয়ে দেখল দলের প্রায় সবাই জেগে গেছে। খোলা গ্লেডে হাঁটাহাঁটি করছে। ওদিকে নাশতা তৈরির আয়োজন চলছে।

'এতক্ষণ অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল রবিন। 'দেখেছি, দু'জন শক্তিশালী ফরেস্টার আমার সাথে যুদ্ধ করছে। পরে দেখি ... তারা আমাকে পরাজিত করে বেঁধে ফেলেছে। তারপর আমাকে মারতে শুরু করল তারা, আর তারপর ... আমার তীর-ধনুক কেড়ে নিল। ঈশ্বর করুন এই স্বপ্ন যেন সত্যি না হয়। আমি বা আমার অনুসারীদের কাউকে যেন ভুগতে না হয়।'

'ওসব কিছু না,' লিটল জন বলল। 'স্বপ্ন হালকা জিনিস, পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে আসা বাতাসের মত আসে আর যায়।'

'তা হোক,' মাথা নাড়ল রবিন। 'আমরা জানি নটিংহ্যামের শেরিফ আমাদেরকে শায়েস্তা করতে লোক জোগাড় করছে, শেরউডে গুপ্তচর পাঠিয়ে আমাদের আস্তানা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। লোকটার কোন বদ মতলব না থেকেই পারে না। তাই আমাদের সর্বক্ষণের জন্যে সতর্ক থাকা উচিত।'

'আমরা রেডি আছি, রবিন,' লিটল জন আশ্বস্ত করল ওকে। 'গ্লেডে আসার প্রত্যেকটা পথের মাথায়, মাটিতে-গাছের ওপরে কড়া গার্ডের ব্যবস্থা আছে। দিন-রাত পাহারা দিচ্ছে তারা।'

'ওদের সবাইকে আজকের দিনের জন্যে চারিদিকে কড়া নজর রাখতে বলো। বিশেষ করে মাটির গার্ডদেরকে। পরে আমি আর তুমি গ্রিনউডের দিকে ঘুরতে যাব। আমি দেখতে চাই, আমার স্বপ্নের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না আমাদের ওপর।'

নাশতা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল রবিন ও জন। প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখতে দেখতে আপনমনে হেঁটে চলেছে। ডালে ডালে নানান পাখি ডাকছে, পাতার ফাঁক গলে রাস্তার ওপর এসে পড়েছে সকালের কচি রোদের আলো। শান্ত, সমাহিত, অপূর্ব এক পরিবেশ।

কিন্তু গ্লেড ছেড়ে আধ মাইলের বেশি যেতে পেরেছে কি না সন্দেহ, হঠাৎ সামনের একটা দৃশ্য দেখে থমকে যেতে হলো। দেখা গেল ফরেস্টারের মত কেনডাল গ্রিন কাপড়ের পোশাক পরা এক লোক গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুড মুখের ওপর টেনে নামানো–অস্বাভাবিক। হাতে ধনুক। কোমরে ঝুলছে তলোয়ার ও একটা ড্যাগার। তার জারকিন ঘোড়ার চামড়ার তৈরি।

'তুমি এই গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করো,' লিটল জন চাপা কণ্ঠে বলল। 'আমি গিয়ে কথা বলে আসি লোকটার সাথে। দেখি কি মতলব তার।'

কিন্তু রবিন তৎক্ষণাৎ চড়া গলায় বাধা দিল–হয়তো স্বপ্ন নিয়ে দুশ্চিন্তা আর শেরিফের অকস্মাৎ আক্রমণের শঙ্কা মন থেকে পুরোপুরি দূর হয়নি বলে অজান্তেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। 'আমি দাঁড়িয়ে থাকব আর আমার লোকেরা গিয়ে বিপদের মোকাবেলা করবে, আমি তাতে অভ্যস্ত নই। এমন কথা বলার জন্যে মনে হচ্ছে আগে তোমাকে আচ্ছামত ধোলাই করে নিই।'

ওর ভাবসাব দেখে রাগ হলেও সামলে নিল লিটল জন। রবিনের এরকম চট্ করে রেগে ওঠার সাথে মোটামুটি পরিচিত সে। বলল, 'আমি তাহলে যাই। তুমি ওর সাথে কথা বলে দেখো তোমার স্বপ্ন পূরণ হয় কি না। আমি নটিংহ্যাম রোড ধরে কিছুদূর ঘুরে দেখে আসি ওদিকে সব ঠিকঠাক আছে কি না।'

রবিনের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করে ঘুরে দাঁড়াল সে। শিস বাজাতে বাজাতে ঘাসমোড়া পথ দিয়ে নটিংহ্যামের দিকে চলে যাওয়া রাজপথে পা রাখল। রেখেই আঁতকে উঠল সে। মাঝপথে শিস থেমে গেল। রাজপথের কিনারায় ঘাসের ওপর দু'টো মৃতদেহ পড়ে আছে–দু'জনেরই হৃৎপিণ্ড বরাবর তীর বিঁধে আছে। তারা যে নিজেদের লোক, বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না জনের।

পরক্ষণে ধুপ্ ধাপ্ দৌড়ে আসা ও চিৎকারের শব্দে মুখ তুলল সে। দেখতে পেল নটিংহ্যামের দিকে থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে উইল স্কারলেট–তার পিছন পিছন শেরিফের গোটা সৈন্য বাহিনী এবং স্যার গাইয়ের কিছু লোক। প্রাণভয়ে স্কারলেটের চোখ বিস্ফারিত। কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়। তার একটু পিছনের একটা গাছের আড়াল থেকে উইলিয়াম ট্রেন্ট নামের এক বনরক্ষীকে বেরিয়ে আসতে দেখল জন, পরমুহূর্তে তীর ছুড়ল লোকটা। ছুটতে ছুটতে লাফিয়ে উঠে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল স্কারলেট। আর নড়ল না।

তাই দেখে চিৎকার করে উঠল জন, প্রায় একই মুহূর্তে টোয়াং শব্দ তুলে একটা ব্রড হেড ছুটে গেল তার ধনুক থেকে। স্কারলেটের খুনি কাজ সেরে ধনুক নামাবার সুযোগ পায়নি, আগেই তার বুক এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল ওর অব্যর্থ তীর। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ট্রেন্ট, কিন্তু ব্রড হেডের গতি থামেনি তখনও। চোখের সামনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পরিণতি দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল জনের, তাই তীরটা এতই জোরে ছুড়েছে যে ট্রেন্টের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে তার পিছনের জনের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিঁধল সেটা। এদিকে টানের চোটে তার ধনুকও কয়েক টুকরো হয়ে গেছে। ওটা ফেলে আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি তলোয়ার বের করতে চাইল জন, কিন্তু হলো না।

দেখতে দেখতে শেরিফের লোকজন এসে পড়ল। হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখল তাকে। একটু পর শেরিফ এসে পৌঁছল সেখানে। ঘোড়ার পিঠে আয়েশ করে বসে লিটল জনের আপাদমস্তক নজর বোলাল সে। চেহারায় উল্লাস।

'সাবাশ !' বলল সে। 'সবচেয়ে বড় বদমাশগুলোর একটাকে ধরা গেল তাহলে। মিয়া, পায়ে দড়ি বেঁধে এখান থেকে নটিংহ্যাম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হবে তোমাকে, বুঝতে পেরেছ ? তার পর ক্যাসল হিলে ফাঁসিতে লটকানো হবে।'

একটুও ঘাবড়াল না লিটল জন। বলল, 'কিন্তু ঈশ্বরের অন্যরকম ইচ্ছে আছে কি না কে বলতে পারে ?'

'পালিয়ে যাবে বোঝাতে চাইছ ?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল শেরিফ। 'অন্তত এবার সেটি হবার জো নেই, বাপু। আজ শেরউড থেকে তোমাদের মত সমস্ত জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে সাফ করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি আমি।'

'ঈশ্বর রবিনহুডকে রক্ষা করুন,' বিড়বিড় করে বলল লিটল জন। সামান্য কথা কাটাকাটিতে ওকে একা রেখে চলে আসার কারণে এখন খারাপ লাগছে তার। মনে হচ্ছে কাজটা ঠিক হয়নি।

ওদিকে রবিনহুড গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ফরেস্টারের পোশাক পরা লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় ওর জন্যই অপেক্ষা করছে সে। মাথার হুড ফেলে মুখ প্রায় ঢেকে রেখেছে। চেহারা ঠিকমত দেখা যায় না। লোকটাকে অভিবাদন জানাল রবিন।

'আপনার বো-টা ভারি সুন্দর, স্যার,' নির্ভেজাল প্রশংসার সুরে বলল ও। 'জিনিসটা দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন ভাল মানের তীরন্দাজ। ঠিক বলিনি, স্যার ?'

'তা ঠিকই বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল সে। তার কথায় কড়া পশ্চিমের টান আছে টের পেল রবিন।

'তা এখানে কি করছেন আপনি ?'

'আমি এদিকে নতুন এসেছি,' লোকটা বলল। 'বনের মধ্যে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'আমার সাথে আসুন তাহলে,' রবিন বলল। 'আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসছি। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায় ?'

'আমি রবিনহুড নামে একজনকে খুঁজছি,' বলল আগন্তুক।

'কেন জানতে পারি ?'

'আমি তার দলে যোগ দিতে চাই। তার কথা অনেক শুনেছি আমি। বাকি জীবন তার সেবা করে কাটাতে চাই।'

'ও, এই কথা ? আসুন আমার সাথে। আমি আপনাকে রবিনহুডের আস্তানায় পৌঁছে দেব।'

পাশাপাশি এগিয়ে চলল দু'জনে। আগন্তুক মাথা নিচু করে হাঁটছে, যেন কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তাছাড়া একটু পর পর কায়দা করে পিছিয়েও পড়ছে, বোঝাতে চাইছে রবিনের সাথে তাল মেলাতে পারছে না। ব্যাপারটা খেয়াল হলেই গতি কমিয়ে দিচ্ছে রবিন। পিছিয়ে এসে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আবার পাশাপাশি হাঁটছে। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর একটা ছোট গ্লেডে পৌঁছল।

'এখানে একটু জিরিয়ে নিলে হয়, স্যার,' লোকটা বলল।

মাথা দোলাল ও। 'ঠিক আছে। জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে আমি দেখতে চাই আপনি কেমন মার্কসম্যান।'

'বেশ।' সন্তুষ্ট দেখাল আগন্তুককে। 'আসুন তাহলে, এখনই সে পরীক্ষা হয়ে যাক। একটা মালা বানিয়ে কোন গাছের সাথে টাঙিয়ে দিন।'

'মালা ? আমাদের এদিকে ওসব মালা-টালার যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে,' বলল রবিন। 'আজকাল ছোট ছেলেরা ছাড়া ওই ধরনের টার্গেট কেউ ব্যবহার করে না। সবুর করুন, এদিকে বড়রা কিভাবে টার্গেট প্র্যাকটিস করে তাই দেখাচ্ছি তোমাকে।'

কাছের এক হেজেল ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেল। কোমরে ঝোলান ছুরিটা বের করে ঝাড় থেকে দু' আঙুল সমান মোটা একটা ডাল কেটে এনে ছুরি দিয়ে ছাল ছাড়াতে লাগল। তারপর ওটার একমাথা কেটে চোখা করে চল্লিশ পা দূরের এক ওক গাছের গোড়ার কাছে মাটিতে গেড়ে রেখে এল।

'এইভাবে প্র্যাকটিস করি আমরা,' বলল ও। 'তিনটা তীর ছোড়া যাবে। যদি সত্যিকারের তীরন্দাজ হন, ওই ডালে লাগিয়ে দেখান।'

'বাপরে !' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল আগন্তুক। এর মধ্যেও সচেতনভাবেই চেহারা যথাসম্ভব আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট। 'ওই টার্গেটে ! ওটায় তো খোদ শয়তানও লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না ! তবু, দেখি ... !

ধনুকে ছিলা পরাল সে। দুটো তীর ছুড়ল ডালটা সই করে। একটাও লাগাতে পারল না। কিন্তু তৃতীয় তীরটা ছুড়ল না। ওটা রবিনের বুকে তাক করে ধরে বলল, 'এটাই শেষ রাউন্ড, রবিনহুড !'

অচেনা লোকটার মুখে হঠাৎ নিজের নাম শুনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ও। হা করে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এখন আর নিজেকে আড়াল করার কোন চেষ্টা নেই তার মধ্যে। কথায় সেই টানও নেই।

স্যার গাই অভ গিসবোর্ন !

নরক থেকে নেমে আসা সাক্ষাৎ শয়তান যেন একটা। শকুনের মত বাঁকা, লম্বা নাকওয়ালা ভয়ঙ্কর চেহারা। যে চেহারা একবার দেখলে জীবনে ভোলা যায় না। সরু, চাপা ঠোঁট। চোখের দিকে তাকালে গায়ের মধ্যে শিরশির করে। ব্যাটা যে ভীষণ বদ, নিচ এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের, তা তার চেহারার দিকে এক পলক তাকালেই যে কেউ বুঝবে।

ছুরিটা জায়গায় রাখতে যাচ্ছিল রবিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না করে দেহের পাশে আড়াল করে রাখল ওটাকে। অন্য কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত হলো।

'তুমি !'

'হ্যাঁ, আমি !' বলে ছিলা টানতে শুরু করল গাই অভ গিসবোর্ন। 'মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও, আউটল রবিনহুড !'

'কোন নাইট এতবড় কাপুরুষ হতে পারে !' ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে বলল ও। 'ভাবতেও আমার লজ্জা লাগছে। আমার মুখোমুখি হওয়ার সাহস নেই তোমার ? থাকলে এসো, তলোয়ার বের করো খাপ থেকে। একজন নিরস্ত্র লোকের দিকে তীর ছোঁড়ার চেয়ে বড় লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। ভাল পরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও তোমার মানসিকতা এত অসম্মানজনক পর্যায়ে নেমে এল কেন ?'

দ্বিধায় পড়ে গেল স্যার গাই। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। 'লকসলির রবার্ট যখন শেরউডের ডাকাত রবিনহুড হয়ে যায়, তখন মানুষের চোখে বা আইনের চোখে তার সম্মান বলে কিছু থাকে না। তাকে পাকড়াও করতে এসে আমাকেও মান-সম্মানের কথা ভাবলে চলবে না। এখানে কৌশলই মুখ্য। আমি এখন শিঙায় ফুঁ দেব। নটিংহ্যামের শেরিফ আমাদের ধারেকাছেই কোথাও আছে। তার লোকেরা এতক্ষণে হয়তো তোমার চ্যালাদের কচুকাটা করে সংখ্যাটা অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। আমার সঙ্কেত শুনলে সে বুঝবে রবিনহুডও খতম। কিন্তু তুমি যদি আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আরও কয়েকদিন সূর্যের মুখটা অন্তত দেখতে পাবে। ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত।'

'আমার মনে হয় সে ক্ষেত্রে এখানে বসে তীর খেয়ে মরাই ভাল হবে,' রবিন বলল। ছুরি আড়াল করার জন্য লোকটার দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল ও, হঠাৎ সোজা হয়ে সেটা তার মুখ সই করে ছুড়ে দিয়েই মাটিতে ঝাঁপ দিল। স্যার গাইও একই মুহূর্তে তীর ছুড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়ায় রবিনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা–পরমুহূর্তে মুখ বাঁচাতে হাত তুলতে হলো স্যার গাইকে। ছুরিটা এসে তার ধনুকের ওপর পড়ল। ওটার গায়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে ছিটকে যাওয়ার সময় গাল কেটে দিয়ে গেল লোকটার।

পরক্ষণে এক লাফে উঠে দাঁড়াল রবিন। ওদিকে স্যার গাইও সামলে নিয়েছে। অকেজো হয়ে যাওয়া ধনুক ফেলে তরবারি টেনে বের করল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে ! এটাই শেষ রাউন্ড।'

পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দু' জনে। শুরু হয়ে গেল লড়াই। ইস্পাতের সাথে ইস্পাতের ক্ষুরধার ফলার ঘন ঘন সংঘর্ষের শব্দে কেঁপে উঠল শেরউড। প্রতিপক্ষের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই থামবে না, দু'জনেই জানে সে কথা। তাই বিপুল বিক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করল। অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না যুদ্ধ। প্রথম সুযোগেই পাশ থেকে স্যার গাইয়ের পাঁজর লক্ষ্য করে তলোয়ার চালাল রবিন। পরমুহূর্তে ধাতব শব্দ উঠতে চেঁচিয়ে উঠল, 'চেইন আর্মার !'

প্রতিপক্ষের পাল্টা মার ব্যর্থ করে দিতে পিছনে সরে আসতে গিয়েছিল রবিন, কিন্তু জেগে থাকা একটা মোটা শিকড়ে পা বেঁধে যাওয়ায় ধুম্ করে চিত হয়ে পড়ে গেল। তলোয়ার যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী পড়ে যাওয়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা অনুচিত। কিন্তু স্যার গাই সে সবের ধার ধারল না। সুযোগ পেয়েই ওর বুক সই করে তলোয়ার চালাল।

সামনে থেকে সরে গিয়ে আঘাতটা ব্যর্থ করে দিল রবিন। ফলে একই শিকড়ে গেঁথে গেল স্যার গাইয়ের তলোয়ার। ওটা বের করার জন্য টানা হ্যাঁচড়া করতে লাগল সে, তখনই পাশ থেকে তার অরক্ষিত কপালে গায়ের জোরে কোপ মারল ও। মরণ যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল স্যার গাই, পরমুহূর্তে দড়াম করে আছড়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

ধীরেসুস্থে তলোয়ারের গা থেকে রক্ত মুছল রবিন, তারপর খাপে রেখে মৃত নাইটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। অনেকদিন পর আজ আবার মানুষ খুন করল ও। বনরক্ষীদের সেই নেতাকে জীবনে প্রথম খুন করেছিল, আজ আবার একে। প্রথমদিন বনরক্ষীর পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে খারাপ লেগেছিল।

কিন্তু আজ একটুও খারাপ লাগছে না। পিশাচটার রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে ভাবল রবিন। বরং মনে হলো, জঘন্য এক পিশাচের হাতে থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচিয়েছে। ফসল বিনষ্টকারী বুনো শুয়োর মারতে পারলে যেমন আনন্দ লাগে, আজও তেমনি লাগছে।

শেরিফের কথা ভাবল রবিন। স্যার গাইয়ের কথা শুনে মনে হলো তার এখনও যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি। এখনও ওর পিছু ছাড়েনি ব্যাটা। পিছু লেগেই আছে। নাহ্, এবার তার একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে আর চলছে না !

ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করল ও। স্যার গাইয়ের হুডটা পরে নিয়ে তার শিঙাটা বের করে জোরে ফুঁ দিল। জবাবটা প্রায় সাথে সাথেই এল, এবং কাছেপিঠের কোথাও থেকেই। অনুমানে সেদিকে পা চালাল রবিন।

শেরউডের দক্ষিণ প্রান্তে কিংস হেড নামে বিখ্যাত এক সরাইখানা আছে। আজ সেখানে মহা কর্মব্যস্ততা চলছে। স্যার গাই অভ গিসবোর্নের অপেক্ষায় এক কুড়ি ফরেস্টার নিয়ে সেখানে বসে আছে শেরিফ। তার সম্মানে ভাল ভাল রান্না চড়ানো হয়েছে আজ। সেলার থেকে সেরা মদ বের করা হয়েছে।

ওদিকে বাইরে লিটল জনসহ রবিনের দলের আরও তিনজন বন্দিকে একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে তাদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে শেরিফ। ফরেস্টারদেরকে বাধা দিতে গিয়ে জন এমন ধোলাই খেয়েছে, এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। এইসব কারণে মনটা আজ খুব ভাল তার। বিশেষ করে লিটল জনের মত এক ভয়ঙ্কর ডাকাতকে ধরতে পারায় আনন্দ আর ধরে না তার। সন্দেহ নেই, এবার যুবরাজের কাছে তার ইজ্জত অনেক বেড়ে যাবে। সেই খুশিতে দেদারসে ওয়াইন গিলছে।

রবিনহুডের পালের এক মহা ধুরন্ধর উইল স্কারলেট বা উইল স্ক্যাথলককেও আজই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া গেছে। তারপর লিটল জন। এখন রবিনহুডকে ... ওয়াইনে চুমুক দিয়ে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে লাগল শেরিফ।

বাইরে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল লিটল জনের। চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল সে। নিজেকে কিং'স হেডের সামনে বসা দেখে সচকিত হলো। তার তিনজন সঙ্গীও আছে সাথে। লাইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

আরেক ফ্ল্যাগন মদের অর্ডার দিয়ে লিটল জনের কথা ভাবল শেরিফ। উফ্, ভারি জ্বালাতন করেছে ব্যাটা। কাল নটিংহ্যামের গেটের সামনের কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে একে, তারপর শান্তি। রবিনহুডের ডান হাত এভাবে ভেঙে দিতে হবে। তারপর যদি ...

এমন সময় শিঙার ফুঁ শুনে খুশির চোটে টুল থেকে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো তার। লাফাতে লাফাতে বাইরে চলে এল। 'শিঙা বাজল না ? স্যার গাইয়ের শিঙা ! তার মানে সে রবিনহুডকে খতম করতে পেরেছে ! উফ্ !' দু'হাত শূন্যে ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করল সে। 'এত আনন্দ আর কখনও পাইনি আমি।' বলতে বলতে নিজের শিঙা বের করে সঙ্কেতের জবাব দিল সে।

একটু পর রবিনকে গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে আনন্দে দম আটকে যাওয়ার দশা হলো। হই-হই করে উঠল। 'ওই যে আসছে স্যার গাই !' বিড়বিড় করতে লাগল সে। 'আমি জানি। আমি জানি আজ ঘোড়ার চামড়ার জারকিন পরে আছে সে। তার নিচে পরেছে চেইন মেইল।'

ওদিকে খোলা জায়গায় পা রাখতেই মনটা দমে গেল রবিনের। দেখল লিটল জনসহ দলের তার আরও তিন সদস্যকে সরাইখানার সামনের একটা গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ! ওরা কখন ধরা পড়ল, বুঝে উঠতে পারল না রবিন। কী ভাবে ধরা পড়ল ? এতজন ধরা পড়ল, অথচ কেউ শিঙা বাজায়নি কেন ?

রবিন কাছে চলে আসতে ব্যস্ত পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল শেরিফ। 'আসুন, স্যার গাই। আসুন। রবিনহুডকে হত্যা করতে পেরেছেন জেনে আজ আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আজ আমার কাছে যা খুশি পুরস্কার চাইতে পারেন আপনি। আমি আমার ...'

লিটল জন হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মত হাউমাউ করে কেঁদে উঠতে থেমে গেল সে। 'ওরে নিচ, ওরে শয়তান, কাকে খুন করেছিস তুই !' রবিনকে উদ্দেশ করে বিলাপ করতে লাগল লিটল জন। 'এত মহান হৃদয়ের মানুষ ছিল রবিনহুড। আজ তোর মত এক পিশাচের হাতে তার মৃত্যু হলো ! হায়, ঈশ্বর ! আমার আর বেঁচে থাকার সাধ নেই। এই নিষ্ঠুর দুনিয়া থেকে তুমি আমাকে তুলে নাও !'

'ওরা কারা ? ওই লম্বাটা রবিনের দলের লিটল জন না ?' রবিন বলল।

মাথা দোলাল শেরিফ। 'হ্যাঁ। লিটল জন। আজ ধরেছি ব্যাটাদেরকে। ওদের কথা বাদ দিন। বলুন, রবিনহুডকে হত্যা করার পুরস্কার হিসেবে আপনি কি চান ?'

'কিছু না,' চেহারা যথাসম্ভব আড়াল করে স্যার গাইয়ের গলা নকল করে বলল ও। 'কারণ আজ আমি যাকে হত্যা করেছি, তাকে সব সময় ঘৃণা করেছি। তাকে হত্যা করতে পারাই আমার জন্যে বড় পুরস্কার। তবে আপনি নিজে থেকে যখন কিছু দিতে চাইছেন, তখন একটা জিনিস চাইব ভাবছি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ! বলুন। বলুন, কি চাই আপনার ?'

'মনিবটাকে যখন শেষ করলাম, তখন তার চ্যালাদেরকেও দিয়ে দিন,' ইঙ্গিতে লিটল জনকে দেখাল ও। 'শেষ করে ফেলি !'

মুখের হাসি শুকিয়ে গেল শেরিফের। 'ওদেরকে ? বলেন কি ! টাকাকড়ি-সোনাদানা, কতকিছুই তো চাইতে পারতেন। তা আপনি যখন চাইছেন, প্রতিজ্ঞা তো রাখতেই হয়। ঠিক আছে, নিয়ে যান। ওরা সবাই এখন আপনার।'

ছুরিটা বের করে পায়ে পায়ে লিটল জনের দিকে এগিয়ে গেল রবিনহুড। পাশে বসে ওর হাতের বাঁধন কাটতে কাটতে চাপা গলায় বলল, 'আমি রবিন, লিটল জন ! বাঁধন কাটা হয়ে গেলেই উঠো না, আমি না ডাকা পর্যন্ত বসে থেকো। আমার তীর-ধনুক তোমার হাতের কাছে রেখে যাব। তারপর শেরিফের স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে !'

লিটল জনকে মুক্ত করে দ্রুত তার পাশেরজনের বাঁধনও কেটে দিল রবিন। তারপর বাকি দু'জনেরও। স্যার গাই কি করছে, শেরিফের তা বুঝতে একটু সময় লাগল। সাথে সাথে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল সে।

চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, স্যার গাই ! আমি শুধু একজনকে নেয়ার কথা বলেছি। সবাইকে না !'

'কিন্তু আমি ওদেরকে ছাড়া ফিরে যাই কি করে, বলুন ?' একটানে স্যার গাইয়ের হুডটা খুলে ছুড়ে ফেলে দিল রবিন। হাতের কাছে দাঁড়ানো বনরক্ষীর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ছুরিটা তার হৃৎপিণ্ড বরাবর ঢুকিয়ে দিল, তারপর লাশ ছেড়ে দিয়ে তার তীর-ধনুক ও তরবারি দখল করে নিল। 'লিটল জন, রেডি !'

লিটল জন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। রবিনের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দৌড়ে চলে এল ওর পাশে। ছিলায় ধনুক পরিয়ে রেডি।

'রবিনহুড, রবিনহুড !' চিৎকার করতে লাগল শেরিফ। 'ধরো ওকে ! শেষ করে ... !' আচমকা টান দিয়ে মুখ সরিয়ে নিল সে একদিকে। প্রায় একই মুহূর্তে কান ঘেঁষে বোঁ-ও-ও ! শব্দ তুলে ছুটে গেল জনের ছোঁড়া তীর। তার পিছনেরজনের গলার সামনে দিয়ে ঢুকে পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। ধড়াশ করে আছড়ে পড়ল লোকটা।

তারপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একের পর এক তীর ছুড়তে শুরু করল ওরা, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বিপক্ষ দলে লোকসংখ্যা এত বেশি যে সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। তীর-ধনুক ফেলে তরবারি নিয়ে আত্মরক্ষার লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হলো তারা। অন্যদিকে আর যে লোকগুলোকে মুক্ত করা হয়েছিল, তারা তীরের আঘাতে মৃত রক্ষীদের অস্ত্র নিয়ে লড়াইতে অংশ নিল।

ওর মধ্যেও বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল রবিন, শিঙাটা বের করে গলার সমস্ত শক্তি এক করে ফুঁ দিল একবার।

বীরের মতই লড়াই করছিল ওরা, কিন্তু তারপরও বিপক্ষ দলের সংখ্যার কাছে প্রায় হেরেই যেত, যদি না সেখানে আচমকা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটত। বিশাল একটা কালো ঘোড়ায় চড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো আর্মার মোড়া এক দীর্ঘদেহী নাইট কোত্থেকে এসে হাজির সেখানে। মুখের ভাইজর তোলা ছিল তার, কিন্তু সামনের যুদ্ধ চোখে পড়তেই দ্রুত সেটা নামিয়ে দিল সে। লড়াইরত দু'পক্ষের কাছে চলে এল।

একটু পর কি দেখে স্যাডল-বোর সাথে ঝোলানো বিশাল এক কুড়াল এক টানে মুক্ত করল নাইট। ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে শেরিফের বাহিনীর মধ্যে এসে মোটা গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'কি ! মাত্র চারজনের বিরুদ্ধে এতজন ? পিছিয়ে যাও, নেকড়ের দল ! ভাগো এখান থেকে !' কুড়াল মাথার ওপর তুলে তেড়ে গেল সে।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল শেরিফের লোকেরা। বেশিরভাগই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে শুরু করল। শেরিফ স্বয়ং থাকল তাদের আগে আগে। ঘোড়ায় উঠে বন-বাদাড় ভেঙে তুমুল বেগে ছুটল সে। প্রায় চলেই গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু ঝামেলা হয়ে গেল।

গাছের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগমুহূর্তে লিটল জনের ছোড়া একটা তীর উড়ে গিয়ে শেরিফের নিতম্বে গেঁথে গেল। আর্ত স্বরে কাতরে উঠল সে। তার পিছন পিছন আরও কয়েকজন রক্ষী পালিয়ে যাচ্ছে দেখে হুঙ্কার ছেড়ে উঠল নাইট। 'দাঁড়া, হারামজাদার দল ! আজ তোদের একদিন কি আমারই একদিন।' ঝড়ের গতিতে দলটাকে তাড়া করল নাইট। হারিয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

এদিকে শিঙায় ফুঁ দেয়ার ফল ফলতে শুরু করল। রবিনের দলের সদস্যরা নেতার সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে ছুটে এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে।

ফাঁদে পড়ে যাওয়া শেরিফের লোকেরা বেগতিক দেখে হয় আত্মসমর্পণ করল, নয়তো জানপ্রাণ নিয়ে ভাগল সেখান থেকে।

একটু ফুরসত পেয়ে লিটল জনের দিকে ফিরল রবিনহুড। কি মনে হতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, 'উইল স্কারলেট কোথায় ?'

বিষাদে কালো হয়ে উঠল দানবাকৃতির লোকটার চেহারা। মাথা নাড়ল। 'আমি রক্ষা করতে পারিনি ওকে। তবে ট্রেন্ট জ্যান্ত ফিরতে পারেনি।'

রবিনের ভুরু ভীষণভাবে কুঁচকে উঠল। থমথমে গলায় প্রশ্ন করল, 'উইলিয়াম ট্রেন্ট ? বনরক্ষীদের প্রধান ?'

'হ্যাঁ।'

'উইল স্কারলেট মারা গেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আজ কোন বনরক্ষীকে জীবন নিয়ে ফিরতে দেব না !' নিজের ধনুক ও তীরগুলো নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। 'শেরিফের লোকেরা সবাই গরিব ভূমিদাস। শেরিফের চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছে তার দলে যোগ দিতে। তাদের কোন ক্ষতি কোরো না। হাত পিছনে বেঁধে গলায় হল্টার ঝুলিয়ে খালি পায়ে ছেড়ে দাও, হেঁটে টাউনে ফিরে যাক। তুমি এদিক সামাল দাও, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছ ?' উদ্বিগ্ন মনে হলো লিটল জনকে।

'বনরক্ষীদের সাথে বোঝাপড়া সেরে আসছি।'

ছুটে চলে গেল রবিন। বনের ভেতরকার সমস্ত পথ, প্রতিটা শর্ট-কাট ওর নখ-দর্পণে, কাজেই খুব দ্রুত একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে গেল ও। একটা বড়সড় টিলার ওপরে উঠে পড়ল। একশো ফুটের মত উঁচু সেটা, ঢালু হয়ে নটিংহ্যামের দিকে চলে গেছে সেটা। টিলার ঠিক নিচেই রাস্তা। নটিংহ্যাম পর্যন্ত একেবারে উন্মুক্ত। গা ঢাকা দেয়ার কোন জায়গা নেই। শেরিফের লোকেরা জানপ্রাণ বাজি রেখে ছুটছে দেখা গেল।

তাদেরকে কিছুই বলল না রবিন, কিন্তু কেনডাল গ্রিন পরা ফরেস্ট রেঞ্জার বাহিনীর সদস্যরা দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসতে মাথা গুনে দেখল। পনেরোজন।

টিলার চূড়া থেকে তাদেরকে চেঁচিয়ে ডাকল ও, 'শেরউডের রেঞ্জাররা ! আজ তোমরা আমার পুরনো বন্ধু উইল স্কারলেটকে হত্যা করেছ। এখন নিজেদের জান বাঁচাতে পালাও। টাউনের গেট মাত্র এক মাইল দূরে। যে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে, সে বেঁচে যাবে। কিন্তু তোমরা রাস্তায় থাকা অবধি আমার তীর ছুড়তে বাধা নেই। আমি তীর ছুড়ব। তোমরা পালাও। মনে রেখো, রবিনহুডের তীর কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না !'

রেঞ্জারদের অন্তরাত্মা উড়ে গেল। কেন না তারাও খুব ভাল করে জানে রবিনের তীর কখনও ফসকায় না। তার ওপর রাস্তায় গা ঢাকা দেয়ার কোন জায়গাও নেই। ঘুরে পাগলের মত তীর ছুড়তে লাগল তারা। কিন্তু ভয়ে সবাই

এমন কাঁপাই কাঁপছে যে একটা তীরও রবিনের ধারে কাছে পৌঁছল না। শেষ পর্যন্ত সব ফেলে প্রাণটা মুঠোয় নিয়ে পড়িমরি ছুটল লোকগুলো।

তূণ থেকে পনেরোটা তীর বের করল রবিনহুড, পাশাপাশি সাজিয়ে রাখল। বন্ধুর মৃত্যুতে এতই শোকাহত, কোনদিক খেয়ালই নেই। সবচেয়ে পিছনের রক্ষীকে লক্ষ্য করে প্রথম তীরটা ছুড়ল ও। লোকটা ততক্ষণে কায়েকশো গজ এগিয়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে আচমকা লাফিয়ে উঠেই মুখ থুবড়ে পড়ল সে। 'এক !' চেঁচিয়ে জানান দিল ও। তার আগেরজনও মুহূর্তে খতম। 'দুই !'

এভাবে একটার পর একটা তীর ছুড়ে যেতে লাগল রবিন।

ওদিকে রক্ষীরাও অমোঘ নিয়তির মত একজন একজন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগল। সবশেষের রক্ষী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে নটিংহ্যামে পৌঁছে গিয়েছিল। রবিন এবং তার মধ্যের দূরত্ব তখন প্রায় এক মাইলে দাঁড়িয়েছে–মাত্র শ' খানেক গজ সামনে নগর দুর্গের প্রধান ফটক তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, এমন সময় শেষ তীরটা বোলতার মত মৃদু গুঞ্জন তুলে আকাশ থেকে নেমে এল, লোকটার ঘাড়ে ঢুকে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

ইতিহাসে সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রমকারী লং বো।

তাই দেখে সমগ্র নটিংহ্যাম থ হয়ে গেল। পরে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন কাঁপতে কাঁপতে এসে মৃতদেহগুলো তুলে নিয়ে যায়। নটিংহ্যামের ফক্স লেনের সেইন্ট মাইকেল'স গির্জা প্রাঙ্গণে কবর দেয়া হয় তাদেরকে।

আজ থেকে দুশো বছর আগে, নটিংহ্যামে খোঁড়াখুঁড়ির সময় প্রত্নতত্ত্ববিদরা তাদের মধ্যে ছয়জনের লাশ খুঁজে পেয়েছিলেন–পাশাপাশি শুয়ে আছে।

তীরন্দাজ রবিনহুডের বিস্ময়কর কীর্তির সাক্ষি হিসেবে।

রবিনহুড ও লম্বা তীর্থযাত্রী

চারদিকে গুজব শোনা যেতে লাগল রাজা রিচার্ড দেশে ফিরে আসছেন। যে কোনদিন এসে পড়বেন। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবরাজ জন প্রচণ্ড হতাশ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এই খবরে। বিশ্বস্ত বন্ধু ও সকল কুকর্মের সঙ্গী নটিংহ্যামের শেরিফের সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেন।

তাঁর ভক্তদের অনেকেই সেখানে তাঁর সাথে দেখা করতে গেল। তাদের মধ্যে হেরিফোর্ডের চর্বি থলথলে, মোটা বিশপও একজন। তাকে বেশ জাঁকজমকের সাথে অভ্যর্থনা জানালেন যুবরাজ জন। আলাপ-আলোচনার পর প্রচুর নগদ টাকা দিয়ে আবার হেরিফোর্ডে চলে যেতে বললেন, যাতে সেখানে গিয়ে সে রাজা রিচার্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারে।

'প্রভু,' অনুনয়ের সুরে বলল বিশপ। 'আমার সাথে লোকজন খুব অল্প আছে। আর শেরউডের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তা গেছে, আপনি তো জানেন আউটলদের জ্বালায়, বিশেষ করে রবিনহুডের কারণে সে পথ দিয়ে চলাফেরা করার কোন উপায় নেই। আপনি বোধহয় জানেন না, প্রভু, ডাকাতটাকে নিয়ে গানও গাওয়া হয় ওই অঞ্চলে। কাজেই নিরাপত্তার জন্যে আমার সাথে সশস্ত্র সৈন্য না দিলে আমি বিপদে পড়ে যাব।'

'পড়বেন না,' জন বললেন চিন্তিত মনে। 'আমি জানি রবিনহুড লোকটার খুব বাড় বেড়েছে। কিন্তু আমার মতে বেশি লোক নিয়ে গেলেই বরং বিপদ ঘটার আশঙ্কা বেশি থাকবে। অল্প লোক নিয়ে গেলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলা যাবে, আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকবে কম। তারপরও যদি তার সামনে পড়েই যান, বলবেন, রাজা রিচার্ডের পক্ষে কাজ করার জন্যে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন আপনি। তাহলে লোকটা বাধা তো দেবেই না, বরং হয়তো অঙ্কটা দ্বিগুণ করে দিয়ে নিজের পথে পাঠিয়ে দেবে আপনাকে। আপনি জানেন না, রবিনহুড এখন আমার বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।'

এরপর আর 'না' চলে না। নগদ টাকাকড়ি ও এক ডজনেরও কম সঙ্গী নিয়ে ভয়ে ভয়ে নটিংহ্যাম-হেরিফোর্ডশায়ার রাজপথ ধরে যাত্রা করল বিশপ। দলটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ামাত্র জন তাঁর ঘোড়া প্রস্তুত করতে বললেন। তারপর

একদল একান্ত বিশ্বস্ত অনুসারীকে সাথে নিয়ে আরেকটা গোপন পথ দিয়ে নিজেও শেরউডের দিকে যাত্রা করলেন।

এক বনরক্ষী দলটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

***

নটিংহ্যাম শহর এবং নিকটবর্তী শেরউড জঙ্গলের মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। সেখানে এক লম্বা তীর্থযাত্রীকে দেখা গেল, ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। একেবারে মূর্তির মত বসে আছে, নড়াচড়া নেই। শহরে কারা আসা-যাওয়া করছে তার ওপর নজর রাখছে। তীর্থযাত্রীর রোবের নিচে সরু শেকলের তৈরি শার্ট ও লেগিং পরে আছে সে। মাথায় হুডের নিচে পরে আছে ইস্পাতের স্কাল ক্যাপ। কোমরের খাপে ঝুলছে প্রকাণ্ড এক তরবারি।

এক লোককে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে তীর্থযাত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, কিছু বলতে লাগল। তার প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনল ঘোড়সওয়ার, চেহারা ক্রমে অন্ধকার হয়ে উঠল। বার্তাবাহককে সে-ও কিছু বলল, ঘুরে আবার ছুটল সে আগের পথে।

একটু পরই হেরিফোর্ডের বিশপ তার খুদে অশ্বারোহী দলসহ চড়াই পেরিয়ে সেখানে এসে পৌঁছল। ঘোড়াগুলো সশব্দে হাঁপাচ্ছে। দলটার দিকে এগিয়ে গেল তীর্থযাত্রী। 'মাই লর্ড,' বিশপের উদ্দেশে সসম্মানে বলল, 'আমি আপনার দলের সাথে এই বন পার হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছি। আমি এদিকে নতুন। শুনেছি, এদিকে নাকি রবিনহুড নামে ভয়ঙ্কর এক আউটল থাকে। তাই ভাবছি, আপনার মত একজন ধার্মিক লোকের সাথে থাকতে পারলে আমি নিরাপদে পথ চলতে পারব।'

'আপনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন, জনাব,' বিশপ বলল। 'তবে পথে যদি রবিনহুড আক্রমণ করেই বসে, তাহলে আমার লোকেরা আপনার কোন সাহায্যে আসবে বলে মনে হয় না।'

পাতার ছাউনি দিয়ে ঢাকা রাজপথ দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ছোট অশ্বারোহী দলটা। দুপুরের দিকে একটা প্রায় ফাঁকা চড়াইয়ে পৌঁছে থামল। গাঢ় সবুজ রঙের চাদর বিছানো বিশাল একটা বিছানার মত জায়গাটা। অল্প কয়েকটা গাছ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে তার মধ্যে। একটা গাছের নিচে মেষপালকদের মত কোট পরা ছয়জন লোককে দেখা গেল, সদ্য শিকার করা একটা নাদুস-নুদুস হরিণের ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত।

দল ছেড়ে দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে সেদিকে এগিয়ে গেল বিশপ। 'এখানে কি করছ তোমরা ?' গমগম করে উঠল তার গলা। 'জঙ্গলের আইন অমান্য করে রাজার হরিণ মেরেছ ? তোমাদের সাহস তো কম না !'

'আমরা মেষপালক,' দলটার নেতা বলল বিনয়ের সাথে। 'মেষ চরাই। আজকের ডিনারটা একটু ভালভাবে করব বলে এই হরিণটা শিকার করেছিলাম। একটু স্বাদ বদলের জন্যে।'

'বেয়াদবের দল !' রেগে উঠল বিশপ। 'এই অপরাধে রাজার আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে তোমাদের, তা জানো ! চলো আমার সাথে। তোমাদেরকে প্রিন্স জনের কাছে নিয়ে যাব আমি। কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে প্রিন্স সাধারণত তার ফাঁসির আদেশ দেন।'

'ক্ষমা করুন !' চেঁচিয়ে উঠল নেতা লোকটা। জোড়হাতে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁপতে লাগল। 'ক্ষমা করে দিন আমাদের !'

'ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই !' তার কণ্ঠস্বর নকল করে ভেঙচে উঠল চর্বির ডিপো বিশপ। ঝাঁকিতে সারাদেহের চর্বি থলথল করে উঠল। 'তোমাদের মত শয়তানদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই। তাড়াতাড়ি চলো। প্রিন্স মনে হয় আজ ফাঁসিতেই চড়াবেন তোমাদেরকে।'

হঠাৎ কোটের নিচে হাত ভরে দিল মেষপালক দলের নেতা, একটা শিঙা বের করে পরপর তিনটা ফুঁ দিল তাতে।

থতমত খেয়ে গেল বিশপ। বেকুবের মত হা করে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। ওদিকে শিঙার ফুঁ শুনে পুরো শেরউড নড়ে উঠল যেন–লিঙ্কন গ্রিন ইউনিফর্ম পরা পেশিবহুল, দীর্ঘদেহী কয়েক কুড়ি তীরন্দাজ বন থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। তাদের সবচেয়ে লম্বা লোকটা এগিয়ে এসে মেষপালক দলের নেতাকে সম্মান দেখানোর জন্য কিছুটা ঝুঁকল।

'বলো, ওস্তাদ। কি হুকুম তোমার ?'

'ইনি হচ্ছেন আমাদের হেরিফোর্ডের বিশপ, লিটল জন,' হাসিমুখে বলল রবিনহুড। 'ইনি আজকে আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাবেন ঠিক করেছেন। কোন ক্ষমা-টমা নেই।'

'কল্লাটা আলাদা করে ফেলি, ওস্তাদ ?' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল লিটল জন। 'তারপর ওই গাছটার নিচে কবর দিয়ে দিই।'

'ক্ষমা করো আমাকে ! ক্ষমা করো !' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল বিশপ। ঘোড়া থেকে নেমে রবিনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। 'যদি জানতাম তুমি রবিনহুড, তাহলে আমি এদিকে আসতামই না। অন্য পথে চলে যেতাম !'

'ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই !' তার গলা নকল করে ভেঙচাল রবিনহুড। 'এখন আমাদের সাথে গরিবখানায় যেতে। লিটল জন, এদের সবার চোখ বেঁধে ফেলো। তারপর হরিণটা নিয়ে চলো ফিরে যাই।'

লম্বা তীর্থযাত্রী এতক্ষণ তফাতে দাঁড়িয়ে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিল। এইবার কথা বলে উঠল। 'রবিনহুড, আমি এদের দলের সদস্য নই। তবে এদের সাথে আসছিলাম নটিংহ্যাম থেকে। কিন্তু একজন বিশপ চোখের সামনে মরে যাবে আর আমি তা বসে বসে দেখব, তা তো হতে পারে না। আমি রাজা রিচার্ডের সাথে পবিত্র ভূমিতে যুদ্ধ করেছি। আমি জাতযোদ্ধা। কাজেই বসে বসে সে দৃশ্য আমি দেখতে পারি না।'

'জনাব তীর্থযাত্রী,' বিনয়ের সাথে বলল রবিন, 'আপনার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই। আগে আমাদের সাথে চলুন, আমাদের আতিথেয়তার স্বাদ নিন, তারপর সেসব নিয়ে কথা হবে। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ন্যায়বিচার ছাড়া অন্যায় কিছু করব না। আর সবার মত আপনার চোখ বাঁধা হবে না। কিন্তু আগে আপনি পুণ্যসমাধির কসম করে বলুন, আমাদের ডেরায় পৌঁছার গোপন পথের কথা আপনি ফাঁস করে দেবেন না।'

'আমি কসম করছি,' ধ্যানগম্ভীর চেহারায় বলল তীর্থযাত্রী। 'ফাঁস করব না।'

একটু পর বিশপকে নিজেদের মাঝখানে রেখে নিজেদের ডেরার দিকে যাত্রা করল রবিন ও লিটল জন।

***

ওদিকে মেরিয়ান ও জর্জ-এ-গ্রিনের বউ বেট্রিস বনের ভেতরের সেই গ্লেডে বসে গল্প করছে আর তীরের গোড়ায় হাঁসের পালক জুড়ছে। দুপুর হয়ে এসেছে প্রায়।

'রবিন হেরিফোর্ডের বিশপকে ধরতে গেছে,' কথায় কথায় বলল মেরিয়ান। 'ও জানতে পেরেছে, বিশপ আজ শেরউডের মধ্যে দিয়ে যাবেন। কাজেই দুপুরে কিছু অতিথি আশা করা যায়।'

'আশা করি ভাল দাম পাওয়া যাবে তাদের কাছ থেকে,' বলে হাসল বেট্রিস। 'আমি ...' হঠাৎ থেমে গেল। স্থির দৃষ্টিতে সামনের একটা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'কি হলো, বেট্রিস ?'

'আমি ... মনে হলো, ওই ফার্ন গাছগুলোর আড়ালে এইমাত্র একটা মুখ দেখতে পেয়েছি,' বলল সে। 'হ্যাঁ, ওই তো ফার্ন নড়ছে !'

বেট্রিসের কথা শেষ হওয়ার আগেই যুবরাজ জনকে দেখা গেল–ফার্নের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছেন। কয়েকজন সশস্ত্র বনরক্ষী রয়েছে তাঁর সাথে। মেরিয়ানকে দেখে হাসলেন যুবরাজ।

'বাঘিনী তাহলে এই গুহায় !' চেঁচিয়ে বললেন যুবরাজ। 'যাক্, এতদিন পর আবার তাহলে দেখা হলো আমাদের, মেরিয়ান ! এবার কিন্তু সহজে ছাড়া পাবে না। এসো। পালাবার বৃথা চেষ্টা করতে যেয়ো না, কেননা পথ নেই। আমাদের ঘোড়া ওই পাথরগুলোর আড়ালে রেখে এসেছি। আমার এক বনরক্ষী বন্ধুর পাহারায়। ওই বন্ধুটিই তোমার গুহায় পৌঁছতে সাহায্য করেছে আমাকে। যাকগে', চলো। রবিনহুড এখন আসবে না। ও এখন হেরিফোর্ডের বিশপকে নিয়ে অনেক ব্যস্ত আছে, আমি জানি। ওকে ব্যস্ত রাখার বন্দোবস্ত করেই তোমাকে নিতে এসেছি আমি। এসো।'

দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গেল মেরিয়ান। কোমরের বেল্ট থেকে টান মেরে একটা শিঙা বের করেই তাতে ফুঁ দিল। পরমুহূর্তে বেট্রিসের নিয়ে আসা তরবারি বের করে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল। 'পিছিয়ে যাও, জানোয়ার কোথাকার !'

ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ও। 'যুবরাজ হও আর যে-ই হও, মনে রেখো, হাতের এই জিনিসটা আমি যে কোন পুরুষের মতই চালাতে জানি।'

'জলদি করো !' চেঁচিয়ে উঠলেন যুবরাজ। 'জলদি একে নিয়ে পালাও। এতো ধীর গতির জন্যে গজব পড়ুক তোমাদের ওপর ! সময়মত ধরতে পারলে ও শিঙা বাজাতে পারত না ! এখন যত দেরি হবে, আমাদের বিপদ ততই বাড়বে।'

যুবরাজের দাঁত খিঁচুনি খেয়ে দুই রক্ষী এগিয়ে গিয়েছিল মেরিয়ানের দিকে। তাদের একজনকে চোখের পলকে অস্ত্র ফেলে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল ও, প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কবজি চেপে ধরে গোঙাতে লাগল সে। অন্যজন হা করে মেরিয়ানের বিদ্যুৎগতির তরবারি চালনার সামনে দাঁড়াতে না পেরে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে বেট্রিসও জর্জ-এ-গ্রিনের মুগুরের এক ঘা আরেকজনকে ফেলে দিল।

পরমুহূর্তে পাঁচজন রক্ষী একযোগে আক্রমণ করল মেরিয়ানকে। পূর্ণ বয়স্ক, পূর্ণ সক্ষম পাঁচজন পুরুষের বিরুদ্ধে একটি মেয়ের শক্তি বা কৌশলে এঁটে উঠতে পারার প্রশ্নই আসে না, সে মেয়ে যত ওস্তাদই হোক না কেন। কাজেই যা হওয়ার তাই হলো। একজনকে যদিও আরাত্মক আহত করল মেরিয়ান, আরেকজনকে তরবারি ফেলে দিতে বাধ্য করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যরা ধরে ফেলল ওকে।

'এইবার !' জয়ের আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে উঠলেন যুবরাজ। 'জলদি চলো এখান থেকে। নইলে হান্টিংডনের ছাড়া কুকুরটা যে কোন সময় তার কুত্তির জন্যে এসে হাজির হবে এখানে।'

নাগালের মধ্যে পেয়ে যুবরাজের গালে কষে এক চড় লাগিয়ে দিল মেরিয়ান। রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল তাঁর। পাল্টা চড় মারার জন্য হাত তুলেছিলেন তিনি, এমন সময় বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মাঝের ফাঁক দিয়ে একটা তীর সাঁ করে বেরিয়ে গেল–মুহূর্তে চামড়া কেটে হাড় বেরিয়ে পড়ল ও দু'টোর। রবিন যদি তখন প্রায় আধ মাইল দূরে দৌড়ের ওপর না থাকত, তাহলে সেদিন হাতটা খোয়াতে হত যুবরাজকে।

মুখ খিস্তি করে চর্কির মত ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। চোখে পড়ল খোলা জায়গার অর্ধেকটা এরমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে রবিন, হাতে তরবারি ঝিলিক মারছে। 'যুবরাজ ! মেয়েমানুষের সাথে লড়াই করে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ? এবার তাহলে আমার সাথে আসুন, এক হাত হয়ে যাক !'

বাকি চার রক্ষীর দিকে ফিরলেন জন। 'ধরো ওকে ! ওই লোক আউটল রবিনহুড। যে ওকে মারতে পারবে, তার জন্যে মোটা পুরস্কার আছে। যাও ! আমি মেয়েটাকে ছেড়ে যেতে পারব না। খুব বিপজ্জনক মেয়ে।'

'একেবারে যুবরাজের মত কথা !' টিটকারি মারল রবিন।

রক্ষীদের মোকাবেলা করতে একটা ওক গাছের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও। এসে পড়ল লোকগুলো এবং চোখের পলকে তাদের একজনকে ঠাণ্ডা করে

বাকি তিনজনের দিকে মন দিল রবিন। ও লড়াইয়ে ব্যস্ত দেখে মেরিয়ানকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিলেন জন, তরবারি বের করে পা টিপে টিপে ওর পিছনদিক থেকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ওর দিকে এত নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে ছিলেন যুবরাজ যে নিজের পিছনের কথা মনেই থাকল না।

কয়েকটা লিঙ্কন গ্রিন পরা কাঠামো দ্রুত আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ধরে ফেলল তাঁকে। তাই দেখে রক্ষীদের অন্তরাত্মা কেঁপে গেল। তৎক্ষণাত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করল তারা। কিন্তু কয়েক কদমের বেশি যেতে পারল না। তার আগেই বনের দিক থেকে উড়ে আসা একাধিক তীর খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

'যুবরাজকে মেরো না,' রবিন বলল। 'হাত-পা বেঁধে গুহার মধ্যে রেখে এসো।'

মেরিয়ানের দিকে পা বাড়িয়েছিল রবিন, কিন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ও। একটু ভয় পেয়েছে, কিন্তু অক্ষত। ওদিকে বেট্রিস গুহা থেকে অনেকগুলো তীর ও ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এল–কারও কাজে লাগল না যদিও। কিছুক্ষণ পর লম্বা তীর্থযাত্রী, বিশপ এবং তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে আসা হলো সেখানে।

'এখন আমাদের ডিনারের সময় হয়েছে,' রবিন বলল সবার উদ্দেশে। 'আসুন, সম্মানিত বিশপ। আমার টেবিলে এসে বসুন। জনাব তীর্থযাত্রী, আপনিও আসুন দয়া করে।'

'এখানে দেখছি রাজার হালে আছ তুমি, বন্ধু !' ঘুরে ঘুরে ডিনারের আয়োজন চাক্ষুষ করে রবিনহুডের উদ্দেশে হাসলেন তীর্থযাত্রী।

'কিন্তু পেট চালাতে আমাদেরকেও উপার্জন করতে হয়,' জবাব দিল ও।

'অথচ তারপরও রাজার হরিণ মেরে খাও।'

'ও, তাতে ...' থেমে কি বলবে, ভাল করে গুছিয়ে নিল রবিনহুড। 'তাতে কোন আইন ভঙ্গ করা হয় বলে আমি মানি না। কারণ আমরা আউটল, আইন ছাড়া মানুষ। তবে আমি এ-ও মনে করি না যে আমাদেরকে আইন অনুযায়ী আউটল ঘোষণা করা হয়েছে। এ কাজটা করেছে যুবরাজ জন এবং তাঁর বিশ্বস্ত মিত্র, নটিংহ্যামের শেরিফ। ভুলকে শুদ্ধ করার জন্যে জঙ্গলে থাকি আমরা। সৎ মানুষকে জেনেশুনে কখনও কষ্ট দিই না। শুধু যারা আইনকে নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করে, নিরীহ-নিরাপরাধ মানুষদের কষ্ট দেয়, নারীর অবমাননা করে, তাদেরকে শায়েস্তা করি। লোকে আমাকে গরিবের বন্ধু বলে ডাকে। কারণ আমি ধনীদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিই। ধনীদের বলতে সবার নয়, সত্যিকারের নাইট অথবা আমাদের প্রভুর জীবন বিধান মেনে চলা ধর্মযাজক, তাদের টাকা আমি ছুঁয়েও দেখি না। কোন কৃষকের ক্ষতি করি না, পশুর পাল চরিয়ে বেড়ানো কোন রাখালের ক্ষতি করি না। যারা সৎভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে, তাদেরও কোন ক্ষতি করি না। কিন্তু যারা শুধু নামেই ধর্মযাজক বা বিশপ, পার্থিব ফায়দা লুটে বেড়ায়, প্রতারণা করে, ডাকাতি করে, মিথ্যে কথা বলে,

তাদেরকে আমি ছেড়ে দিই না। তাদের রোজগারের কিছুটা কেড়ে রাখি। তার থেকে গরিবদের কিছু দিয়ে বাকিটা দিয়ে নিজেরা চলি।'

তীর্থযাত্রীর দিকে ফিরে হাসল রবিনহুড। 'ইচ্ছে হলে আপনি আমাদেরকে চোর বলতে পারেন, তবে সম্মানিত চোর বলবেন দয়া করে। থিভস্ অভ অনার। আমাদের খাবারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে আপনি নিজেকে অসম্মান করবেন না আশা করি। নাকি রাজার হরিণ খেতে আপনার আপত্তি আছে ?'

'আপত্তি !' গলা ছেড়ে হাসল মানুষটা। 'খিদেয় পেট এমনভাবে জ্বলছে, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র জেরুজালেম থেকে হেঁটে এলাম। এমন সময় এইসব সুস্বাদু খাবারে আপত্তি করবে কোন্ বোকা ?'

ডিনার শেষ করে বিশপের দিকে ফিরল রবিন। গম্ভীর চেহারায় বলল, 'মাই লর্ড, আপনি আজ আমাদের সাথে ডিনার করায় আমি খুব খুশি হয়েছি। এবার আসুন, রাজা রিচার্ডের সু-স্বাস্থ্য এবং দ্রুত প্রত্যাবর্তন কামনা করে পান করি আমরা। তারপর খাবারের দাম দিয়ে কেটে পড়ুন।'

'তাহলে তুমি খাবারের দাম রেখে দাও ?' লম্বা অতিথি প্রশ্ন করল। 'রাজার প্রত্যাবর্তন কামনায় পানও করে থাকো, একজন আউটল হওয়া সত্ত্বেও ?'

'রাজার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' প্রশ্নের শুধুমাত্র শেষ অংশের জবাব দিল রবিন। 'কারণ আমাদের খাওয়াটা তাঁর কল্যাণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া এমনিতেও আমরা তাঁকে কখনও ভুলি না। যখনই শেরউডে আউটলদের শিঙা বাজে, আমাদের মহামান্য রাজা, প্রভুকে উদ্দেশ করেই বাজে।'

উপস্থিত প্রত্যেকে উঠে দাঁড়াল, হাতের পানপাত্র তুলে ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'রাজা এবং তাঁর শুভ প্রত্যাবর্তন কামনায় !'

তাদের চিৎকারে কেঁপে উঠল শেরউড। 'এবার, মাই লর্ড,' বিশপের দিকে মন দিল রবিন। 'আপনার সাথে টাকা-পয়সা আছে নিশ্চয়ই ?'

মুখ শুকিয়ে গেল বিশপের। 'আছে ... অল্প কিছু,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বলল। 'কিন্তু ওই টাকা তো আমার না। রাজার স্বপক্ষে কাজে লাগানোর জন্যে বাহক হিসেবে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছিলাম আমি।'

'খুঁজে দেখো,' অনুচরদেরকে নির্দেশ দিল রবিন। 'প্রত্যেকের শরীর, ব্যাগ সব খুঁজে দেখো।' তীর্থযাত্রীর দিকে ফিরল এবার। নরম গলায় জানতে চাইল, 'আপনার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে ? শুনলেনই তো, আমরা যা পাই, তার বেশিরভাগই অভাবিদের পিছনে খরচ হয়। বিধবা, এতিম, এদের পিছনে।'

'আজ আমার কাছে অল্প কিছু আছে,' অনেক সঙ্কোচের সাথে বলল লোকটা। 'টাকা কখনও বেশি থাকে, কখনও কম থাকে, কখনও আবার মোটেই থাকে না। কিন্তু গরিব দুঃখী আর অসহায় মানুষদের প্রতি তোমার যে কোমল অন্তরের পরিচয় আমি পেলাম, তাতে সত্যি বলছি আজ আরও কিছু বেশি থাকলে আমি নিজেই খুব খুশি হতাম। তবু যা আছে, তুমি নিজের হাতে নিয়ে নাও।'

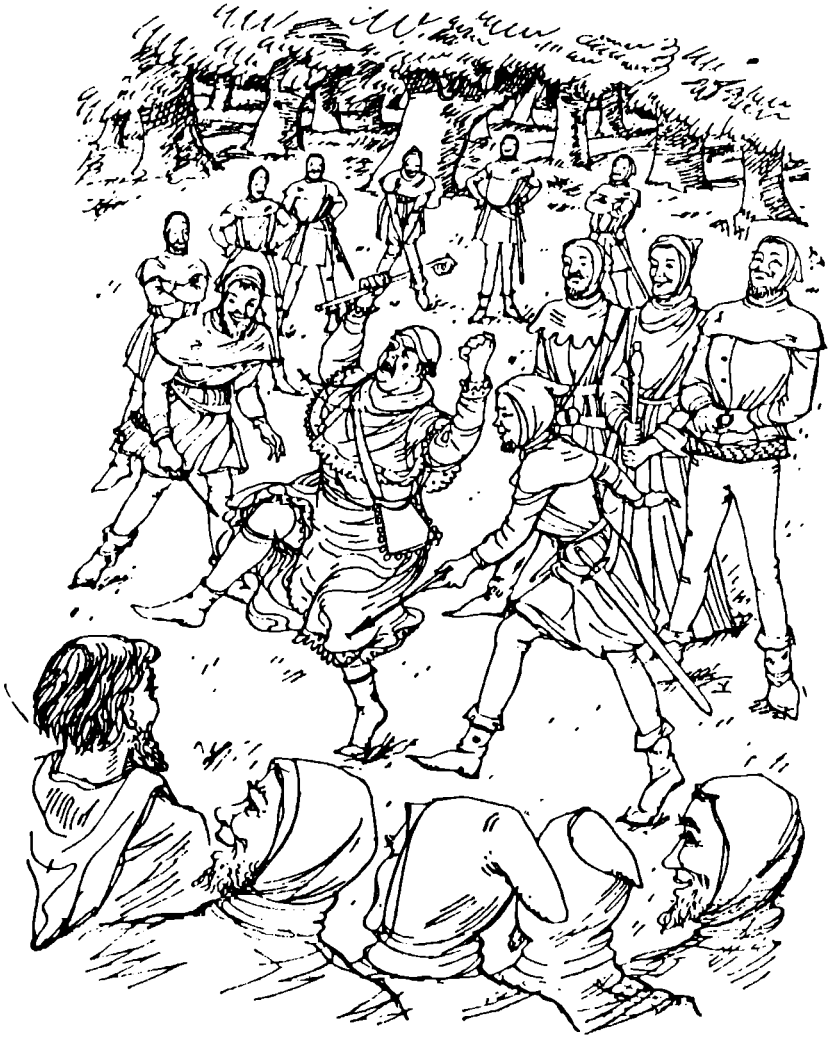

'না,' মাথা নাড়ল রবিন, 'আপনি যখন এভাবে বললেন, তখন আপনার কাছ থেকে এক টাকাও নেব না। তবে লম্বা-চওড়া আর প্রচণ্ড শক্তিধর মানুষ বলে আপনাকে আমাদের চড় মারা খেলায় অংশ নিতে হবে। কিন্তু তার আগে হেরিফোর্ডের মাননীয় বিশপ আমাদের সামনে নাচবেন। কারণ দেখা গেছে, তাঁর ধারণার চেয়েও অনেক বেশি টাকা আছে তাঁর কাছে। গুণে শেষ করতে অনেক সময় লাগবে।'

'আমি নাচতে জানি না,' প্রতিবাদ করল চর্বির ডিপো বিশপ। বোঝাতে চাইল মর্মাহত হয়েছে, কিন্তু দেখাল ভয় পেয়েছে।

'এই, তোমাদের কেউ তীরের চোখা মাথা দিয়ে বিশপের পায়ে আস্তে আস্তে খোঁচা মারতে থাকো,' রবিন বলল। 'বিশপ বললেন নাচতে পারেন না, কিন্তু আমার মনে হয় উনি নাচতে চাইছেন না।'

'আমি নাচতে পারি না !' চেঁচিয়ে উঠল বিশপ। 'আর পারলেও নাচব না ! এই ব্যাটা, সাবধান ! আমার ডান পায়ের শিরায় সমস্যা আছে। খোঁচা লাগলে আমি মরেও যেতে পারি।'

'তাহলে অন্য পায়ে খোঁচা মারো,' শান্ত গলায় বলল ও। 'কি হলো, শুরু করুন নাচ !'

এরপর আর জেদ বজায় রাখা গেল না। আলখাল্লা খানিকটা তুলে ধরে ঘুরে ঘুরে উল্টেপাল্টা নাচ শুরু করে দিল বিশপ। লোকটার চেয়ে তার চর্বি বেশি নাচছে দেখে, এমন মজার দৃশ্যে উপস্থিত প্রত্যেকে প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল। এমনকি লম্বা তীর্থযাত্রীও পর্যন্ত যোগ দিল তাতে। হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল সবাই।

'হয়েছে, হয়েছে !' হাসতে হাসতে কাহিল হয়ে পড়ল রবিন। 'অনেক নাচ হয়েছে। এবার চড় মারার খেলা শুরু হোক।'

'কিভাবে খেলে সেটা ?' তীর্থযাত্রী প্রশ্ন করল।

'খুব সোজা,' ব্যাখ্যা করল ও। 'আমাদের কেউ একজন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় চড় মারবে। তারপরও যদি আপনি পড়ে না যান, দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তাকে পাল্টা চড় মারতে পারবেন।'

'চমৎকার খেলা তো,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল লম্বা তীর্থযাত্রী। 'আমিও খেলব তোমাদের সাথে।' আস্তিন গোটাল সে। তার বলিষ্ঠ বাহু দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সবাই।

'লিটল জন,' রবিন ডাকল। 'তুমি এসো। এই ধর্মযোদ্ধাকে তোমার হাতের খেলা দেখিয়ে দাও।'

লিটল জন ভারিক্কি চালে তার সামনে এসে দাঁড়াল। আস্তিন গুটিয়ে গায়ের জোরে মারল চড়টা। কিন্তু চোখে পড়ার মত কোন প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গেল না

তীর্থযাত্রীর মধ্যে। এক মুহূর্ত পর তার কান ফাটানো চড়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে লিটল জনই ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

'সব্বোনাশ !' ফ্রায়ার টাক বলল। আস্তিন গোটাতে গোটতে তীর্থযাত্রীর দিকে এগিয়ে এল। তার গাছের কাণ্ডের মত মোটা বাহু দেখে অবাক হলো সে। 'লিটল জন তো পারল না। এবার দেখি আমি পারি কি না।' কথা শেষ করে ভয়ঙ্কর এক চড় মারল লম্বা লোকটার গালে। ওই চড়ে একটা ষাঁড়েরও মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু লোকটা একটু দুলে উঠল কেবল।

'ভালই মেরেছেন ফ্রায়ার,' বলে দ্বিগুণ শক্তির চড় মেরে বসল মোটা লোকটার ফোলা গালে। পতন ঠেকাতে অনেক চেষ্টা করল ফ্রায়ার, পারল না। চিত হয়ে পড়ে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। হাত বাড়িয়ে চিৎকার করে তাকে তুলতে বলছে।

রবিনের দিকে ফিরল তীর্থযাত্রী। হাসছে। 'এটাও গেল তাহলে ! ডিনারের দাম শোধ হয়েছে তো, রবিনহুড ?'

'হ্যাঁ, শেষের চড়ে সব শোধ হয়ে গেছে,' বলে তার সামনে এসে দাঁড়াল। 'এই লোকের চড় খেয়ে আমি কখনও পড়িনি, কিন্তু আপনাকে উড়িয়ে দিতে সাহস হচ্ছে না। ভয় করছে আমার।'

ওর চড়ের মোকাবেলা করতে শক্ত হয়ে দাঁড়াল তীর্থযাত্রী। মারটা গায়ের জোরেই মেরেছিল রবিন, কিন্তু তাতে জায়গা থেকে এক পা-ও নড়ানো গেল না লোকটাকে। 'এবার আমার পালা, বনের রাজা,' সামলে নিয়ে বলল সে। পাল্টা চড় মারল। পরমুহূর্তে নিজেকে মাটিতে শোয়া অবস্থায় আবিষ্কার করল রবিনহুড।

'আপনার চড়ে আমাদের সবার চেয়ে বেশি শক্তি,' কোনরকমে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বলল রবিন। 'সত্যি বলছি, আপনার মত শক্তিমান মানুষ জীবনে দ্বিতীয়জন দেখিনি আমি। আপনি সব ছেড়ে আমাদের এখানে এসে থাকতে পারেন না ?'

মাথা নাড়ল লোকটা। চেহারায় আফেসোস। 'পারি না। কারণ আমি রাজার কাজ করি।'

'আমরাও এখানে তাই করি,' রবিন জবাব দিল, 'আপনাকে তো সবই বললাম।'

তীর্থযাত্রী মৃদু হাসল। এমন সময় লিটল জনকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। 'কিন্তু এখানে একজন শয়তানের চ্যালাও আছে,' বলে রবিনের হাতে একটা চিঠি তুলে দিল। চিঠিটা বিশপের গাউনের লাইনিং থেকে বের করেছে ও। ওটা পড়ে ভুরু কুঁচকে উঠল রবিনের।

'এতবড় ষড়যন্ত্র !' বিড়বিড় করে বলল ও। বিশপের দিকে ফিরল। 'ভাবছি, এখনই আপনাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত আমার।'

'না, না !' চিৎকার করে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। 'ক্ষমা করো আমাকে ! ছেড়ে দাও ! আমার কিছু করার ছিল না। দেখছ না, ওটাতে কার স্বাক্ষর আছে ?'

'দেখছি,' মাথা দোলাল রবিন। 'স্বাক্ষরটা দেখে মনে পড়ল এখানে আমাদের একজন বন্দিও আছে। যখন মেয়েদের আশেপাশে কোন পুরুষ থাকে না তাদেরকে দেখাশুনা করার জন্যে, তখন সে পৌরুষ দেখাতে চুপি চুপি আসে মেয়েদের ওপর আক্রমণ চালাতে। লিটল জন, তাকে নিয়ে এসো এখানে।'

গুহা থেকে বের করে নিয়ে আসা হলো বন্দি যুবরাজকে। তাকে চিনতে পারামাত্র উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলল তীর্থযাত্রী, তাড়াতাড়ি উঠে মাথার হুড ফেলে জনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দিকে এক পলক তাকিয়েই চেহারা বদলে গেল যুবরাজের, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। হাঁটুর জোর হারিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল মাটিতে।

'রিচার্ড !' ঢোঁক গিলে অস্ফুটে বলল যুবরাজ জন। 'রাজা রিচার্ড ! আমার ভাই ... আমাকে শাস্তি দিতে ফিরে এসেছে !'

'ওর বাঁধন খুলে দাও,' নির্দেশ দিলেন রিচার্ড। 'চলে যাও এখান থেকে। আর পাপ কোরো না।'

যুবরাজের ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। ফ্যাকাসে, ভীত জন কোনমতে উঠে বসল ওটায়। খুব দ্রুত পালিয়ে গেল জায়গা ছেড়ে। ভাই চোখের আড়ালে চলে যেতে ঘুরলেন রিচার্ড, দেখলেন রবিনহুড তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চারিদিকে গুঞ্জন চলছে, 'রাজা ! রাজা রিচার্ড !'

'আমাকে ক্ষমা করুন, মহানুভব,' রবিন বলল।

'উঠে দাঁড়াও,' বললেন রিচার্ড। 'উঠে দাঁড়াও, বন্ধু। আমি তোমাকে, তোমার প্রতিটা লোককে ক্ষমা করে দিয়েছি ... হেরিফোর্ডের এই বিশপকে বাদে অবশ্যই। রবিনহুড, তোমার কার্যকলাপ নিয়ে সারা ইংল্যান্ডের মানুষ গল্প করে। শুনলাম, যতদিন আমি লেডি মেরিয়ানের হাত তোমার হাতে তুলে না দেব, ততদিন নাকি সে কুমারী থাকবে বলে শপথ করেছে ?'

'আপনি সত্যি শুনেছেন, মাই লর্ড !'

'ঠিক আছে। ডাকো তাহলে মেরিয়ানকে। আমি এখানেই তোমার হাতে ওকে তুলে দেব। হেরিফোর্ডের বিশপ তোমাদের বিয়ে পড়াবে। এই একটা ভাল কাজের বিনিময়ে তার অতীতের সমস্ত অপরাধ আমি ক্ষমা করে দেব। ফ্রেয়ার

টাক তার ক্লার্ক হিসেবে কাজ করবে। বিশপ, কাজটা করে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যান। আর কখনও কোন ষড়যন্ত্রে অংশ নিতে যাবেন না।

***

অতএব সে রাতেই বিয়ে হলো রবিনহুড ও মেরিয়ানের। ইংল্যান্ডের সিংহ হৃদয় রাজা রিচার্ড কনে সম্প্রদান করলেন। তারপর বর-কনে ও তার সহকর্মীদের আনন্দ শোভাযাত্রা নিয়ে যাত্রা করলেন নটিংহ্যামের দিকে। শোভাযাত্রার আগে আগে চললেন রাজা। তাঁর পাশে রবিন ও মেরিয়ান।

'লর্ড অভ হান্টিংডন,' চলতে চলতে বললেন রিচার্ড। 'আজ থেকে তোমার সমস্ত জমি, তোমার উপাধি আবার তোমার হলো। তবে তোমার লোকদের মধ্যে কিছু লোককে আমি নিয়ে যাব, যারা আমার পাশে থেকে বিশ্বস্ততার সাথে সাহায্য করবে আমাকে। দেশের কাজে। তুমি জানো ইংল্যান্ডের শত্রুর অভাব নেই। তাই শক্তিশালী বাহু ও অন্তরে দেশপ্রেম আছে, এমন লোক চাই আমি। তাহলে হয়তো কোনদিন শান্তি আসবে এদেশে।

বিজয়ীর মত নটিংহ্যামে ঢুকল রিচার্ডের শোভাযাত্রা। কৃষক তার লাঙল ফেলে ছুটে এল, কামার তার হাপরের গনগনে কয়লা নিভু নিভু হয়ে আসছে দেখেও না দেখার ভান করে ছুটে এল, বৃদ্ধরা দরজার কাছে এসে ছানি পড়া চোখের তৃষার্ত দৃষ্টি মেলে পথের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তারা সবাই মিলে স্বাগত জানাল প্রাণপ্রিয় রাজা রিচার্ডকে। সমস্বরে ধ্বনি তুলল, 'রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন ! রবিনহুড দীর্ঘজীবী হোক।'

দূর থেকে এত কোলাহল শুনে শেরিফ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। রাজা যতদিন নটিংহ্যামে ছিলেন, ততদিন তার ছায়াও দেখতে পায়নি কেউ।

জনের প্রতিশোধ

জেরুজালেম থেকে রাজা রিচার্ডের ফিরে আসা এবং রবিনহুড ও তার অনুচরদের প্রতি তাঁর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কারণে ওদের গোপন জীবন আর থাকল না। ফলে শেরউডের হাসি-আনন্দে ভরা দিনগুলো কিভাবে যেন খুব দ্রুতই ফুরিয়ে গেল।

রবিন ও মেরিয়ান লকস্‌লিতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মত দিন কাটাতে লাগল। লিটল জন ও ফ্রায়ার টাকসহ ডজনখানেক পুরানো অনুচর তার সঙ্গে ছিল। টাক অবশ্য কিছুদিন পর তার সত্যিকারের বাড়ি কম্প্যানহার্স্টের হারমিটস্ সেল-এ চলে যায়।

রিচার্ড বেশিদিন ইংল্যান্ডে থাকেননি। আবার যুদ্ধে যোগ দিতে চলে যান, তবে এবার নিজের জন্মভূমি নরম্যান্ডি রক্ষার যুদ্ধে। রবিনের যে সব অনুচর তাঁর সৈন্য দলে যোগ দিয়েছিল, তারাও তাঁর সঙ্গে গেল। শেরউডের সেই জমজমাট দিনগুলোর কথা খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গেল মানুষ। কেবল চারণ কবিদের মুখে মুখে গান হয়ে টিকে থাকল রবিনহুড ও তার দলের কথা।

ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে ধরা পড়া যুবরাজ জনকে রিচার্ড ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন। রবিনকে সমস্যায় ফেলার আর কোন চেষ্টা করেননি জন। মেরিয়ানের দিকেও আর কুনজরে তাকায়নি। তবে খুব গোপনে নিজের ক্ষমতা এবং অনুসারীর সংখ্যা বাড়ানোর কাজ ঠিকই চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি–বিশেষ করে উত্তর ইংল্যান্ডে। তাঁকে সহায়তাকারীদের মধ্যে নটিংহ্যামের শেরিফও একজন।

কিছুদিন যেতে না যেতে আবার ক্ষমতা দখল করলেন জন। তবে রবিনহুডের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন থাকলেন। মনে হলো রবিনহুড অতীতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ধরনের যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছিল, সেসবের কথাও মন থেকে মুছে ফেলেছেন।

রবিন ও মেরিয়ানের জন্য পাঁচটা সুখের বছর খুব দ্রুত কেটে গেল। এরমধ্যে বাতাসে যে সমস্ত গুজবের উৎপত্তি হলো, সেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিল না তারা। লিটল জন অবশ্য এ ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারল না। সে একাধিকবার সতর্ক করল রবিনকে।

'রিচার্ড অনেকদিন থেকে দেশের বাইরে আছেন,' তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল লিটল জন, 'আর জন এমন এক মানুষ, যে ক্ষত সৃষ্টিকারীদের কথা সহজে ভোলে না। তাদেরকে ক্ষমাও করে না। তাছাড়া একটা কথা মনে রেখো, রিচার্ডের মৃত্যু হলে জনই হবেন পরবর্তী রাজা।'

হেসে উড়িয়ে দিল রবিন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমিও মনে রেখো, রাজা আমাকে আইনগতভাবে, এবং সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন। তাঁর পরিবর্তিত নতুন জঙ্গলের আইন আমি পুরোপুরিভাবে মেনে চলছি। কাজেই নতুন কোন অভিযোগ খাড়া করে আমার পিছনে লাগার সুযোগ সে যাতে না পায়, সে ব্যাপারে আমি সতর্ক।'

'গুজব চলছে রিচার্ড নাকি মারা গেছেন,' বলে চলল জন। 'দিকে দিকে যুদ্ধ আর বিদ্রোহের কথা শুনতে পাচ্ছি। আরও শোনা গেছে, জন নাকি আমাদের পুরানো বন্ধু, নটিংহ্যামের শেরিফের ওখানে আছেন।'

'ওসব স্রেফ গুজব !' অধৈর্য কণ্ঠে বলল রবিন। 'তুমি দেখছি গুজবের ভাণ্ডার, লিটল জন। 'সবই গুজব, সবই মিথ্যে। আচ্ছা, বেশ। আজই আমি নটিংহ্যাম যাব। জেনে আসার চেষ্টা করব সত্যি কথা কোনটা। তাছাড়া এক মাসের বেশি হয়ে গেল গির্জায় যাইনি। এইসাথে প্রার্থনার করার কাজও সেরে আসব।'

'তাহলে অন্তত ছয়জন সশস্ত্র সঙ্গী নিয়ে যাও,' লিটল জন বলল। 'আর এদিকে মেরিয়ানের পাহারায় আরও ছয়জনকে রেখে যাও।'

শব্দ করে হাসল রবিনহুড। 'লিটল জন, তুমি এখনও সেই আগের শেরউডে আছ। ভুলে গেছ, আমি এখন আর সেই আউটল রবিনহুড নেই। আমি এখন আর্ল অভ হান্টিংডন। তা যদি শুধু গালভরা নামও হয়, তবুও। তাছাড়া আমি লর্ড অভ লকস্‌লিও বটে।'

'আমি কিছুই ভুলিনি,' জন একগুঁয়ে কণ্ঠে জবাব দিল। 'আমি কেবল তোমাকে বোঝাতে চাইছি, আমি নাকে বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। সম্ভব হলে তোমাকে তার মধ্যে যেতে দেব না আমি।'

মেরিয়ান ওর দিকে এগিয়ে এল। ভাঙা গলায় বলল, 'রবিন, লিটল জন যা বলছে তাই করো।'

মাথা নাড়ল রবিন। বলল, 'যদি কোন বিপদ হয়, তা আমার নয়, বরং তোমার হবে। যুবরাজ জনের তরফ থেকে আসবে। কাজেই আমাদের সব লোক তোমার পাহারায় এখানেই থাকবে। লিটল জন তাদের নেতৃত্বে থাকবে।'

প্রিয়তম স্ত্রীকে চুমু খেয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল রবিনহুড। নটিংহ্যামের দিকে রওনা হয়ে গেল। রবিন চোখের আড়ালে চলে যেতে মেরিয়ান লিটল জনের দিকে ফিরে প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল, 'জন ! আমার কেন যেন খুব ভয় করছে। মনে হচ্ছে, ও বুঝি এইমাত্র আমার জীবন থেকে বেরিয়ে গেল। রবিনের পিছন পিছন

যাও, লিটল জন। কিন্তু সাবধানে। দেখে না ফেলে যেন। বিপদ যদি ঘটেই যায়, আবার যদি শেরউডে রবিনের শিঙার ফুঁ বেজে ওঠে, আমি জানি অনেকেই ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াবে।'

লিটল মাথা নেড়ে নিজের ধনুক তুলে নিল, তীর ভর্তি একটা তূণ পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বুনো পথ ধরে নটিংহ্যামের দিকে এগিয়ে চলল।

সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেরিয়ান। লকস্‌লি হলের নিজেদের আরামদায়ক থাকার ঘর এবং বাইরের চমৎকার করে ছাঁটা বাগানের ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'ভয় হচ্ছে, আমার সুখের দিন ফুরাতে বুঝি আর দেরি নেই।'

ওদিকে নটিংহ্যামে পৌঁছে একটা সরাইখানার সামনে ঘোড়া বাঁধল রবিনহুড। তারপর বড় রাস্তা ধরে পায়ে পায়ে সেইন্ট মেরির গির্জার দিকে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে ওর মনে হলো, বাতাসে কী এক অনিশ্চয়তা, কী এক উত্তেজনা ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। কিন্তু কোথাও তেমন কিছু চোখে পড়ল না। সব স্বাভাবিক।

গির্জায় ঢোকার সময় দীর্ঘদেহী এক সন্ন্যাসীকে পাশ কাটাতে গিয়ে তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল রবিনের। কিন্তু লোকটাকে খেয়াল করল না ও, ভেতরে ঢুকে পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। সন্ন্যাসীকে যদি খেয়াল করত রবিন, দেখতে পেত ওকে দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে লোকটা। জোর কদমে শেরিফের বাসার দিকে যাচ্ছে।

'উঠে পড়ুন, শেরিফ ! উঠে পড়ুন !' তার বাসায় ঢুকেই চেঁচাতে শুরু করল সন্ন্যাসী। 'শহরে রবিনহুড এসেছে ! রবিনহুড ! একা এবং নিরস্ত্র ! প্রার্থনা করতে সেইন্ট মেরির গির্জায় ঢুকেছে।'

'সত্যি ?' উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল শেরিফ। 'আসুন আমার সাথে।' দু'জনে দুর্গে চলে এল। আগের রাতে যুবরাজ জন এসে উঠেছেন সেখানে, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। 'লাকসলির রবার্ট নটিংহ্যামে এসেছে, প্রভু !' মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে বলল সে। 'রিচার্ডের মৃত্যুর খবর জানে না লোকটা। জানলে নিশ্চয়ই আসত না।'

'কথাটা এখনও জানাজানি হয়নি,' রাজা জন বললেন। 'যদি আপনি আমার নির্দেশ অমান্য করে তা ফাঁস করে না দিয়ে থাকেন। আমি চাইছিলাম আগামী কালকের আগে কেউ যেন ... ভাল একটা খবর নিয়ে এসেছেন। যান, শেরিফ। যত লোক প্রয়োজন মনে করেন সাথে নিয়ে যান। ধরে নিয়ে আসুন তাকে। ভয় নেই, আমার লোকেরা সবাই অভিজ্ঞ, পেশাদার যোদ্ধা। বিদেশ থেকে ভাড়া করে আনা। আপনার নির্দেশ তারা বিনাপ্রশ্নে পালন করবে। আপনি ধরে আনুন তাকে, আমি ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছি !'

এক ডজন সশস্ত্র যোদ্ধা নিয়ে তখনই শহর কেন্দ্রের দিকে চলল শেরিফ। গির্জার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পর প্রার্থনা সেরে বেরিয়ে এল রবিনহুড, মাথা নিচু করে হাঁটছে। কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে গেল সে, চোখের পলকে বন্দি হলো শেরিফের লোকদের হাতে।

'এর অর্থ কি, শেরিফ ?' ভিড়ের মধ্যে পুরানো শত্রুকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল রবিন। 'আমি রাজার প্রতি অনুগত একজন মুক্ত মানুষ।'

'রাজার নির্দেশেই আমি তোমাকে গ্রেফতার করতে এসেছি, লর্ড অভ হান্টিংডন,' নিচু কণ্ঠে বলল শেরিফ। মানুষের নজর যত কম আকৃষ্ট করে পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক। 'গোপনে নটিংহ্যাম এসেছেন তিনি। তোমার বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ শুনে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে ধরে তাঁর সামনে নিয়ে হাজির করতে।'

বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করল না রবিনহুড। শেরিফের সঙ্গে নীরবে নটিংহ্যাম চলে এল। ওকে দুর্গের ভেতরে নিয়ে এল শেরিফ। প্রায় খাড়া, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে দুর্গ চূড়ার দিকে নিয়ে যেতে শুরু করল। প্রথমে কিছু সন্দেহ করল না রবিন, কিন্তু যখন খেয়াল করল ক্রমে উঠেই যাচ্ছে ওরা, সিঁড়ি শেষ হচ্ছে না, তখন গভীর সন্দেহ জাগল মনে।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রাজার কাছে।'

'রাজা নিশ্চয়ই দুর্গের টারেট চেম্বারে (চূড়ার প্রকোষ্ঠ) বিচারালয় খুলে বসেননি !' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন।

'তুমি ভুলে গেছ তিনি এখানে গোপনে এসেছেন,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিল শেরিফ। আরও কিছু সময় ওঠার পর সিঁড়ির শেষ মাথায়, দুর্গের ছাদের একেবারে কাছাকাছি ছোট একটা রুমে এসে পড়ল তারা। রুমটার ও মাথার এক খোলা দরজা দিয়ে ছয় ফুট বাই ছয় ফুট একটা কুঠুরি দেখা গেল। ছয়জন মিস্ত্রি ওটার দরজা তৈরি করছে।

'তাহলে আবার আমাদের দেখা হলো, রবিনহুড ?' একটা মসৃণ, নিষ্ঠুর গলা শোনা গেল।

তাকে সতর্ক চোখে দেখল রবিন। 'যুবরাজ জন, যদি কোন খারাপ মতলব থাকে, আমি আপনাকে সতর্ক হতে অনুরোধ করব। কারণ আপনি যদি আবার কোন ষড়যন্ত্র করেন, রাজা রিচার্ড হয়তো সেটাকে হালকাভাবে নেবেন না। আপনাকে ক্ষমা করবেন না।'

ওর গালে প্রচণ্ড এক চড় মেরে বসল শেরিফ। 'মুখ সামলে কথা বল্, কুকুর কোথাকার ! এখন রাজার সাথেই কথা বলছিস্ তুই।'

'রাজা !' ঢোঁক গিলল ও।

'হ্যাঁ, রাজা,' জন বললেন শান্ত গলায়। 'আমার ভাই রিচার্ড নরম্যাণ্ডিতে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে, দু'দিন আগে আমার কানে এসেছে খবরটা। কিন্তু ইচ্ছে করেই তা গোপন রেখেছিলাম, তোমার মত কিছু বিশ্বাসঘাতককে ফাঁদে ফেলে আটক করব বলে কাউকে জানতে দিইনি।'

মিনিটখানেক একদৃষ্টে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল রবিনহুড, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'এটা একটা নিকৃষ্ট ধরনের প্রতিশোধ হলো,' বলল সে। 'একজন রাজা এত নিচ কাজ করতে পারে, ভাবাই যায় না। কি লাভ এতে ?'

'লাভ ? তোমাকে খতম করতে পারলে আমার এবং লেডি মেরিয়ানের মাঝখানে আগের মত বাধা হয়ে দাঁড়াবার মত আর কেউ থাকবে না, এই লাভ। তবে আমি নিজ হাতে তোমাকে খতম করব না। ওই যে সামনে একটা কুঠুরি তৈরি হচ্ছে দেখছ, ওটা তোমার জন্যে, রবিনহুড। তোমাকে জ্যান্ত কবর দেয়ার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে ওটা। ওর মধ্যে বসে তুমি মৃত্যু কামনার জন্যে প্রার্থনা করতে পারবে। নির্মাণকাজ শেষ হলে তোমাকে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার পর যখন দুর্ঘটনাবশত দরজায় তালা লেগে যাবে, তখন যতই চেঁচাও, বাইরে থেকে কেউ তা শুনতে পাবে না। কুঠুরিতে জানালা আছে কি না জানতে চাইছ ? হ্যাঁ, জানালা একটা আছে বটে, লোহার মোটা মোটা শিক বসানো। চেষ্টা করলে ওটা দিয়ে হয়তো বের হতে পারবে তুমি, কিন্তু তাতে দুর্গের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন কাজ হবে না। কিন্তু আত্মহত্যা করা মহাপাপ, সে কথাটাও খেয়াল রেখো। আর দেয়ালের ওই লোহার আংটা ও মোটা দড়িটা কিসের জানতে চাইছ ? ওটা দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখা হবে। জানা কথা ওটা এক সময় না এক সময় খুলে ফেলতে পারবে তুমি, কিন্তু ততক্ষণে দেয়ালের নতুন পাথরের গাঁথুনি মজবুত হয়ে উঠবে। তুমি ওটার ভেতরেই থাকবে, আর আমি লকসলিতে মেরিয়ানের সান্নিধ্যে থাকব।'

'শয়তান !' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিনহুড। 'হায়, দুর্ভাগা ইংল্যান্ড ! তোমার মত একজন হবে এ দেশের রাজা !'

ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে কুঠুরিটার মধ্যে ঢোকানো হলো ওকে। কয়েকজন মিলে আংটায় বাঁধা দড়ি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে ফেলল। ওদিকে মিস্ত্রিরা দ্রুত হাতে দেয়াল গাঁথার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে দরজার জায়গায় তিন ফুট প্রশস্ত, নিরেট পাথরের একটা দেয়াল তৈরি হয়ে গেল। মিস্ত্রিদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রবিনকে লক্ষ করে জনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলতে থাকল। রাতের বেলা মেরিয়ানকে কি ভাবে লকসলি থেকে তাঁর ডেরায় নিয়ে যাওয়া হবে, খুব গর্বের সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়ে চললেন তিনি।

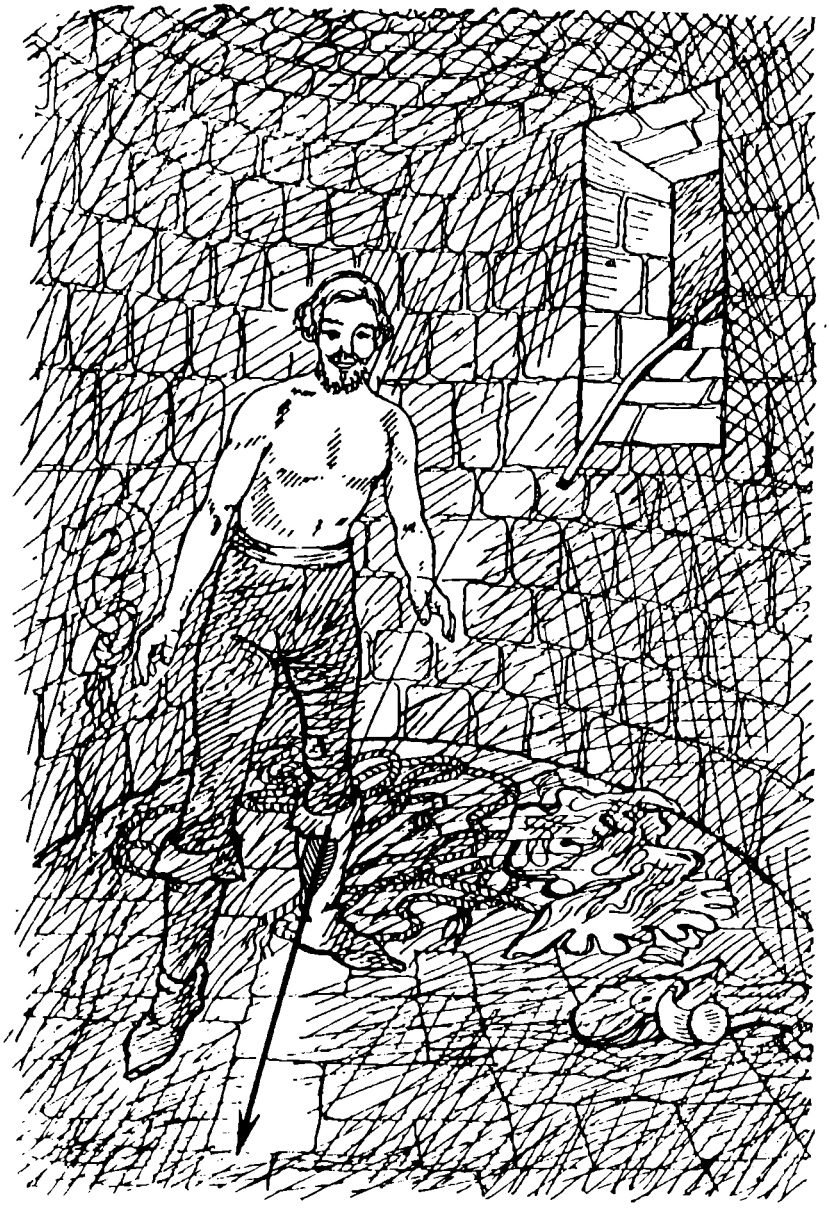

কাজ শেষ হলে এক এক করে সবাই নেমে গেল দুর্গ চূড়া থেকে। কবরের মত নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে গেল দুর্গ। টারেট চেম্বারের মধ্যে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রাণপণে, মরিয়া হয়ে যুঝতে লাগল রবিন। বহু কষ্টে মুক্ত হয়েই নতুন দেয়ালটার দিকে নজর দিল ও। কিন্তু এক নজর দেখেই বুঝল দেরি হয়ে গেছে। গাঁথুনি জমে লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে। ওই পথে পালানোর উপায় নেই।

কাজেই বাধ্য হয়ে জানালার দিকে নজর দিতে হলো। সরু জানালা, মোটা মোটা শিক। ভালমত পরখ করে একটা শিক কিছুটা দুর্বল দেখতে পেল রবিনহুড। মাঝামাঝি জায়গায় জং পড়ে গেছে। দেয়ালে এক পা বাধিয়ে দাঁড়াল ও, দু'হাতে ধরে শিকটাকে প্রাণপণে নিজের দিকে টানতে লাগল। ধীরে, খুব ধীরে ধীরে বাঁকা হতে শুরু করল শিক। উৎসাহিত হয়ে আরও জোরে জোরে টানতে থাকল রবিন, ওটাকে স্থানচ্যুত না করে থামল না। তারপর উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল।

সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। পড়ন্ত রোদ মেখে চিকচিক করছে সবুজ শেরউড। দুর্গের অনেক নিচের গোড়ারদিকটা এরমধ্যেই গাঢ় ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে অজান্তেই শিউরে উঠল রবিন। একশো ফুট কি তারচেয়েও বেশি উঁচুতে আটকে আছে ও। এত নিচে কি ভাবে নামবে ?

হতাশ হয়ে পড়েছিল, এমন সময় কোমরের বেল্টের সাথে রূপার তৈরি শিঙাটা ঝুলছে দেখে নতুন জীবন ফিরে পেল যেন। ওটা অ্যাশবি-ডি-লা-জাউচের তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতায় সেরা তীরন্দাজ হিসেবে পেয়েছিল। জানালার সামনে গিয়ে ওটায় ফুঁ দিল রবিন–পুরানো, পরিচিত ডাক।

ফুঁ দিয়েই জানালার কাছ থেকে সরে এল রবিন, যাতে কেউ দেখে ফেলতে না পারে। কিছুক্ষণ পর ডাকের জবাব এল। শুনেই বোঝা গেল ওটা লিটল জনের। দ্রুত হাতে গায়ের জামা খুলে ফেলল রবিন, জানালার অবশিষ্ট শিকগুলোর একটার সঙ্গে ওটা বেঁধে বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। উত্তেজনায় দুরু দুরু কাঁপছে বুক।

তার প্রায় এক ঘণ্টা পরের কথা। দিনের আলো ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা তীর উড়ে এল জানালা লক্ষ্য করে। সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকে পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়ল। ব্যস্ত হয়ে মেঝে হাতড়ে তীরটা তুলে নিল রবিন। যা ভেবেছিল তাই–একটা সরু সুতো বাধল হাতে, তীরটার সঙ্গে বাঁধা। খুব সাবধানে, এক গজ এক গজ করে ওটাকে তুলে আনতে শুরু করল ও। সুতোর শেষ মাথায় বাঁধা একটা সরু কর্ড উঠে এল প্রথমে, কর্ড শেষ হতে এল দড়ি। ওটা দেখে মনে হলো রবিনের ভার সহ্য করতে পারবে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে বেশি সময় নষ্ট করল না রবিনহুড।

দড়িটার এক মাথা দ্রুত দেয়ালের আংটার সঙ্গে বেঁধে নিল, তারপর সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সেরে পা আগে মাথা পিছনে করে বেরিয়ে পড়ল কুঠুরি থেকে। খুব ধীরে,

খুব সাবধানে নিচে নামতে শুরু করল। আশঙ্কাজনক অবতরণ–দড়ি যথেষ্ট মজবুত নয়, তার ওপর বাতাসে বিপজ্জনকভাবে দোল খাচ্ছে রবিনহুড, দড়িটাও জানালার কর্কশ পাথুরে কিনারার সঙ্গে ঘন ঘন ঘষা খাচ্ছে। জানা কথা, এ অবস্থা বেশিক্ষণ চললে দড়ি ছিঁড়ে যাবে যে কোন সময়।

ঠিক তাই ঘটল। রবিন মাটি থেকে বিশ ফুটের মত উঁচুতে থাকতে ছিঁড়ে গেল ওটা। সবেগে মাটিতে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারাল রবিনহুড। কয়েক মিনিট পর জ্ঞান ফিরতে উদ্বিগ্ন লিটল জনকে ওর ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখল। ওকে চোখ মেলতে দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল লিটল জন। হাতটা ধরে অনেক কষ্টে উঠে বসল ও, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখছে। অসহনীয় জ্বালাপোড়া। নিশ্চয়ই পড়ে যাওয়ার কারণে কোন অভ্যন্তরীণ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, ভাবল ও।

'চলে এসো !' ফিসফিস করে ডাকল লিটল জন। 'দেয়ালের ওপাশে আমাদের জন্যে ঘোড়া অপেক্ষা করছে, গোপন পথে পালিয়ে যাব আমরা।'

'আগে লকসলি যেতে হবে আমাদেরকে, লিটল জন !' কোনমতে বলল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'জন আর শেরিফও ওদিকেই গেছে।'

'কখন ?' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন।

'আধ ঘণ্টা আগে। এক কুড়ি সশস্ত্র লোক নিয়ে গেছে ওরা,' বলে একটু থামল বিশালদেহী লোকটা। 'আমাদের দলে রেনল্ড গ্রিনলিফ নামে যে এক লোক ছিল, সে এখন দুর্গের গার্ডদের কমান্ডার। ওপরে কি ঘটছে, গ্রিনলিফ কিছুই জানত না। আমি বলেছি তাকে। লোকটার সাহায্য প্রয়োজন ছিল আমার। চলো, চলো !'

'ওরা লকসলির দিকে গেছে তুমি জানলে কিভাবে ?' বলল রবিন।

'রেনল্ড বলেছে। জনের সাথে যেসব বিদেশী মার্সেনারি এসেছে, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করে নিয়েছে সে, তাই এসব ছোটখাটো কাজ তার কাছে কোন সমস্যা নয়। কথাটা জানতে পেরে সে-ই আমাকে গোপন পথে এই বাগানে নিয়ে এসেছে। তারপর মাচকে খবর পাঠিয়েছে আমাদের জন্যে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে।'

একান্ত অনুগত বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল রবিনহুড, অন্ধকার গোপন পথ ধরে এঁকেবেঁকে দুর্গ এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে শেরউডে ঢুকে পড়ল। সামনেই গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল মাচের পাঠানো ঘোড়া, সেগুলো নিয়ে তখনই লকসলির পথে ছুটল। কিছুদূর যেতে না যেতে হঠাৎ এলোমেলো বাতাস আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে দিয়েই তীরের বেগে ছুটে চলল ওরা।

রাজা জন পৌঁছাবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে লকসলি হলে এসে পৌঁছল রবিন ও লিটল জন। রবিন সঙ্গীদের উদ্দেশে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বন্ধুরা, লকসলি হলকে রক্ষা করার উপায় নেই। তোমরা সবাই পালাও এখান থেকে।

মেরিয়ান, তুমিও। রাজা জন আর শেরিফ আসছে। এক কুড়ি বিদেশী মার্সেনারি আছে তাদের সঙ্গে।'

কয়েকজন সঙ্গী পালিয়ে গেলেও বাকিরা গেল না। তারা প্রতিজ্ঞা করল, প্রয়োজনে রবিনের পাশে থেকে মৃত্যু বরণ করবে, কিন্তু বিপদের সময় তাকে ফেলে পালাবে না। দশ মিনিট পর মেরিয়ান, লিটল জন এবং আরও চারজন সঙ্গীসহ ফের পথে বেরিয়ে পড়ল রবিনহুড। শত্রু ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে এরমধ্যে। বৃষ্টি থেমে গিয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে, তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ঝলমলে জোছনা।

'উত্তরে চলো !' নির্দেশ দিল রবিনহুড। 'গ্রেট নর্থ রোডের দিকে। পূর্ণ গতিতে ছুটতে হবে মনে রেখো। গতিই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।'

ছোট অশ্বারোহী দলটা আড়াল ছেড়ে বেরিয়েই আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রু বাহিনীর ওপর। চাঁদের আলোয় প্রথমেই নটিংহ্যামের শেরিফের ওপর চোখ পড়ল রবিনের। একদম ওর নাগালের মধ্যে। শেরিফও চিনল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ভূত ! রবিনহুডের ভূত !'

পরক্ষণে রবিনের তলোয়ারের এক কোপে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। কয়েকবার পা দাপড়ে স্থির হয়ে গেল। শত্রুর হাতে দু'জন সঙ্গী হারাল রবিনহুড, তবে বাকিরা ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এল বাইরে। ঝড়ের গতিতে ছুটে গেল উত্তরের পানে। প্রায় সারারাত ধরে চলল ধাওয়া। রাজার বাহিনী তেমন সুবিধে করতে পারল না বটে, তবে রবিনের দলও তাদেরকে খসাতে ব্যর্থ হলো।

উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথে ছুটতে গিয়ে ভোরের দিকে মেরিয়ানের ঘোড়ার পা ভেঙে গেল। নিরুপায় হয়ে অনুসারীদের একজন নিজের ঘোড়াটা ওকে দিয়ে দিল, তারপর নিজে বনের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করল । আরেকবার শত্রু অনেক কাছে এসে পড়েছে দেখে রবিন, মেরিয়ান ও লিটল জন বাদে অন্যরা মার্সেনারি দলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের অগ্রগতি কিছু সময়ের জন্য প্রায় থামিয়ে দিল, এবং এর মূল্য তাদেরকে শোধ করতে হলো জীবন দিয়ে।

দিনের আলো ফুটতে একটা সাইড রোডে থেমে পড়ল রবিনহুড। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আর এক মাইল গেলেই কার্কলিসের নানারি (নারী-মঠ)। জন, মেরিয়ানকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসবে দয়া করে ? মেরিয়ান নানারির মাদার প্রায়োরেসের (মঠের অধ্যক্ষা) কাছে আশ্রয় চাইলে তিনি ওর হেফাজতের দায়িত্ব নেবেন। প্রায়োরেস অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, এমনকি রাজা জনও তাঁকে দিয়ে কোন অধর্ম করাতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না !' চেঁচিয়ে উঠল মেরিয়ান। 'তুমিও আমার সাথে চলো ওখানে।'

'তুমি ওখানে নিরাপদে থাকতে পারবে, মেরিয়ান,' রবিন বলল। 'আমি নই। আমাকে যদি ভালোবেসে থাকো, তাহলে নানারিতে গিয়ে থাকো। জন, তোমার প্রতি আমার শেষ নির্দেশ, যদি বেঁচে থাকি, যদি কোনদিন ফিরে আসতে পারি, তোমাকেও নানারির কাছেই আশা করব। কিন্তু মনে হয় তা আর হবার নয়। দুর্গ থেকে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে আমার ভেতরে মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। বেশি দূর হাঁটতে পারি না। অবশ্য ঘোড়া নিয়ে ছুটতে পারব, জনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারব তোমাদের পথ থেকে।'

প্রিয়তম স্ত্রী মেরিয়ানকে শেষ চুমু খেল সে। 'বিদায়, মেরিয়ান–হয়তো পৃথিবীতে এটাই আমাদের শেষ দেখা। হয়তো আর কখনও দেখা হবে না।'

কিছুক্ষণ পর কার্কলিজের দিকে চলতে শুরু করল মেরিয়ান ও লিটল জন। তারা দৃষ্টিসীমার বাইরে যেতে পেরেছে কি পারেনি, এমন সময় রাজা জনের দলের এক মার্সেনারি দেখা দিল। সে-ও দেখে ফেলল রবিনকে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে তীরবেগে পালাতে লাগল রবিনহুড।

রবিনহুডের শেষ অভিযান

মেরিয়ান ও লিটল জনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে কিছুক্ষণ উত্তরে ছুটল রবিনহুড, তারপর পুবদিকে ঘুরে ইয়র্কশায়ারের পথ ধরল। ভেবেছিল এভাবে বারবার দিক বদল করলে বুঝি অনুসরণকারীদের খসানো যাবে। কিন্তু হলো না। রাজার লোকেরা সারারাত ধাওয়া করে নিয়ে চলল ওকে। ভোরের দিকে ইয়র্কশায়ার মূর ছাড়িয়ে এসে স্কারবরোর দীর্ঘ ঢালে পৌঁছল রবিন। এমন সময় ধূসর সাগরের বুক ভেদ করে সূর্য উঠল।

খোয়া বাঁধানো রাস্তা ধরে ছোট্ট জেলে শহরে ঢুকল রবিন। প্রথম সরাইখানার সামনে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমেই ওটার পাশ ঘেঁষে চলে যাওয়া পথ ধরে নৌ-বন্দরের দিকে চলল। কিছুক্ষণ পর রাজার লোকেরাও শহরে পৌঁছল। সরাইখানার সামনে ওর ঘোড়া বাঁধা আছে দেখে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল রবিনকে ধরে আনতে।

ওদিকে যন্ত্রণা আর ক্লান্তির কাছে পরাজিত প্রায় রবিনহুড জাহাজ ঘাটের কাছের একটা লজিঙে এসে আশ্রয় নিল। নাবিকদের থাকার লজিং। ওটার মালিক, এক নিঃসন্তান বুড়ি। বিধবা। সে স্বগত জানাল রবিনকে। খাবার নিয়ে এল ওর জন্য।

'আমি এক গরিব জেলে,' খেতে খেতে মহিলার প্রশ্নের জবাবে বলল রবিন। 'চেশায়ারের হেলসবি থেকে এসেছি। আমার নাম সাইমন লী। আসার পথে কিছু আউটলর কবলে পড়েছিলাম। আমার সব কেড়ে নিয়েছে ওরা। এখান পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে এসেছে।'

রবিনকে থাকতে দিল বুড়ি। যত্ন করে খাওয়াল। দিনে বের হওয়ায় ঝুঁকি আছে বলে সারাদিন বিশ্রাম নিয়ে কাটাল রবিন। তারপর সন্ধে হতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। লাঠিতে ভর দিয়ে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। টের পেয়ে গেল নগর প্রাচীরের প্রতিটা গেটে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। যারা শহরে ঢুকছে-রেবোচ্ছে, তাদেরকে গার্ডদের কড়া জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সন্ধের খানিক আগে জাহাজঘাটে এসে বসল রবিনহুড। অস্তমিত সূর্যের আলোয় আগুনে লাল হয়ে ওঠা সাগরের দিকে তাকিয়ে পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল। এই এলাকার আশপাশে কয়েকজন আছে যাদের সাহায্য নিতে

পারে ও। স্যার রিচার্ড অভ লে আছেন, অ্যালান-এ-ডেল আছে। তারা খুশি মনেই আশ্রয় দেবে রবিনকে। কিন্তু রাজার গুপ্তচরদের কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকবে না। তখন ওর আশ্রয়দাতাই বিপদে পড়ে যাবে।

পালিয়ে যে ওয়েকফিল্ডে যাব জর্জ-এ-গ্রিনের কাছে, ভাবল ও, সে পথও নেই। শেরউডে যাব, তারও উপায় নেই। ওখানে রবিনের আর কেউ নেই। নতুন লোকজন সংগ্রহ করে নতুন দল গঠন করব, তা-ও আর ...

বিষণ্ন মনে লজিঙে ফিরে এল রবিন। একটু পর রাতের খাবার পরিবেশন করতে এসে মালিক মহিলা বলল, 'জেলে সাইমন, তুমি বলেছ পৃথিবীতে তোমার শেষ সম্বল বলতে আছে কেবল দুটি স্বর্ণমুদ্রা এবং তুমি চাকরি খুঁজছ। ঠিক না ? তাহলে তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে। আমার একটা মাছ ধরার জাহাজ আছে। এই সাগরে যত জাহাজ মাছ ধরে বেড়ায়, সেগুলোর মতই। কাল ভোরে বন্দর ছেড়ে যাবে ওটা। তোমার ভাগ্য ভাল যে ওটায় একজন জেলের পদ খালি আছে। তুমি কি পদটা পূরণে রাজি আছ ?'

'সানন্দে রাজি আছি,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল রবিনহুড।

নির্দিষ্ট সময়ে নর্থ সী-র উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া জাহাজটায় চড়ে যাত্রা করল ও। কয়েকদিন চলার পর এক জায়গায় নোঙর করল সেটা, জেলেরা সাগরে ছিপ এবং জাল পাতার আয়োজনে লেগে পড়ল। রবিনহুড এসবে একেবারেই অনভিজ্ঞ, কাজেই বড়শিতে কোন খাবার না গেঁথেই পানিতে ফেলে বসে থাকল। ফল যা হওয়ার তাই হলো, ওর সারাদিনের প্রতীক্ষা বিফলে গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেন ঠাট্টা করে বলল, 'এই মহাবোকাটার কাজ শিখতে অনেক সময় লাগবে দেখছি। এ যাত্রায় আমাদের ভাগ থেকে এক পেনিও পাবে না লোকটা, কারণ ও রোজগার করার মত কোন কাজ করেনি।

'আফসোস !' রবিন বলল। 'এখন যদি প্লম্পটন পার্কে থাকতাম, চোখের পলকে একটা রেড লাল হরিণ শিকার করে নিয়ে আসতে পারতাম। আমি মাছ ধরতে পারি না বলে ভাঁড়ের দল হাসাহাসি করছে, কিন্তু এদের যদি জঙ্গলে পেতাম, তাহলে দেখতাম কে কত ওস্তাদ !'

দিনের পর দিন মাছ ধরে চলল জাহাজ। অবশেষে একদিন সকালে দূর থেকে আরেকটা জাহাজ চোখে পড়তে বিপদের গন্ধ পেল রবিন। যুদ্ধ আর মৃত্যু ডেকে আনছে ওটা।

'এইবার মরেছি !' ক্যাপ্টেন বলল ওটা চোখে পড়তে। 'ফরাসি জলদস্যুদের জাহাজ ওটা ! আমাদের সব মাছ লুট করে নিয়ে যাবে। আমাদেরকে হয় সাগরে ফেলে দেবে, নয়তো দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দেবে। এখন কি করি ? পালাবার কোন উপায় তো দেখছি না !'

'হতাশ হয়ো না, ক্যাপ্টেন !' রবিনহুড বলল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে। আমায় লং বো আর এক তূণ তীর এনে দাও, একটা ডাকাতকেও জান নিয়ে পালাতে দেবো না আমি।'

'আরে রাখো, বাপু !' ধমকে উঠল লোকটা। 'তোমার আছে কেবল লম্বা লম্বা কথা। এখন যদি তোমাকে ধরে সাগরে ফেলে দিই ? আমার কোন লোকসান হবে না, বুঝতে পেরেছ ?'

কোন জবাব দিল না রবিনহুড। লোকগুলো আত্মরক্ষার জন্য কোনরকম প্রস্তুতি নিচ্ছে না দেখে নিজের তীর-ধনুক নিয়ে এসে প্রস্তুত হতে লাগল। খাড়া থাকার সুবিধের জন্য নিজেকে মাস্তুলের সঙ্গে কষে বেঁধে নিয়ে প্রথম তীর ছোড়ার জন্য প্রস্তুত হলো। শত্রু জাহাজের ক্যাপ্টেনকে কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করতে দেখে তাকেই প্রথমে শিকার করল রবিন। ডেকে আছড়ে পড়ার আগেই মৃত্যু হলো লোকটার।

তারপর দুটো জাহাজ যত পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, ততই দ্রুত হাত চলতে লাগল রবিনের। প্রতিটা তীরের আঘাতে একজন করে জলদস্যু ডেকে লুটিয়ে পড়তে লাগল। আহত দস্যুদের আর্ত চিৎকারে কান পাতা দায় হয়ে উঠল ওদের। এক সময় ফরাসি জাহাজের গায়ের সাথে ভিড়ল রবিনদের মাছ ধরার জাহাজ।

নিজেকে বাঁধনমুক্ত করে নিজের ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল ও। চেঁচিয়ে বলল, 'চলে এসো, ক্যাপ্টেন ! তোমরাও এসো। আর ভয়ের কিছু নেই। এখন ওটাও আমাদের হয়ে গেছে।'

হুড়মুড় করে দ্বিতীয় জাহাজে উঠে এল সবাই। রবিনহুডের তীরের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে অনায়াসে পরাজিত করে দখল সম্পন্ন করল। তারপর বন্দিদেরকে কষে বেঁধে ফেলল ওরা। রবিন ও ক্যাপ্টেন মিলে ডাকাতদের লুকিয়ে রাখা ধন-সম্পত্তি খুঁজে বের করল—নগদ বারো হাজার পাউন্ড, তার সাথে আরও হরেক পদের মূল্যবান জিনিস তো আছেই।'

'দুঃখিত, রবিন,' ক্যাপ্টেন এগিয়ে গেল ওর দিকে। বলল, 'তোমাকে আমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিলাম। কারও ক্ষমতা সম্পর্কে না জেনেশুনে এভাবে মন্তব্য করা উচিত হয়নি। আজ যদি তুমি তোমার তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের সাথে না থাকতে, তাহলে এতক্ষণে হয় জলদস্যুদের হাতে বন্দি থাকতাম আমরা, নয়তো মরে যেতাম। তাই এ সম্পদের পুরোটাই তোমার।'

'না, না ! আমার নয়,' রবিন আপত্তি জানাল। 'এর অর্ধেক আমাদের জাহাজের মালিক এবং তার এতিম ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য। বাকি অর্ধেক আমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিতে পারি।'

তারপরও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকল ক্যাপ্টেন। 'সাইমন লী। মালিককে এখান থেকে অর্ধেক দিতে চাইছ দাও, কিন্তু বাকি অর্ধেক তোমাকেই নিতে হবে। আমি জানি আমরা যা করেছি, তার পুরস্কার অবশ্যই মিলবে। কাজেই তোমার অংশে হাত দিতে চাই না আমি।'

কথা না বাড়িয়ে কোমরের থলিটা বের করল ও। তার মধ্যে যতটুকু ধরে, ততটুকু সোনা ভরে নিয়ে বলল, 'এর বেশি আর চাই না। আমার অংশের আর যা বাকি থাকল, তা দিয়ে স্কারবরোতে গরিব পথচারীদের জন্যে একটা বিশ্রামাগার নির্মাণ কোরো তুমি। কিন্তু তার আগে আমাকে ইয়র্কশায়ারের উপকূলে নামিয়ে দিয়ে যেয়ো। আমি স্কারবরোয় যেতে চাই না। আমার ধারণা, ওখানে আমার কিছু শত্রু আছে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।'

জাহাজ ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নিয়ে চলল ক্যাপ্টেন। একটানা কয়েকদিন চলার পর এক রাতে একটা ছোট উপসাগরে নোঙর ফেলা হলো। সেদিন থেকে সেটা হয়ে যায় রবিনহুড'স বে। আজও ওটাকে এই নামেই চেনে সবাই। রবিন জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় ক্যাপ্টেন বলল, 'বিদায়, দুঃসাহসী সায়মন লী।'

তীর-ধনুক আর ছড়ি হিসেবে ব্যবহৃত একটা মজবুত লাঠি নিয়ে তীরে নেমে এল রবিনহুড। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ল। 'বিদায়, ক্যাপ্টেন ! কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, মাছ ধরতে জানে না এ কেমন জেলে, তার নাম কি ? বোলো, তার নাম রবার্ট অভ হান্টিংডন, লোকে যাকে রবিনহুড বলে ডাকে।'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল ও, লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। এদিকে ক্যাপ্টেন ও জাহাজের অন্য কর্মচারীরা যতক্ষণ দেখা গেল, হা করে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল।

রবিনের শেষ তীর

ওদিকে রবিনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটু পর কার্কলিজ নানারিতে এসে পৌঁছল মেরিয়ান। মাদার প্রায়োরেস সেখানে সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওকে। লিটল জন তার আগেই বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। নানারির লোকজনের চোখের আড়ালে থাকবে সে।

এর কিছুদিন পর সদলবলে নানারিতে এসে হাজির হলেন রাজা জন। মেরিয়ানকে তাঁর হাতে তুলে দেয়ার দাবি জানালেন। কিন্তু সরাসরি না করে দিল মাদার প্রায়োরেস। বলল, 'লেডি মেরিয়ান এখানকার আশ্রিতদের একজন। রাজা হোক আর যে-ই হোক, এখানকার আশ্রিতদের স্পর্শ করার অধিকার কারও নেই। রবিনহুডের প্রতি আমার দয়া-মায়া বা অন্তরের টান, কিছুই নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে মেরিয়ানের জায়গায় যদি স্বয়ং রবিনও থাকত, আমি তাকেও আপনার হাতে তুলে দিতাম না।'

কাজ হবে না বুঝতে পেরে চলে গেলেন জন। কিন্তু তাঁর অনুসারীদের প্রচেষ্টা চলতে লাগল। একদিন, দু'দিন পরপরই কেউ না কেউ আসে। অনুরোধ করে, ভয় দিয়ে অথবা মোটা অঙ্কের ঘুসেব লোভ দেখিয়ে তাকে রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। কিছুতেই কিছু হলো না।

একদিন মেরিয়ানকে ডেকে প্রায়োরেস বলল, 'শোনো, মেরিয়ান। আমি নিশ্চিত খবর পেয়েছি রবিনহুড মারা গেছে। তোমার ব্যাপারে রাজার ইচ্ছে যদিও কোনদিন পূরণ হতে দেব না আমি, যে কোন মূল্যে তাঁকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু মনে রেখো, তোমার নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি নেই। কারণ জন এখন এ দেশের রাজা। তাঁর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখা বোকামি হবে। তবে তুমি যদি নিজেকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করো, আমাদের সিস্টারহুডদের একজন হয়ে আমাদের বিশেষ পোশাক গায়ে দাও, তাহলে তোমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারব। তখন এক রাজা জনের জায়গায় বিশজন জন এলেও কিচ্ছু করতে পারবে না। নানারির আইন ভঙ্গ করলে সারা ইংল্যান্ড তার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাকে ক্ষমতা থেকে ছুড়ে ফেলতে না পারা পর্যন্ত কেউ বিশ্রাম নেবে না।'

রবিনহুড সত্যি সত্যি মারা গেছে, কথাটা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মেরিয়ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে নান হওয়ার জন্য বারবার বোঝাতে লাগল মাদার প্রায়োরেস।

কারণ একবার নানের পোশাক গায়ে চড়ালে আর কোন চিন্তা থাকবে না। জীবনের বাকি দিনগুলো নিরুপদ্রবে কাটাতে পারবে ও। কিন্তু মাদার প্রায়োরেসের আরও এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এর পিছনে।

সে জানত, রবিনহুডের অনুপস্থিতিতে মেরিয়ানই হবে লকসলি এস্টেটের যাবতীয় সহায়-সম্পদের মালিক। মালিক যদি নানারির সদস্যা হয়ে যায়, তাহলে তার সবকিছুর মালিকও নানারিই হবে। কিন্তু প্রায়োরেস যতই বোঝাক, তারপরও দ্বিধা দূর হয় না মেরিয়ানের। ওর মন কিছুতেই মানতে রাজি নয় যে রবিন মারা গেছে। যদি ও প্রায়োরেসের কথামত সন্ন্যাস নিয়ে ফেলে, এবং তার পরপরই রবিন ফিরে আসে, তখন কি হবে ? একবার নান হয়ে গেলে তো আর স্বাভাবিক সংসার জীবনে ফিরে যাওয়ার পথ থাকবে না।

কিন্তু রাজা জন আবারও নানারিতে হানা দিতে এলে সকল দ্বিধা দূর হয়ে গেল মেরিয়ানের। সাথে সাথে নান হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিল ও। বারবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় আগে থেকেই রেগে ছিল জন, মেরিয়ানের ঘোষণায় শেষ আশার আলোটুকুও নিভে গেল দেখে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু কিছু করার নেই তাঁর। প্রায়োরেস ঠিকই বলেছিল, একজন নানকে প্রার্থনার বেদি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাজারও নেই।

'শুনুন, মাদার !' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে। 'আমার বিশ্বাস রবিনহুড নামের এই বিশ্বাসঘাতকটা এখনও বেঁচে আছে। কয়েক মাস পর্যন্ত তার ছায়াও কেউ দেখেনি। আমি যতক্ষণ না তার মৃতদেহ দেখতে পাব, বা আমার বিশ্বস্ত কেউ ব্যাটার লাশ কবরে শোয়াতে না দেখবে, তার পরিণতির ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে পারব না। যদি ও বেঁচে থাকে, তাহলে একদিন হয়তো এসে মেরিয়ানকে নিয়ে যাবে। যদি তেমন কিছু ঘটে, এই নানারি আমি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেব মনে রাখবেন। আর বাকি নানদের সাথে আপনাকেও পথে নামিয়ে দেব। তখন গতর খেটে খাবার জোগাড় করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।'

ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নানারির গেটসহ চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দিল মাদার। কিন্তু সেটা রাজার ভয়ে নয়, রবিনহুডের ফিরে আসার ভয়ে। কিন্তু তার জানা ছিল যে নতুন নিয়োজিত গার্ডদের একজন রবিনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী, লিটল জন।

***

অবশেষে একদিন সত্যি সত্যিই এল রবিনহুড–'ডাকাতদের' সেই স্বপ্নের যুবরাজ। লাঠিতে ভর দিয়ে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে। এক বুড়ো, রোগগ্রস্ত মানুষ। যদিও তখন ওর বয়স চল্লিশের সামান্য বেশি।

নটিংহ্যামের বিশেষ সেল থেকে পালাবার সময় পড়ে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছিল রবিন, সে আঘাত আর সারেনি। ইয়র্কশায়ারের উপকূল থেকে হেঁটে কার্কলিজ পৌঁছতে গিয়ে খুব দ্রুত আরও অসুস্থ, আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাঁটার সময় প্রতি

পদক্ষেপে যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে উঠছে ওর, বুক চিরে অস্ফুট কাতর ধ্বনি বেরিয়ে আসছে। নানারির দরজার কড়া নেড়ে মাদারের সাহায্য প্রার্থনা করল রবিন।

'আসুন, আসুন !' মাদার প্রায়োরেস নিজে স্বাগত জানাল রবিনহুডকে। পথ দেখিয়ে নিচতলার অতিথিদের থাকার বড় একটা রুমে নিয়ে এল। রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই একটু দূরে শেরউড দেখা যায়। ওকে বিছানায় শুইয়ে রক্ত বের হওয়ার জন্য এক হাতের শিরা সামান্য কেটে দিল মাদার। তখনকার দিনে এভাবে রক্ত বের করাকে সব রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা বলে মনে করা হত।

একটু পর মনে হলো রবিনও বুঝি কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। উঠে বসে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল ও, 'মাদার প্রায়োরেস, আমি কিছু কথা বলতে চাই। একে আপনি কনফেশনও বলতে পারেন। আশা করি কথাগুলো এই ঘরের চার দেয়ালের বাইরে যাবে না ?'

'নিশ্চিন্তে বলে যান,' প্রায়োরেস বলল। 'আপনার কথা আমি এবং আমার ঈশ্বর ছাড়া আর কারও কানে যাবে না।'

'আমি ... আমার নাম রবার্ট ফিযূথ, মাদার প্রায়োরেস। হান্টিংডনের প্রাক্তন আর্ল আমি। বেশিরভাগ লোক রবিনহুড নামে চেনে আমাকে।'

মাদার প্রায়োরেস একটু নড়েচড়ে বসল। কিছু বলল না।

'মাদার প্রায়োরেস, কয়েক মাস আগে আমি আর আমার স্ত্রী মেরিয়ান রাজা জনের তাড়া খেয়ে নটিংহ্যাম থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হই। কিছুদিন পর যখন বুঝতে পারলাম দু'জন একসাথে পালাতে পারব না, তখন মেরিয়ানকে আপনার এখান আশ্রয় নিতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি শত্রু বাহিনীকে বিপথে চালিত করে স্কারবরোর দিকে নিয়ে যাই।' একটু থামল রবিন। 'মাদার প্রায়োরেস, আমার স্ত্রীর কোন খবর জানা আছে আপনার ?'

'হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী এসেছিল,' বলল মাদার। চেহারা একদম ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে এমনিতে স্বাভাবিক। 'এখানে অল্প ক'দিন ছিল, তারপর আপনার লকসলি হলে চলে গেছে। সেখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে সে।'

খুশি হয়ে উঠল রবিনহুড। 'তাহলে আমার এখনই যাওয়া উচিত !' বলেই বিছানা থেকে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'এখন ঘুম দিন,' শান্ত কণ্ঠে বলল মাদার প্রায়োরেস। 'লম্বা একটা ঘুম দিয়ে উঠলে অনেক সুস্থ বোধ করবেন। তখন যাবেন। কাল সকালে। আমি একটা ঘোড়া আর দু'জন লোক ধার দিতে পারব। আপনার সুবিধে হবে তাতে।'

নিশ্চিন্তে বিছানায় পিঠ ঠেকাল রবিনহুড, প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল অসম্ভব দুর্বল বলে। মাদার প্রায়োরেস যখন বুঝল ও সত্যিই ঘুমিয়ে গেছে, তখন সাবধানে কাছে এসে ওর কাটা শিরার ব্যান্ডেজ আলগোছে খানিকটা ঢিলা করে দিল। আবার রক্ত পড়া শুরু হলো ক্ষত থেকে, তবে এবার অনেক ক্ষীণ ধারায়। কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাপারটা লক্ষ করল মাদার প্রায়োরেস, তারপর বেরিয়ে গেল রুম থেকে। সারাদিন ওভাবেই পড়ে থাকল রবিন, রক্ত একটু একটু করে পড়ছেই।

নিয়তি মৃত্যুর দুয়ারে এনে দাঁড় করাতে ঘুম ভাঙল। চোখ মেলল তাকাল রবিনহুড। গাছগাছালির ছায়া তখন ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকাতে লাগল ও। হাতের খোলা ব্যান্ডেজের ওপর চোখ পড়তেই বুঝল কাজটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে। কে করেছে, সেটাও অনুমান করে নিতে দেরি হলো না।

অনেক কষ্টে বিছানা থেকে উঠল রবিন, নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে জানালার কাছে নিয়ে জানালা খুলে দিল। জানালার ওপাশে কয়েক হাত নিচে মাটি। সামান্যই ব্যবধান, অথচ এইটুকু অতিক্রম করার মত শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই ওর মধ্যে। অসহায়ের মত সামনে তাকাল রবিন। প্রিয় শেরউডকে দেখতে পেল। ইশারায় ডাকছে ওকে। কি করবে ভাবছে, হঠাৎ রূপার শিঙাটার কথা মনে পড়ল।

কাঁপা কাঁপা হাতে ওটা বের করল রবিন, ওটা দিয়ে পুরানো বিপদসঙ্কেত বাজাল শেষবারের মত।

আশপাশেই ছিল লিটল জন, চমকে উঠল সেই বহু পরিচিত ডাকটা শুনে। 'রবিনের শিঙা ! উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'কিন্তু ফুঁ-টা এত দুর্বল শোনাল কেন ? রবিন কি মৃত্যুর দুয়ার থেকে শিঙা বাজাচ্ছে ?'

কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তক্ষুণি নানারিতে ঢুকতে গেল লিটল জন, কিন্তু সেখানকার গার্ডরা বাধা দিল। গেটে বড় একটা তালা মেরে দিল তারা। রাগে অন্ধ হয়ে গেল লিটল জন, কোত্থেকে একটা বড় হাতুড়ি নিয়ে এসে দানবীয় শক্তির এক আঘাতে ভেঙে ফেলল তালাটা। পথে আরও যতগুলো তালা পড়ল, প্রত্যেকটা ভাঙল ও।

লিটল জনের মত আরও একজনের কানে গেল রবিনের শিঙার ডাক। সে মেরিয়ান। চ্যাপেলে মৃত স্বামীর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করছিল ও, এমন সময় খুব কাছেই আওয়াজটা হতে চমকে উঠল। পরমুহূর্তে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেরিয়ান। চাউনিতে ভীতি আর কী যেন এক দুরাশা। শব্দ অনুসরণ করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গেস্ট রুমে এসে পৌঁছল মেরিয়ান। দেখতে পেল তার প্রিয়তম স্বামী বিছানায় পড়ে আছে অসহায়ের মত।

'রবিন !' চিৎকার করে উঠল মেরিয়ান। 'রবিন ! আমার রবিন ! আমার প্রভু ! তুমি এসেছ ? তুমি...'

'মেরিয়ান !' এক হাতে মেরিয়ানকে ধরে নিজের দিকে টানতে চেষ্টা করল রবিন, কিন্তু পারল না। চেহারা দেখেই বোঝা গেল ভীষণ অবাক হয়েছে ও। 'তুমি ! মাদার প্রায়োরেস তো বলছিল তুমি নাকি লকসলিতে চলে গেছ !'

বলল, 'হায়, ওস্তাদ ! আমরা তোমার এত কাছে থেকেও জানতে পারলাম না শয়তান প্রায়োরেস তোমার এতবড় সর্বনাশ করে গেল ! তোমাকে শেষ করে দিয়ে গেল !'

'হ্যাঁ, বন্ধু,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'শেষ করে দিয়ে গেল !'

কান্নার বেগ বেড়ে গেল লিটল জনের। 'ওস্তাদ, কার্কলিজ নানারিতে আগুন লাগিয়ে দেব আমি, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দেব। যাওয়ার আগে তুমি শুধু এই অনুমতিটা দিয়ে যাও আমাকে।'

'না, লিটল জন। এ অনুমতি আমি তোমাকে দিতে পারি না। জীবনে কোন নারীর মনে আঘাত দিইনি আমি, আজও দিতে পারব না। আমার মৃত্যুর জন্যে প্রায়োরেসকে দোষ দিয়ো না। একদিন না একদিন মরতে হবে, এ তো আমরা সবাই জানি। আমার ধনুক আর একটা ব্রড হেড নিয়ে এসো, বন্ধু। আমি তীর ছুড়ব। তীরটা যেখানে পড়বে, আমাকে সেখানেই কবর দেবে। আমার মাথার নিচে একটা সবুজ ঘাসের চাপড়া দিয়ো। পায়ের কাছেও একটা থাকে যেন। আর বলতে গেলে সারাজীবন যার ছিলার মিষ্টি গান শুনে কেটেছে, সেই ধনুকটাও আমার পাশে রেখে দিয়ো। কবরের মাথার দিকে একটা পাথর রেখো, যাতে সবাই বুঝতে পারে শেরউডের রবিনহুডের শেষ বিছানাটা কোথায়।'

চোখের পানি মুছে রবিনের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী ইউ কাঠের ধনুক এবং একটা ব্রড হেড নিয়ে এল সে। রবিন বিছানায় উঠে বসে শেষ তীর ছোড়ার প্রস্তুতি নিল। ছিলায় টান দিতেই মনে হলো যেন আগের মত শক্তিমান হয়ে উঠল সে, অনায়াসে ছিলা টেনে একেবারে কান পর্যন্ত নিয়ে এল। পরক্ষণে জোরাল টোয়াং ! শব্দের সাথে জানালা দিয়ে উড়ে গেল তীর, অস্তমিত সূর্যের আলোয় ঝিলিক মেরে নানারির উঁচু দেয়াল টপকে শেরউডের গাঢ় সবুজ বনের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তে প্রাণ হারিয়ে লিটল জনের বাহুতে ঢলে পড়ল রবিনহুড। মেরিয়ান ধীরে ধীরে, অনেক যত্নের সাথে ওর চোখের পাতা বুজে দিল। ওর দু' চোখ বেয়ে দরদর করে পানি গড়াচ্ছে।

পরদিন সকালে তীরটা খুঁজে বের করল লিটল জন। সেই ঝাঁকড়া গ্রিনউড গাছটার নিচে গেঁথে আছে। সেখানেই নিজহাতে কবর খুঁড়ে রবিনকে শুইয়ে দিল সে। কবরের মাথার দিকে একটা পাথর বসিয়ে তাতে খোদাই করে লিখল :

আন্ডারনিথ দিস লিটল স্টোন
লাইজ রবার্ট আর্ল অভ হান্টিংডন ;
নো আদার আর্চার ওয়াজ সো গুড–
অ্যান্ড পিপল কলড্ হিম রবিনহুড।
সাচ আউটলজ অ্যাজ হি অ্যান্ড হিজ মেন
উইল ইংল্যান্ড নেভার সী আগেইন।

উপসংহার

রাজা হেনরি ও দুই ফাদার

রবিনহুড মারা যাওয়ার পর মেরিয়ান কার্কলিজের নারী মঠেই থেকে যায়। কিছুদিন পর মাতিলদা নাম ধারণ করে সেখানকার প্রায়োরেস হয় সে। পীড়িত ও ভাগ্যহত মানুষদের জন্যে তার প্রাণান্তকর সেবার অনেক কাহিনী আছে। অবশেষে একদিন যে কক্ষে রবিনের মৃত্যু হয়েছিল, মাতিলদাও সেই কক্ষে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। সেই গ্রিনউড গাছটির তলায় রবিনহুডের পাশে কবর দেয়া হয় তাকে।

লিটল জন প্রভু ও প্রিয়তম বন্ধুকে কবর দেয়ার পর সেখানে আর বেশিদিন থাকেনি। কয়েক বছর আয়ারল্যান্ডে গিয়ে কাটায় সে। তীর ছোড়ার পারদর্শিতার জন্য আয়ারল্যান্ডে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে লিটল জন। সেখান থেকে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসে সে। এরপর জনের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি, যদিও তার কবর পাওয়া গেছে ডার্বিশায়ারের হেদারসেজ গ্রামে।

একটা গল্প চালু আছে : রাজা জনের মৃত্যুর অনেকদিন পর তাঁর ছেলে, রাজা হেনরি তৃতীয় একবার হরিণ শিকার করতে শেরউডে গিয়েছিলেন। সেখানে অত্যন্ত সুন্দর, তেল চকচকে এক স্ট্যাগ হরিণ দেখে সব ভুলে সেটাকে তাড়া করেন তিনি। এতই দ্রুত ছুটতে থাকেন যে কখন শেরউডের সবচেয়ে বুনো, নিবিড় অংশে এসে পড়েছেন, সঙ্গীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, কিছুই টের পাননি। এদিকে সন্ধেও হয়ে এসেছে।

এই অবস্থায় রাত কাটানোর মত আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে একটা বহু ব্যবহৃত, পায়ে চলা মেঠোপথের দেখা পান রাজা। সেটা ধরে কিছুদূর যেতে একটা ছোট চ্যাপেল ও ফাদারদের থাকার সেল চোখে পড়ে তাঁর। আলো জ্বলছে চ্যাপেলে। ভেতরে ঢুকতে দু'জন ফাদারকে প্রার্থনারত দেখতে পান হেনরি তৃতীয়। দু'জনেই বেশ বয়স্ক। একজন সাধারণের তুলনায় বেশ দীর্ঘদেহী মানুষ। অন্যজনও লম্বা, তবে অতিরিক্ত মোটাও।

আগন্তুককে আশ্রয় দেয়ার ব্যাপারে ফাদার দু'জনের চরম অনীহা থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাজাকে থাকতে দিল তারা। ঘুমাবার জন্য একটা খড়ের বিছানা

দেখিয়ে দিয়ে কুণ্ঠার সাথে জানাল, রুটি-পনির ও ঝরনার পানি ছাড়া অতিথিকে খেতে দেয়ার মত কিছু নেই তাদের কাছে।

'চারদিকে এরকম গহীন জঙ্গল, এরচয়ে বেশি আর কি-ই বা খাওয়াতে পারেন আপনারা ?' রাজা বললেন। 'ভাল কথা, রাজার বনরক্ষীরা ঘুমিয়ে পড়লে তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করতে যান না ?'

'কথাটা কায়দা করে স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছেন ? যাতে আমরা জঙ্গলের আইন মানি না বলে বিপদে ফেলতে পারেন ?' লম্বা ফাদার বলল। 'আমরা নিরীহ, গরিব মানুষ। আপনি যদি ...'

'মোটেই না, মোটেই না !' রাজা বললেন। 'আজ যে আমাকে সুস্বাদু খাবার খাওয়াবে, তার সাথে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করব না আমি। কারণ আজকের রাতের মত খাবারের এতো জরুরি প্রয়োজন আর কখনও পড়বে না আমার।'

স্যাডল থেকে কড়া ওয়াইনের ফ্লাস্ক বের করে নিয়ে এলেন রাজা। লম্বা ফাদারকে নিয়ে ছোট ছোট চুমুকে পান করতে লাগলেন। একটু সাধাসাধি করতে মোটা ফাদারও যোগ দিলেন তাঁর সাথে। ওয়াইন দিয়ে গলা ভেজালেন এবং খুব দ্রুত খোলামেলা হয়ে উঠলেন।

এরপর দুই ফাদার নিজেদের ওয়াইন ও এল-এর এবং ভাল ভাল সুস্বাদু খাবারের ভাণ্ডার খুলে বসলেন।

'আপনি তীর ভাল চালাতে পারেন, শিকারি ?' লম্বা ফাদার জিজ্ঞেস করল।

'খুব পারি।'

'বাইরে চলুন তাহলে। দেখা যাক, কে কেমন পারে।'

একটা উইলোর ডাল মাটিতে পুঁতে ত্রিশ গজ দূর থেকে সেটাকে টার্গেট করার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু সন্ধের স্তিমিত আলোয় রাজা ব্যর্থ হলেন, মোটা ফাদারও। একমাত্র লম্বা ফাদার সফল হলো। তার তীর মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে দিল ডালটাকে। পরে পান করতে বসে রাজা ফাদারের প্রশংসা করে বললেন, 'জীবনে আর কাউকে এরকম ভাল তীর ছুড়তে দেখিনি। এত ভাল খাবারও আর কখনও খাইনি। মনে হচ্ছে আমি যেন অতীতের সিংহ হৃদয় রিচার্ড আর দুঃসাহসী রবিনহুডের আমলের শেরউডে চলে এসেছি। রবিনহুডকে নিয়ে অনেক গান, অনেক গল্প চালু আছে। আপনারা কি রবিনহুড নামের ডাকাতদের সেই যুবরাজের কোন গল্প জানেন ?'

এরপর দুই বৃদ্ধ ফাদার একটু একটু করে অতীতে চলে গেল। তাদের পিছনে ফেলে আসা জীবনের অভিযানে ভরা গল্পে ফিরে গেল—যে গল্প তারা নিজের চোখে দেখেছে, নিজেরা তাতে অংশগ্রহণও করেছে। গল্পে গল্পে রাত ফুরিয়ে এল, তবু তাদের বলা আর শেষ হয় না।

দিনের আলো ফুটতে রাজা তার স্যাডলে উঠে বসলেন। সারারাত পান করার কারণে তখন তিনি মাতাল। সঙ্গীদের খোঁজে যাওয়ার আগে দুই ফাদারকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

বললেন, 'শ্রদ্ধেয় ফ্রায়ার, গত রাতটা আমার জীবনের সবেচে' সৌভাগ্যের এবং সবচে' স্মরণীয় রাত হয়ে থাকবে। কারণ যদি আমি স্বপ্ন না দেখে থাকি, তাহলে গত রাতটা লিটল জন ও ফাদার টাকের সাথে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। চলি। ঈশ্বর আপনাদের হেফাজত করুন।'

সঙ্গীদের খোঁজ পেয়ে রাজা যখন তাঁর অদ্ভুত অভিযানের কথা জানালেন, সবাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল।

কিন্তু তারপর বহু খোঁজাখুঁজি করেও শেরউডের গহীনের সেই চ্যাপেল বা সেল, কোনটারই সন্ধান পাওয়া যায়নি।